বাংলাদেশ
ইসলামী
ছাত্রশিবির

ফেনী জেলা

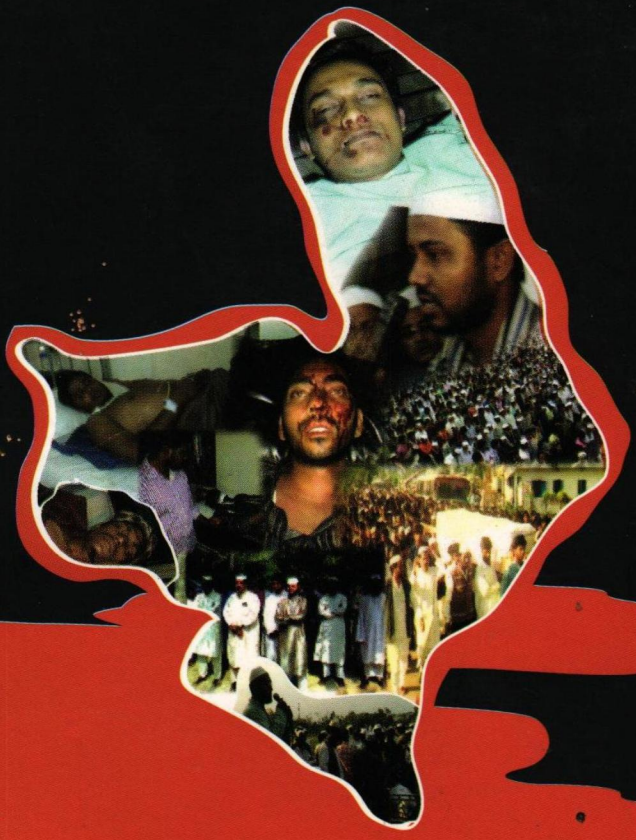

স্মৃতি সংকলন

রক্তাক্ত ফেনী

www.pathagar.com

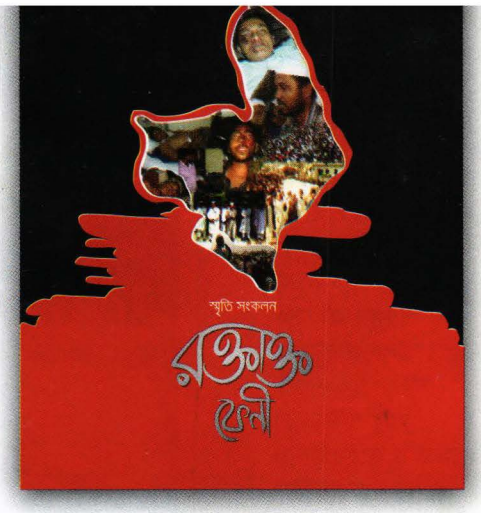

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ফেনী জেলা

www.pathagar.com

স্মৃতি সংকলন

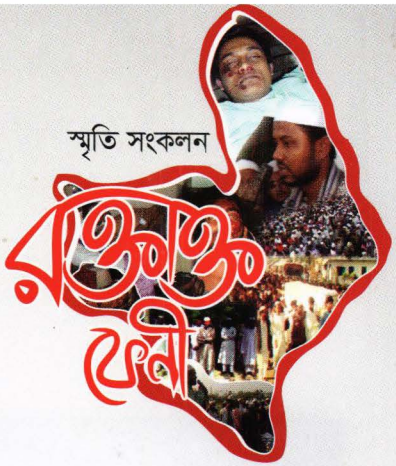

রক্তাক্ত ফেনী

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মু. মহি উদ্দিন

কৃতজ্ঞতায়

আবদুল জববার
আতিকুর রহমান
মজিবুর রহমান মঞ্জু
ডা. মো. ফখরুদ্দিন মানিক
মু. শাহজাহান সিরাজী
এ এস এম আলাউদ্দিন
শাহ আলম ভূঁঞা
মু. মর্তুজা
মানসুর আহমেদ
দিদারুল আলম মজুমদার
মনির উদ্দিন মনি
আবু সাঈদ খাঁন
হাফেজ মু.জহির উদ্দিন
রাশেদুল হাসান রানা
তারেক মাহমুদ

উপদেষ্টা মন্ডলী

জনাব মকবুল আহমদ
অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁঞা
এ কে এম নাযেম ওসমানী
এ কে এম শামসুদ্দীন
মুফতি আব্দুল হান্নান
হাবিবুল্লাহ বাহার
এ এস এম নুরনবী দুলাল
গাজী সালেহ উদ্দিন
মাও.আবুল হোসাইন ফারুকী
পেয়ার আহমদ মজুমদার
মাও.মুহাম্মদ মোস্তফা
মাও.হোসাইন আহমদ
আবুল হোসেন মিয়াজী
মাও.নুর মোহাম্মদ
আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ফেনী জেলা

মূল্য : ২০০ টাকা

প্রথম প্রকাশ
১৯৯
প্রথম সংস্করণ
জুন ২০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
রংতুলি মিডিয়া কর্পোরেশন
০১৯৬০৪০৯৫০৯

www.pathagar.com

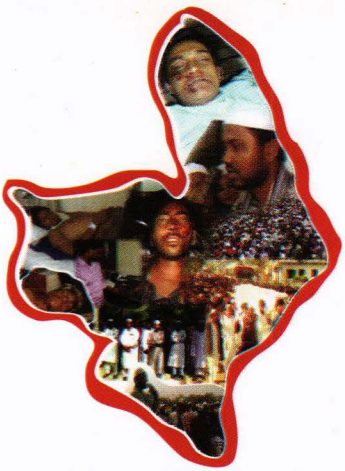

সম্পাদনা পরিষদ

- **প্রধান সম্পাদক**
  মু.জাহেদ হোসাইন
- **সম্পাদক**
  মোজাম্মেল হোসাইন
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  মু. ওসমান গনি আরিফ মজুমদার
- **সম্পাদনা সহযোগী**
  কফিল উদ্দিন মাহমুদ
  মু.ওমর ফারুক
  কামরুল ইসলাম হায়দার
  মু. জানে আলম
  মু. সাইদুল হক
  মু. আব্দুল গফুর

www.pathagar.com

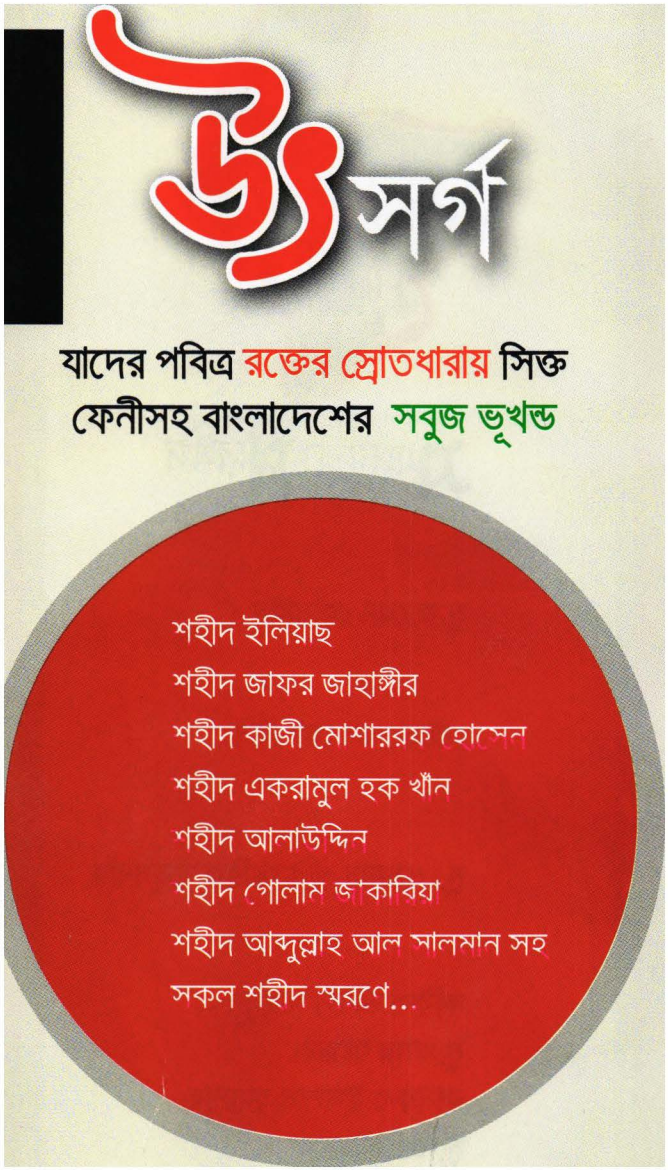

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বাণী ০৬
সম্পাদকীয় ১৩

প্রবন্ধ

বিশ্বনবীর (স) জীবনে রাজনীতি- অধ্যাপক গোলাম আযম ১৬
শাহাদাৎ মুমিন জীবনের কাম্য- অধ্যাপক তাসনীম আলম ২৪
সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মহান মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য- অধ্যাপক মফিজুর রহমান ৩১
জাতির উন্নয়নঃ প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা- মু. আব্দুল জববার ৪৬
ইসলামী আন্দোলনে পরাজয়ের দাবী কতটা বাস্তব সম্মত- ড. রশিদ আল ঘানুশী ৪৮
যুব অবক্ষয়ের প্রতিকারের উপায়- আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ ৫৩
২৮ অক্টোবরের স্মৃতিকথা- মজিবুর রহমান মনজু ৬২
ঈমানের অগ্নি পরীক্ষাঃ যারা হয়েছিলেন নিখাঁদ- ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক ৬৬
যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবীঃ পিছনের রাজনীতি- এড. খুরশিদ আলম ৭০
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরঃ
ঐতিহ্য, ত্যাগ-কুরবানী, গৌরব ও সংগ্রামের তিন যুগ- রাশেদুল হাসান রানা ৭৮
ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ ও কুরবানী- শাহ্ মিজানুল হক মামুন ৮৪
রক্তাক্ত জনপদ ফেনী জেলা- কফিল উদ্দিন মাহমুদ ৮৭
ইসলামী ছাত্রশিবিরঃ অপপ্রচার ও নির্যাতনের শিকার- ওসমান গনি আরিফ ৮৯
শহীদি কাফেলাঃ খন্ড চিত্রে যাত্রা শুরুর সেই সময় ৯৯

জীবনী

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার জীবনী ১০২
একটি ফুটন্ত গোলাপের অকালে ঝরে পড়াঃ কিছু বেদনা বিধুর স্মৃতি- মু. জাহেদ হোসাইন ১১৪

শহীদ পরিচিতি ১২৫

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর
শহীদ কাজী মোশাররফ হোসেন
শহীদ একরামুল হক খান
শহীদ মু. আলাউদ্দিন
শহীদ গোলাম জাকারিয়া
শহীদ আব্দুল্লাহ আল সালমান

স্মৃতিতে অম্লান আমাদের শহীদেরা

জীবনে প্রথম দেখা ও শেষ সাক্ষাত- নূর মোহাম্মদ ১৩৩
শহীদ মোশাররফঃ যার কাছে আমি ঋণী- মু. আসাদুজ্জামান ১৩৫
শহীদ একরামের সাথে প্রথম পরিচয় এবং শেষ দেখা- সৈয়দ আব্দুল মতিন ১৩৯
এখনও যিনি আমার নেতাঃ শহীদ আলাউদ্দিন- মু. নুরুজ্জামান ১৪২
কিছু স্মৃতি কিছু কথা- আ ন ম আব্দুর রহিম ১৪৬
যে স্মৃতি বার বার নাড়া দেয়- সামাউন হাসান ১৪৮

কবিতা ১৫২

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিময় অতীত- মোফাচ্ছের হক খোন্দকার ১৬১
স্মৃতি কথা- এ এস এম আলা উদ্দিন ১৬৬
দুঃসহ স্মৃতি- দিদারুল আলম মজুমদার ১৬৮
ফেলে আসা দিনগুলো- আবু আলী ফুজায়েল মু. আয়াজ ১৬৯
সাক্ষাৎকার ১৭১
দায়িত্বশীল পরিচিতি ১৯৯
শাখা পরিচিতি ২০১
এ্যালবাম ২০৬

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা

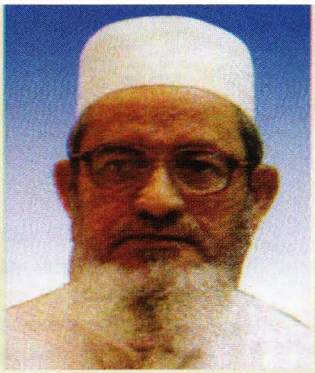

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে **'রক্তাক্ত ফেনী'** নামক একটি স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং উদ্বেলিত।

সময়ের প্রয়োজনেই জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দিকভ্রান্ত জাতিকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখানোই ছিল এই কাফেলার প্রধান দায়িত্ব। এই মহান দায়িত্ব পালনের পথ শিবিরের জন্য কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। বাঁধার পাহাড় আর প্রতিবন্ধকতার দূর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে ছাত্রশিবির তাদের পথ চলা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তারা শিকার হয়েছে সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের। অসংখ্য কর্মী ভাইয়ের শাহাদাত তাদের পথ চলাকে আরও বেগবান করেছে। আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফেনী একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এই জনপদে শহীদ ইলিয়াছ এর পথ ধরে ইসলামী আন্দোলন বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে শাহাদাতের নজরানা পেশ করে এ পর্যায়ে এসেছে। তাই এ জনপদের ইসলামী আন্দোলনের যে ইতিহাস তৈরী হয়েছে তাকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে আমি তার সফলতা কামনা করি। এ মহতি উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। ফেনী জেলা ইসলামী আন্দোলনের আগামীর পথ চলায় এ স্মরণিকা দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশায় রইলাম।

মকবুল আহমদ
আমীর (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির- একটি সংগঠন, একটি ইতিহাস। ছাত্রশিবির আল্লাহর এই জমিনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠার একটি দূর্বার ও পরীক্ষিত কাফেলার নাম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের এ প্রিয় সংগঠনটি কায়েমী স্বার্থবাদীদের হিমালয়সম বাঁধা, প্রতিবন্ধকতা, অপপ্রচার, জুলুম ও নির্যাতনের মোকাবেলা করে করে দীর্ঘ ৩৮ বছর অতিক্রম করেছে। এ জুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী ভাইদের শাহাদাত আর পঙ্গুত্বকে বরণ করে নেয়ার অদম্য মানসিকতা সংগঠনটিকে এ দেশের লাখো কোটি ছাত্র-জনতার হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছে। এ গৌরব অর্জনের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে আমাদের শহীদ ভাইয়েরা। দুইশত ১১জন শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে এ সংগঠন আজ শহীদি কাফেলার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এ পথ চলায় বাংলাদেশের অন্যান্য জনপদের মত ৬ শহীদের বেলাভূমি ফেনী জেলাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতীত আমাদের প্রেরণার উৎস। অনুপ্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যত প্রজন্মকেও। আর সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শহীদ ভাইদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখা **'রক্তাক্ত ফেনী'** নামক যে স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমি তার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। তাদের এ প্রয়াস ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আগামী দিনের পথ চলায় আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। স্মারক প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করি।

মুহাম্মদ আবদুল জববার
কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা

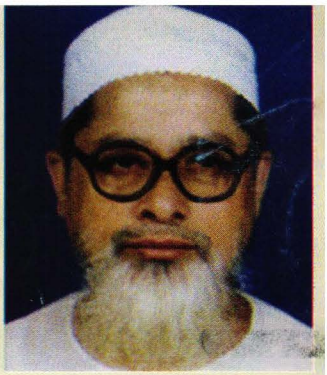

সকল প্রশংসা নিখিল বিশ্বের রব আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শানে এবং তাঁর সম্মানিত বংশধর ও আসহাবগণের প্রতি আর যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী সকল মুজাহিদ ও তাদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ কখনো নিরাপদ ও কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা। একাজটি সব সময়ই কন্টকাকীর্ণ ও রক্ত পিচ্ছিল। ইহাই আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা "আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জানমাল ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব।" (বাকারা- ১৫৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন "লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে আমরা ঈমান এনেছি এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? অথচ আমরা তো এর পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।" (আল আনকাবুত ২-৩)

আল্লাহ তা'য়ালার এ ঘোষণাকে সামনে রেখেই ফেনীর ইসলামী আন্দোলনের ধারক বাহকরা ভূমিকা রেখে এসেছেন। এখানে ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শহীদ আব্দুল আউয়ালের রক্ত দেয়া থেকে শুরু করে এ কাফেলার সর্বশেষ শহীদ আবদুল্লাহ আল সালমানের রক্ত দেয়া পর্যন্ত অসংখ্য মর্দে মুমিন তাদের প্রিয়তম বস্তু জীবনকে আল্লাহর রাহে নজরানা হিসাবে পেশ করেছেন। এ ছাড়াও অসংখ্য ভাই পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও আহত হয়েছেন। এ জন্য ফেনীকে শহীদের পূণ্যভূমি বলা চলে। আর তাদেরই স্মরণে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখা **'রক্তাক্ত ফেনী'** নামে একটি পরিবর্ধিত সংস্করণে স্মরণিকা বের করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি উদ্যোক্তাদের তাদের এ উদ্যোগের জন্যে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং তাদের এ প্রয়াস সাফল্যমন্ডিত হোক এ কামনা করছি। আর এও কামনা করছি ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত প্রজন্ম শাহাদাতের বাসনা নিয়ে আগামী দিনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র কাজকে আরো তীব্রগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বর্তমানে ফেনীর সন্তানরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে জোরালো ভূমিকা রাখছে, আগামী দিনেও দেশ ও জাতিগঠনে গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে এ দো'আ করছি আল্লাহ তা'য়ালা যেন ইসলামী আন্দোলনের এ কাফেলার অগ্রযাত্রাকে কবুল করেন।

অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁঞা
কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা

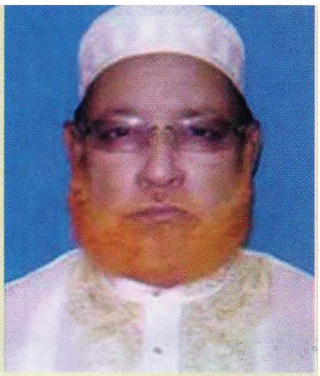

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এ দেশের অসংখ্য পথহারা, দিশাহারা, দিকভ্রান্ত ছাত্রদের একমাত্র আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল। একঝাঁক মেধাবী ছাত্রের আদর্শিক ঠিকানার নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। বিদ্যমান অপসংস্কৃতির সয়লাব, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নৈরাজ্য, চর দখলের মত হল দখল, নকলের মহোৎসব ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কলুষিত ধারার বাইরে গিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্র কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের যে নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল। সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতির বিকাশে ইসলামী ছাত্রশিবির যে অবদান রাখছে তা আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রচেষ্টা এবং অবদানের পেছনে ছাত্রশিবিরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। জুলুম, নির্যাতন আর শাহাদাতের দৃষ্টান্ত পেশ করতে হয়েছে। ফেনী জেলাও তার অংশীদার। এ জনপদের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমাদের অনেক আবেগ ও স্মৃতি বিজড়িত। শহীদ ইলিয়াছ ভাইয়ের পথ ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে। চলার পথে সীমাহীন বাধা আর প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ছাত্রশিবির এগিয়ে চলছে দূর্বার গতিতে। কয়েকদিন আগেও এখানে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেছে শহীদ আব্দুল্লাহ আল সালমান। তার আগে আরও পাঁচজন ভাই শাহাদাত বরণ করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বাতিলের মোকাবিলা করে এগিয়ে চলছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ । শহীদ ভাইদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখা **'রক্তাক্ত ফেনী'** নামক স্মারকটি পূণঃপ্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। পাশাপাশি তাদের এ মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বিদ্যমান রাজনৈতিক বৈরী পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ সাহসী উদ্যোগ যারা নিয়েছে আমি তাদের সবার সফলতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যে মহান আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

০১/০৮/১৫

এ কে এম নাযেম ওসমানী
আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
ফেনী জেলা

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা

আল্লাহর এই জমিনে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির যে পথ চলা আরম্ভ করেছে, সে পথ অত্যন্ত বন্ধুর, দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ। এ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ইসলামী ছাত্রশিবির হারিয়েছে তার ২১১ জন তাজা প্রাণ। তবুও পথ চলা থেমে নেই । ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলার রয়েছে একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। শহীদের রক্তে সিক্ত হয়ে এ জনপদের মাটি আজ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের অতীত ঐতিহ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস। সে অতীতকে জীবন্ত ও সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখা **'রক্তাক্ত ফেনী'** নামক একটি স্মারক প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট তাদের সকল প্রচেষ্টার স্বার্থকতা কামনা করছি। (আল্লাহ হাফেজ)

মুহাম্মদ মহি উদ্দিন
কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা সম্পাদক

www.pathagar.com

সভাপতির বাণী

দুইশত ১১ জন শহীদের রক্তের স্রোতধারায় সিক্ত বাংলাদেশের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার একমাত্র ঠিকানা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি হক এবং বাতিলের যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত সে অনিবার্য বাস্তবতার শিকার আমাদের এ প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তাই ইসলামী ছাত্র শিবিরের পথ চলা কখনোই মসৃণ বা পুস্পশয্যা ছিলনা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে মানুষকে ডাকা, মানবতার মুক্তির মূলমন্ত্র প্রচার করা, মানুষ হয়ে মানুষের সকল প্রকার দাসত্বকে পরিহার করে আল কুরআন এবং রাসূলের (সা) সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার সুমহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলেই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি মনজিল অতিক্রমকালে বাতিলের তীব্র থাবা আর প্রচন্ড নখরাঘাতে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মুক্তিকামী এ সংগঠনটি। একটি সমৃদ্ধ এবং কল্যাণমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সদা প্রচেষ্টারত অর্ধ ফুটন্ত এক গুচ্ছ গোলাপের অকালে ঝরে পড়ার পরও থেমে থাকেনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের দূর্গম পথ চলা। বরং "শহীদেরা আমাদের বড় সম্পদ, গড়ে গেছে দ্বিধাহীন সাহসের সোজা রাজপথ।" সে কাংখিত রাজপথ বিনির্মানে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত ফেনী জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের ও রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এ জনপদে বিভিন্ন সময়ে সাধারন ছাত্রদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির আন্দোলনে,সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণ, জুলুম নির্যাতন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্রশিবির সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিয়ে রাজপথে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপপ্রচার, নির্যাতন ও নির্মমতার শিকার হয়েছে এ জনপদের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইয়েরা। আমাদের অসংখ্য ভাইয়ের ত্যাগ এবং কুরবানীর অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ, আহত, জখম ও পঙ্গুত্ব বরণের পাশাপাশি শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর, শহীদ কাজী মোশারফ হোসেন, শহীদ আলা উদ্দিন, শহীদ একরামুল হক , শহীদ গোলাম জাকারিয়া , শহীদ আবদুল্লাহ আল সালমান ভাইয়ের পবিত্র রক্তের যোজনায় ইসলামী ছাত্রশিবির আজ এ জনপদে অসংখ্য ছাত্র জনতার হৃদয়ের স্পন্দন এবং নির্ভরশীলতার একমাত্র প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতীতে ফেলে আসা এ বেদনা বিধুর স্মৃতিগুলোকে অম্লান করে রাখার উদ্দেশ্যে, আমাদের শহীদ ভাইদের জীবনকে আরও জীবন্ত ও জনশক্তিদের জন্য প্রেরণাদায়ক হিসেবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে

www.pathagar.com

ফেনী জেলা ইসলামী আন্দোলনের সামগ্রিক সার সংক্ষেপ নিয়ে ১৯৯৯ সালে সর্বপ্রথম "রক্তাক্ত ফেনী" নামে একটি স্মারক প্রকাশিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরিক্রমনের এ পর্যায়ে এসে ঐ স্মারকটি আর সহজলভ্য নয়। **'রক্তাক্ত ফেনী'** স্মারকটির অপ্রতুলতা, বিগত কয়েক বছর যাবত আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে ময়দানে সোচ্ছার ভূমিকা পালন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম এবং সর্বোপরি শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে আমাদের শহীদ আব্দুল্লাহ আল সালমান ভাইয়ের শাহাদাত বরণ এবং সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান ভাই সাংগঠনিক কাজ শেষে বাড়ী ফেরার পথে মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করার পর উপরোক্ত বিষয়ের স্মৃতিগুলো নতুন করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই **'রক্তাক্ত ফেনী'** স্মারকটি পূণঃপ্রকাশের কাজে হাত দিয়েছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মস্তক অবনত চিত্তে শুকরিয়া জানাই যার অশেষ মেহেরবানীতে শত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্মারকটি পূণঃপ্রকাশের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়, হৃদয়স্পর্শী স্মৃতি ও অতীত ইতিহাস তুলে ধরতে সক্ষম হইনি।

পরিশেষে, আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তখনি স্বার্থক হবে মনে করি, যখন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চলার পথে এখান থেকে পাথেয় সংগ্রহ করবে এবং শহীদ ভাইদের রেখে যাওয়া জিম্মাদারী পালনে অনুপ্রেরণা লাভ করবে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন । আমীন।

জাহেদ হোসাইন
সভাপতি, ফেনী জেলা

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইসলামী পূণর্জাগরণের আন্দোলন শুরু হয় । ইমাম হাসান আল বান্না, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের হাত ধরে গড়ে উঠা আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে দীপ্ত গতিতে। এদেশে যার দীপ্ত পতাকাবাহী হলো বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী আন্দোলন একটি দুর্দমনীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে কমিউনিজমের পতনের ফলে বস্তুবাদী সভ্যতার সামনে একমাত্র প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় ইসলামী আন্দোলন। নব্বইয়ের দশকে উইলিয়াম হান্টিংটন তার বিখ্যাত 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বে বলতে বাধ্য হয়েছেন "পাশ্চত্য সভ্যতা ও ভোগবাদী সভ্যতার সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল ইসলাম"। শুধু তাই নয় ইসলামকে তিনি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এভাবে দুটি সভ্যতার মাঝে শুরু হল দ্বন্দ্ব। কখনো তা হয়েছে বুদ্ধিভিত্তিক, কখনো তা হয়েছে সহিংসতায়। যার প্রদীপ্ত উদাহরণ হল আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর ও সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ও আধিপত্যবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজো ইসলামের চরম শত্রু আবু জাহেল, উৎবা, শায়েবা ও আবু লাহাবের উত্তরসূরিরা আমাদের গঠনমূলক কোন কার্যক্রম কে বাধাহীন ও কন্টকমুক্ত হতে দেয়নি। বরং আদর্শের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে বেছে নেয় হিংসা, বিদ্বেষ, অপপ্রচার ও জুলুম নির্যাতনের মতো বর্বরতম পন্থা। যাদের নির্মমতার শিকার হয়ে ১৯৮৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্র ছাগলনাইয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের কৃতি সন্তান শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর । তাদের উত্তরসূরিরা ১৯৯৩ সালের ১২ই জানুয়ারি একই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাহসী সন্তান চট্টগ্রাম কলেজের গণিত বিভাগের মেধাবী ছাত্র শহীদ কাজী মোশাররফ হোসেন ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

www.pathagar.com

তার শাহাদাতের শোক কাটিয়ে উঠার আগে আবার ১৯৯৫ সালে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন শহীদ একরামুল হক খাঁন ও বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান শহীদ আলাউদ্দিন। তাদের হিংস্র দানবীয় থাবায় ১৯৯৬ সালের ১৯শে মে দাগনভুঁঞা ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ গোলাম জাকারিয়া। এছাড়া অতি সম্প্রতি ২০১৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আওয়ামী পুলিশের গুলির নির্মম আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন ফেনীর আল জামিয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র শিবিরের সাথী শহীদ হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান। এ আত্মদান সত্ত্বেও ছাত্রশিবিরের পথ চলা থেমে নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ছাত্রশিবির আজ একটি প্রেরণার নাম, আশার বাতিঘর। ফেনী জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। ফেনী জেলা ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ৩৭ বছর পার করেছে । এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের রয়েছে বহু অর্জন। রয়েছে বাতিলকে মোকাবেলার বহু ইতিহাস। যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি অনেক দিন থেকেই। অবশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমতে 'রক্তাক্ত ফেনী' স্মৃতি সংকলনটি পূণঃপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এ স্মরণিকায় বিগত সময়ে ঘটে যাওয়া একাধিক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণী, সাবেক দায়িত্বশীলদের পরিচিতি, স্মরণীয় মুহূর্ত গুলোর স্থিরচিত্র ও স্মৃতিচারণমূলক লেখা স্থান পেয়েছে। বহু তথ্য হারিয়ে যাওয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। অনেক সর্তকতার পরও কিছু অনাকাংখিত ভুল-ত্রুটি থেকে গেল। এ জন্যে সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। উক্ত স্মরণিকা প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। ছোট্ট এ গ্রন্থটি ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল তৎপরতা তাঁর দ্বীনের জন্যে কবুল করুন । আমীন

মু. মোজাম্মেল হোসেন

সেক্রেটারী, ফেনী জেলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর (সা) জীবনে রাজনীতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী এমন এক মহাসমুদ্র যে, লক্ষ লক্ষ লোকের আলোচনা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এর কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায়নি। তাই এই মহামানবের জীবনের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনা সম্বন্ধে এত গবেষণা হওয়ার পরও যেন অনেকেরই নতুন কোনো কথা বলার থাকে।

হজরত আয়েশা (রা)-এর একটি ছোট মন্তব্য নবী করীম (সা)-এর জীবনের বিশালতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। নবী চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে নবীর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে তিনি জওয়াব দিলেন– কুরআনই তাঁর চরিত্র। প্রকৃত কথাও এই যে, কিতাব আকারে আমরা কুরআন নামক যে গ্রন্থখানা পাঠ করি তা কিতাবী কুরআন মাত্র। আসল কুরআনই হলো নবীর জীবন। রাসূলপাকের জীবনে কুরআনের যে বাস্তব রূপ পাওয়া যায় তা থেকেই কুরআনের আসল পরিচয় মেলে। সুতরাং নবী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে যদি কেউ কুরআন মজিদকে বুঝবার চেষ্টা করে তাহলে হয় কুরআন তার নিকট এক অর্থহীন গ্রন্থ বলে মনে হবে, আর না হয় পাঠক কুরআনের মনগড়া অর্থই করবে। নবীর জীবনে যারা কুরআনের বাস্তব অর্থ তালাশ করে না, কুরআন বুঝবার সব দুয়ারই তাদের নিকট রুদ্ধ। রাসূলের বাস্তব জীবনের সাহায্যে যেমন কুরআন বুঝতে হবে, তেমনি রাসূলের জীবনকেও কুরআনের আলোতেই দেখতে হবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে নবীজীবন কুরআনের মতই ব্যাপক ও বিশাল। কুরআন পাককে যেমন ব্যাখ্যা করে শেষ করার উপায় নেই, রাসূলের জীবনী আলোচনা করার ব্যাপারেও কারও পক্ষে চূড়ান্ত কথা বলার ক্ষমতা নেই। চিরদিনই মানুষ এ মহামানবের জীবনসমুদ্র থেকে প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। এমনকি তাঁর এক একটি কথা ও ঘটনা থেকে অগণিত আলো বিচ্ছুরিত হবে। কোন দিনই মহাসাগরের অথৈ পানি নিঃশেষ হবে না।

আলোচ্য বিষয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিশাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। একটি আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে তাঁর আন্দোলনে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ে বহু যোগ্য লেখক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি বিভিন্ন মত ও পথের লোকদের নিয়ে যেরূপ শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে দিকটিও দুনিয়ার মানুষকে চিরদিনই অনুসরণের প্রেরণা দিতে থাকবে। এভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক দিকই আলোচনার জন্যে নিশ্চয়ই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আমরা সব দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না।

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি। নবী করীম (সা) কি শুধু

www.pathagar.com

একজন ধর্মীয় নেতা মাত্র ছিলেন? না তাঁর জীবনে রাজনীতিও ছিল, এখানে সে বিষয়েই আমরা আলোচনা করব। রাজনীতিকে তিনি জীবনে কতটুকু স্থান দিয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, সমসাময়িক রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধার কী কারণই-বা ছিল। একমাত্র এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে রাজনীতির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা আজ নানা কারণে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পরিণামে ধার্মিকদের মধ্যে আজ এমন লোক সৃষ্টি হয়েছেন, যারা দ্বীনদার ও পরহেজগার বলে সমাজে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও 'রাজনীতি' করাকে নিন্দনীয় মনে করেন, অথবা অন্তত পক্ষে অপছন্দ করেন। তাঁরা দেশের রাজনীতি থেকে পরহেজ করাকে (নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাকে) দ্বীনদারি ও তাকওয়ার জন্যে জরুরি মনে করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবনদর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে ইসলামকেও খ্রিষ্টধর্মের মতো এক অনুষ্ঠানসর্বস্ব পূজা পার্বণ বিশিষ্ট ধর্মমত বলে মনে করেন। তাঁদের ঈমান মোতাবেক ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। খ্রিষ্টধর্ম যাজকদের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকদের আড়াইশত বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ইউরোপের পদানত থাকা অবস্থায় প্রায় সকল মুসলিম দেশেই সে মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা অবস্থায় যে সব মুসলিম পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবন দর্শনে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, প্রধানত তারাই আজ স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর পরিচালক। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে ক'টি ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এর প্রত্যেকটিই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসকগোষ্ঠীর গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামকে খ্রিষ্টধর্মের মতোই শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পালনযোগ্য একটি ধর্মে পরিণত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্রটিকে ধর্মের আওতা থেকে পৃথক করার পরিকল্পনায় মেতেছেন।

এভাবে কতক ধার্মিক রাসূলের সংগ্রামী জীবনের দিকে লক্ষ্য না করে তাঁকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যেন আল্লাহর নবী সংসারত্যাগী কোনো বৈরাগী ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। এদিকে মুসলিম নামধারী শাসকেরাও রাসূলকে (সা) শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবেই স্বীকার (গ্রহণ নয়)

www.pathagar.com

করতে প্রস্তুত। মহানবীর সামগ্রিক জীবনকে একক ও পূর্ণাঙ্গ সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ না করার মনোভাবটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও সরল মুসলমান এদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

বিশেষ করে ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠান রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ইসলামের নামে আন্তরিকতার সাথে খেদমত করছেন বলে উপর্যুক্ত স্বার্থপর লোকেরা ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি না করার পক্ষে ঐসব প্রতিষ্ঠানের নজির পেশ করেন। তাদের মতে দুনিয়ার সব মত ও পথ নিয়ে রাজনীতি করা জায়েজ হলেও ইসলামী আদর্শকে নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অন্যায়। এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি ছিল কি না এবং ইসলামের রাজনীতি জরুরি কি না তা আলোচন করা প্রয়োজন।

রাজনীতির অর্থ কী?

রাজার নীতিকেই হয়তো একসময় রাজনীতি বলা হতো। আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিটিই রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলে পরিচিত। অবশ্য রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি পরিভাষা হিসেবে বর্তমানে এক কথা নয়। রাষ্ট্র ও সরকারের যেরূপ পার্থক্য, রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতিতে তেমনি তফাৎ। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়াদি হলো রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত আর সরকার সম্বন্ধীয় কার্যকলাপকেই বলা হয় রাজনীতি।

রাজনৈতিক কার্যকলাপঃ

সরকারি ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদেরকে সংশোধন করা, তাদের কার্যাবলির সমালোচনা করা, সরকারি নীতির ভ্রান্তি প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করা এবং এ জাতীয় যাবতীয় কাজকেই রাজনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই হলো সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কার্য। ভ্রান্ত নীতি ও আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে দেখে সরকারি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করে সঠিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করাই প্রধান রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

বিশ্বনবীর দায়িত্বঃ

এখন দেখা যাক, আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সা) কে যে বিরাট দায়িত্বসহ পাঠিয়েছিলেন তা পালন করতে গিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক কাজ করতে হয়েছিল কি না? যদি তিনি নবী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়, তাহলে রাজনীতি করা ইসলামের তাগিদই মনে করতে হবে। নবী বলে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তাঁর গোটা জীবনই যদি আমাদের জন্যে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তাঁর রাজনৈতিক কাজগুলো অনুসরণের অযোগ্য হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? হযরতের ওপর কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি কিভাবে তা পালন করেছিলেন তা আলোচনা করলেই বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি কতটা ছিল সে কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে কোন কর্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কুরআন মজিদের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন আল্লাহ বলেন, "তিনিই এ সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক্বসহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দ্বীনের ওপর একে (দ্বীনে হক্বকে) বিজয়ী করে তুলেন। এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (সূরা আল ফাত্হ : ২৮)

এ আয়াতের শেষ অংশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রধানত কোন কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি কারও পক্ষে জানবার উপায় নেই। সুতরাং সে বিষয়ে অন্য কারও সাক্ষ্যই গ্রাহ্য নয়– আল্লাহর সাক্ষ্যই সেখানে যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে কোন একটি দিক বা বিভাগকে নিজেদের রুচিমত প্রধান দিক বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

হয়েছে। সাত অন্ধের হাতি দেখার মতো, কেউ তাঁর বিশাল জীবনের এক অংশ থেকে শুধু হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন দিকটিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁর নামাজ রোজা, তাসবিহ তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের দিকটিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউবা তাঁকে একজন আরব জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবেই দেখেছেন। আবার কেউ শুধু সর্বহারাদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করে নিজ নিজ মত ও পথের সমর্থনে রাসূলকে দলিল হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ জাতীয় সবাই রাসূলের গোটা জীবনধারাকে এক সাথে বিবেচনা করে রাসূলের জীবনের মূল লক্ষ্যটুকুকে বুঝতে সক্ষম হননি। তারা অন্ধের মতো হাতিটির যে টুকু দেখতে পেয়েছেন সে টুকুই রাসূলের গোটা জীবন বলে ধারণা করেছেন। এদের অনেকেই হয়ত সাত অন্ধের ন্যায় আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং রাসূলকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন তার সাথে এঁদের ধারণার কোনো মিল নেই।

হেরাগুহায় হযরত ধ্যানমগ্ন থাকা, নামাজ রোজায় মশগুল হওয়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হওয়া এবং সর্বহারাদের দুর্গতি দূর করার চেষ্টা চালানো– এ সবই তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায় সত্য। এগুলো তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনা হলেও এর কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। এ সবই হয়ত জীবনের মূল দায়িত্বের সাথে সংশিষ্ট এবং তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার উপযোগী। কিন্তু ঐ সব কাজের কোনোটাই রাসূলকে পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

রাসূলের প্রধান দায়িত্বঃ

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে পাঠাবার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটাই নবী জীবনের প্রধান দায়িত্ব। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলকে একমাত্র দ্বীনে হক্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং মানব রচিত যাবতীয় দ্বীনের ওপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে স্পষ্টই বুঝা গেলো যে, রাসূলকে শুধু একজন প্রচারক অথবা ধর্মনেতার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। দ্বীন ইসলামরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানটিকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হযরতের প্রধান দায়িত্ব ছিল। দ্বীন ইসলাম মানব সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা নবী জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি যখন যা করেছেন একমাত্র সে লক্ষ্য পৌঁছার জন্যই করেছেন এবং সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে এই একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

রাসূলের বিপ্লবী আন্দোলনঃ

মানব সমাজে কোন না কোন ব্যবস্থা কায়েম থাকেই। সামাজিক রীতিনীতি, আইন, শাসন, বিচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত থাকে। যে সমাজব্যবস্থা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে তা যেমন আপনিই কায়েম থাকে না তেমনি তা আপনা আপনিই উৎখাত হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখে। যখনই কেউ এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আওয়াজ তোলে তখনই সর্বশ্রেণীর নেতৃত্ব একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করে। কারণ এসব নেতৃত্বের স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়-ই কায়েম থাকা সম্ভব। এগুলোই সমাজের কায়েমি স্বার্থ (VESTED INTEREST)।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্যে যখনই কোন প্রচেষ্টা চলে তখনই কায়েমি নেতৃত্বের সাথে সংঘর্ষ বাধে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, আইন ও শাসন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো মিলে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নতুন ধরনের নীতি ও আদর্শে সমাজকে গঠন করার আওয়াজ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কায়েমি নেতৃত্ব চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এ আওয়াজকে বন্ধ করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

সমাজে এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করাকে বিপ্লব বলে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত সরকারের উত্থান-পতন বা দল বিশেষের নাটকীয় ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব নাম দিলেও তাকে প্রকৃত বিপ্লব বলা চলে না। গোটা সমাজের মৌলিক ও ব্যাপক পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলে। এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যে যে আন্দোলন প্রয়োজন তারই নাম বিপ্লবী আন্দোলন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরব ভূমিতে যে ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা হঠাৎ সংঘটিত হয়নি। আরবের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়ার জন্যে রাসূলকে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ভিত্তিতে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করতে হয়। দীর্ঘ ২৩ বছরে অবিরাম চেষ্টায় সে বিপ্লব সফল হয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ কোন নজির পাওয়া যায় না যে, কায়েমি নেতৃত্ব কোনো বিপ্লবী আওয়াজ শুনে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়বার জন্যে খুশি হয়ে নেতৃত্বের আসন ত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে। বরং সব সমাজে সব কালেই দেখা গেছে যে, কায়েমি নেতৃত্বের অধিকারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকারই চেষ্টা করেছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে তাদেরকে উৎখাত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবার যে দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল তা পালন করার প্রথম পদক্ষেপেই মক্কার নেতৃত্ব অস্থির হয়ে উঠলো। পয়লা লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলো কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াত থেকে। সমাজের কায়েমি স্বার্থের অধিকারীরা বুঝতে পারলো যে, এ আওয়াজ তাদের বিরুদ্ধেই স্পষ্ট বিদ্রোহ। নেতৃত্বের লোভ, অর্থসম্পদ, নারী লালসা ইত্যাদির (যা তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য) বিনিময়ে তারা হযরতকে এ পথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করলো। হযরত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হলে তাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেও মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যারা করেন তাদের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভবই নয়। তাই এ ধরনের আন্দোলনের সাথে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য। দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের পর নবী করীম (সা) বিজয়ী হন এবং ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতিঃ

অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাই হলো আদর্শ ইসলামী আন্দোলন। এ ধরনের আন্দোলন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যতীত কী করে সম্ভব হতে পারে? সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যারা কিছুটা চর্চা করেন এবং মানবসমাজের সমস্যা নিয়ে যারা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের পক্ষে এ কথা বোঝা অত্যন্ত সহজ। যারা স্থূল দৃষ্টিতে ইসলামকে দেখেন তারা এটাকে একটা ধর্ম মাত্র মনে করে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে আলাদা

www.pathagar.com

করতে চান। তারা হয় আন্দোলনের অর্থই বুঝেন না, আর না হয় আন্দোলনের সংগ্রামী পথে চলার সাহস রাখেন না। ইসলামকে একটা জীবন বিধান হিসেবে বুঝে যারা রাজনীতি করা পছন্দ করেন না, তারা নিশ্চয়ই পার্থিব কোন স্বার্থের খাতিরে অথবা কায়েমি নেতৃত্বের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এরূপ নিষ্ক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন।

নবী করীম (সা) যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাতে প্রকৃত পক্ষে চরম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। দেশের নেতৃত্ব যদি অনৈসলামিক লোকদের হাতে থাকে, তাহলে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি। রাজনীতি করাকে যারা দ্বীনদারির খেলাপ মনে করেন তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ চরম রাজনীতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? যারা এ নীতি অবলম্বন করেন তারা কি নিজেদেরকে রাসূলের চেয়েও বিশেষ দ্বীনদার বলে মনে করেন? তারা নিশ্চয়ই তা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা রাজনীতি অর্থই বুঝেন না এবং দ্বীনের দাবি সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা রাখেন না।

রাসূলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যঃ

আজকাল রাজনীতি করাকে যে কারণে নেক লোকেরা ঘৃণা করেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে রাজনীতির প্রচলন হয়েছে তা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই পছন্দ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের জঘন্য কোন্দলই এক শ্রেণীর লোকের নিকট রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ টাকার জোরে, কেউ ভোটের বলে, আর কেউ অস্ত্রের দাপটে ক্ষমতা দখল করতে সর্বপ্রকার অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করে থাকেন। এসব লোক জঘন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গদি দখল করার পর তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকারটুকুও হরণ করে। নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠনের প্রচেষ্টাকেও এরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে দমন করতে চান।

শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলনকে এ মনোভাব নিয়েই দমন করার চেষ্টা চলেছিল। শুধু শেষ নবীই নয়, হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর আন্দোলনের সাথেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা নবীদের আন্দোলনের পরিণতি যে নেতৃত্বের পরিবর্তন সে কথা ক্ষমতাসীনদের বুঝতে বাকি ছিল না। কিন্তু নবীদের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পূর্বে নবীদের নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘজীবন যে নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় বহন করে তা ইসলাম ব্যতীত আর কোন আদর্শবাদী আন্দোলনে সমপরিমাণে পাওয়া যায় না। সমাজে এ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠাই তাঁদের আন্দোলনের প্রধান মূলধন। শেষ নবীর রাজনীতিতে এ নিঃস্বার্থপরতা ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল ছিল। এ জন্যেই তাঁর বিরুদ্ধে কোন সস্তা শ্লোগান কার্যকরী হয়নি। তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

হযরতের রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, উপায় উপকরণের পবিত্রতা। তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দুশমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশও পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হতো তাহলে তিনি পূর্বের সব

www.pathagar.com

দোষ মাফ করে দিতেন।

তাঁর রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃত্বের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাদশাহ হতে পারতেন।

চারিত্রিক পবিত্রতা, উপায় ও পন্থার পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রাসূলের রাজনীতিকে স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদি কেউ ইসলামী রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাকে মহানবীর এ তিনটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। যাদের চরিত্র, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য অপবিত্র বলে বোঝা যায়, তারাও যদি ইসলামের নামে রাজনীতি করে তা হলে ইসলামের উপকারের চাইতে অপকারই বেশি হয়। এদের রাজনীতির সাথে রাসূলের রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এদের রাজনীতি অন্যান্য স্বার্থবাদী রাজনীতির চেয়েও জঘন্য।

কায়েমি নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাসূলের কর্মপন্থাঃ

কোনো নবীই প্রচলিত নেতা বা শাসকদের নিকট নেতৃত্বের গদি দাবি করেননি। হযরত ইবরাহিম (আ) নমরুদের নিকট, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের নিকট এবং শেষ নবী মক্কা ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পেশ করেছেন; তাদেরকে গদি পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাননি। তবুও প্রত্যেক রাসূলের সঙ্গেই কায়েমি নেতৃত্বের সংঘর্ষ বেধেছে। সমাজের সর্ব শ্রেণীর লোকই রাসূলগণকে সকল দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামের আহবান জানানো সকল কায়েমি স্বার্থই যুক্তফ্রন্ট করে তাঁদের বিরোধিতা করেছে।

প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ কোনো কালেই ইসলামের আহ্বান গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কেননা, তাদের পার্থিব যাবতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। তবু নবীগণ ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম নেতাদের নিকটই পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আ'রাফের অষ্টম রুকু থেকে একাধারে কয়েকটি রুকুতে আল্লাহ পাক নূহ (আ), হুদ (আ), সালেহ (আ), লূত (আ), শোয়াইব (আ) ও মূসা (আ)-এর ইসলামী আন্দোলনগুলোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাসূলই সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিকট দাওয়াত পেশ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। সেখানে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজপতিগণ প্রত্যেক রাসূলেরই বিরোধিতা করেছে।

নেতৃবৃন্দের নিকট প্রথম দাওয়াত পেশ করার কারণঃ

নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ কোন আদর্শকে গ্রহণ না করলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কোন আদর্শের বিপরীত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সমাজে সে আদর্শ কায়েম হবে। তাই নবী করীম (সা) পয়লা নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। নেতাগণ এ দাওয়াত কবুল না করলেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাবার ফলে সমাজের অনেক লোকের নিকটই ইসলামের আওয়াজ পৌঁছবার সুযোগ হলো।

ইসলামী আদর্শের উপযোগী নেতৃত্ব ব্যতীত দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইসলাম কবুল করতে রাজি নয়। এ অবস্থায় যেসব লোক দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতে রাজি হলেন তাঁদেরকে নিয়েই আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ব্যতীত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আর কোনো পথই রইল না।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদী নেতৃত্ব কোনোকালেই

www.pathagar.com

প্রস্তুত (Readymade) পাওয়া যায় না। আদর্শের আন্দোলন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজে যখনই আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব কায়েম হয় তখনই আদর্শকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব হয়। নেতৃত্বের এ পরিবর্তন হযরতের আন্দোলনের মাদানী স্তরে গিয়ে সম্ভব হলো। অতঃপর আট বছর দীর্ঘ সংগ্রামের পর আরবের বুকে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্বনবীর এ কার্যক্রম যে সুষ্ঠু রাজনীতির সন্ধান দেয় তা প্রত্যেক আদর্শবাদী বিপ্লবী প্রাণকেই সংগ্রাম মুখর করে তোলে। মহানবীর বিপ্লবী জীবনকে অধ্যয়ন করার পর কারও মনে এ প্রশ্ন জাগা সম্ভবই নয় যে, তিনি রাজনীতি করে গেছেন কি না?

শেষ কথা

বিশ্বনবীর দায়িত্ব পালন করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে অপরিহার্য ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। রাজনৈতিক চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে তিনি ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমই হতেন না। আজ যদি কেউ দ্বীন ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

কিন্তু স্বার্থপর, পদলোভী ও দুনিয়া পূজারীদের রাজনীতি ইসলামের জন্যে কোনো দিক দিয়েই সাহায্যকারী নয়। ইসলামের নামে যারা এককালে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নবীর নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করেননি বলেই পাকিস্তানে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

স্বার্থপর ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি যেমন ইসলাম বিরোধী, নবী অবলম্বিত রাজনীতি থেকে পরামুখী হওয়াও তেমনি অনৈসলামী। বরং রাসূল যে ধরনের রাজনীতি করেছেন তা মুসলমানদের জন্য প্রধানতম ফরজ। এ ফরজটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতিই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সুতরাং কতক লোক পরহেজগারির দোহাই দিয়ে রাজনীতি করা অপছন্দ করলেও রাসূলের খাঁটি অনুসারীদের পক্ষে তা পছন্দ না করে কোনো উপায়ই নেই।

লেখকঃ ভাষাসৈনিক ও সাবেক আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি

শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানী।

- কবি ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

রক্তাক্ত ফেনী

শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য

অধ্যাপক তাসনীম আলম

মুমিনের নিকট ঈমানের অপরিহার্য দাবী শাহাদাত। সৃষ্টির আদি হতে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণহীন ধারাবাহিকতা, সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন সংঘাত, কল্যাণ ও অকল্যাণের রশি টানাটানি, আলো ও আঁধারের বৈপরীত্য সুন্দরের আরোহী কাঠিন্যতার প্রাচীর মাড়িয়ে ফুলের উৎসব অসুন্দরের আস্ফালন ও হীনতা, অতল গহ্বরে পতন ঠেকাতে একজন মুমিনের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ও জীবনাচার হবে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত। তার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়, হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ, সামাজিক তৎপরতায় অংশ গ্রহন, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, সাংস্কৃতিক রুচিবোধ ও মননশীলতা, অবসর ও বিনোদন, শয়ন ও জাগরণ সব কিছুই বিপ্লবী ঘোষণা দেবে শাহাদাতের চূড়ান্ত প্রত্যাশা, মুমিনের জীবন চলার প্রতিটি কদম, হাতের প্রতিটি স্পর্শ, চাহনীর প্রতিটি পলক, জিহ্বার প্রতিটি বুলি, লিখনীর প্রতিটি আঁচড়, ব্যয়ের প্রতিটি কপর্দক, সময়ের প্রতিটি মুহুর্ত, রক্তের প্রতিটি ফোটা এবং হৃদয়ের সবগুলো অনুভূতি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার জন্যে থাকে সতত নিবেদিত। শাহাদাত বা শাহাদাহ শব্দটি অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি আরবী শব্দ। শাহাদাহ মূল শব্দ থেকে এর উৎপত্তি।

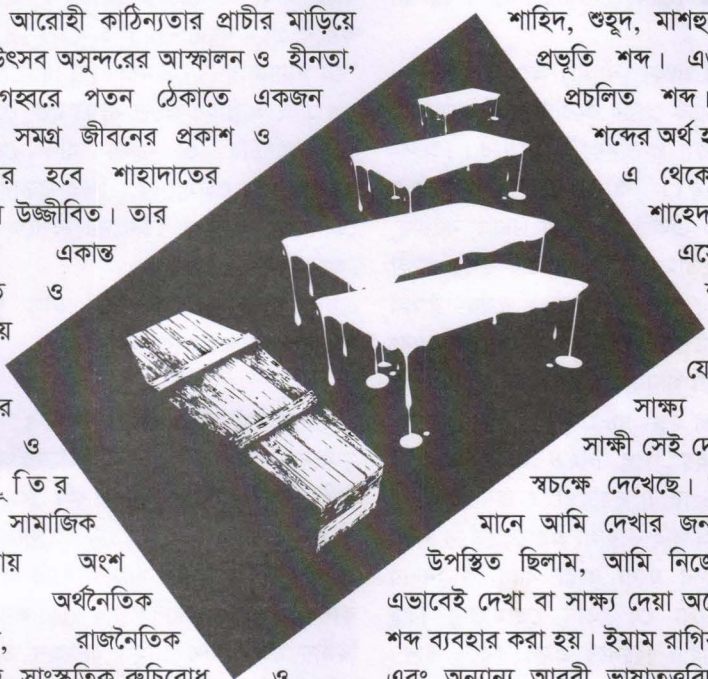

আর এইশব্দ থেকেই নির্গত হয়েছে শহীদ, শাহিদ, শুহূদ, মাশহুদ, তাশাহুদ প্রভৃতি শব্দ। এগুলো খুবই প্রচলিত শব্দ। শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষী সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। আশ-শাহিদ মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা বা সাক্ষ্য দেয়া অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানি এবং অন্যান্য আরবী ভাষাতত্ত্ববিদগণ শব্দটি মোটামুটি একই রূপ লিখেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন শহীদ মানে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে কিংবা অন্য দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে সাক্ষ্য দেয়া। আবার কেউ বলেছেন- শাহাদাত হচ্ছে এমন জ্ঞান বা জ্ঞানের বিবরণ যা চোখে দেখে বা অন্তর দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহাদাত শব্দের অর্থের সাথে জড়িত রয়েছে নিম্নোক্ত শব্দগুলো ঃ

www.pathagar.com

উপস্থিতি, জানা, দেখা, দর্শন, অন্তঃদৃষ্টি, জ্ঞান কিংবা (স্বচক্ষে অথবা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা অর্জিত) জ্ঞানের বিবরণ বা সাক্ষ্য প্রদান, মন মগজ ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা প্রভৃতি।

কুরআনে শাহাদাত শব্দের অর্থ ব্যবহারঃ

আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে প্রেরণাদাত্রী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। শাহাদাত শব্দটি তাই ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্নভাবে। আমরা এখানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত কয়েকটি আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করছি-

ক) আদর্শের সাক্ষ্য (নমুনা) অর্থে ঃ হে নবী। আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (আল-আহযাব ৪৫)। আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ করেছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারে। (বাকারা-১৪৩) যেন রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা গোটা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারো। (আল হজ্ব- ৭৮)

খ) আল্লাহর পথে নিহত হবার অর্থে ঃ তোমাদের উপর এ দুরাবস্থা এ জন্য চাপানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার এবং এইজন্যে যে তিনি তোমাদের কিছু লোকদের শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আল- ইমরান-১৪০)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং রাসুলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো- নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ, আর শহীদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার ও নূর। (আন-নিসা ঃ ৬৯)

গ) উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অর্থেঃ "আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় একদল ঈমানদার লোক যেন উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করে। (আল-নূরঃ ২)

ঘ) জ্ঞান অবগতি ও জানা অর্থে ঃ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি সাক্ষ্য অর্থ্যাৎ প্রতিটি বিষয়ে তিনি অবগত, তার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। (মুজাদালাহ্ ঃ ৬, আহযাব ঃ ৫৫)

ঙ) আদালতের সাক্ষ্য অর্থে ঃ আর যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে অতঃপর (দাবীর স্বপক্ষে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না তাদের আশিটি কড়া মারো এবং এ ধরণের লোকদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহন করো না। (আল নূর -৪)।

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ন্যায় বিচারের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্যে সাক্ষী হও, তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্য যদি তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতামাতার এবং তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের বিপক্ষেও যায়। (আন নিসা ঃ ১৩৫)

এমনি করে বহু জায়গায় আল কুরআনে শাহাদাত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

শাহাদাত ঈমানের অপরিহার্য দাবী ঃ

মুমিনের নিকট "শাহাদাত" ঈমানের অপরিহার্য দাবী। শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভাল ছাত্র যেমন ভাল ফলাফলের প্রমাণ দেয়ার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোষহীনভাবে লড়াই করে যাবে। আন্দোলনের কর্মকান্ডে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যু অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল না রাখে, তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার

www.pathagar.com

মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- আল্লাহর পথে লড়াই করে সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয়, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (আন নিসা- ৭৪)

শাহাদাতের মর্যাদাঃ একজন মু'মিনের শাহাদাতের তামান্নায় সতত উজ্জীবিত, শাহাদাতের এই অমীয় সূধা পান করতে কেন তীব্র আকাঙ্খা? কেন জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও তার এই পরম চাওয়া-পাওয়া শাহাদাত চাই। সব রকম নেকীর উপর ত্যাগ আছে। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদ হবার চাইতে বড় কোন নেকী, এর চাইতে বড় কোন ত্যাগ ও কুরবানী হতে পারেনা। এটাই মানব জীবনের সকল নেকী ও পূণ্যের চুড়ান্ত শিখর। আর এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা শহীদকে অকল্পনীয় উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করেন, শাহাদাতের এই দরজা নবুয়্যতের দরজার চাইতে বড় না হলেও শহীদ হওয়ার জন্য স্বয়ং নবীও তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করেন। এ সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্যেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এবং বহু সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত আছে, শহীদের মহা পুরস্কার ও সম্মান-মর্যাদার ব্যাপারে। আমরা দেখবো শাহাদাতের এ মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (স) কি বলেন।

১। শহীদরা অমর ঃ ইহলৌকিক এ জীবন থেকে শহীদরা বিদায় নিলেও পৃথিবীতে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। আর পরজগতে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবিত করে নিজের মেহমান হিসাবে জান্নাতে থাকতে দেন। আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদের মৃত মনে করোনা, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত। আল্লাহর নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে'।

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, প্রকৃত পক্ষে তারা জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পারোনা। (আল- বাকারা ঃ ১৫৪)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসুল করীম (সা) এর নিকট শহীদের অমরত্ব সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাদের প্রাণ সবুজ পাখীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমন করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত, অতঃপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে। (মুসলিম, তিরামিযী, ইবনে মাজাহ)

২। শহীদরা নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না ঃ আপন মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে, দয়াময় মালিক তাদের শাহাদাতের আঘাতকে ব্যথাহীন করে দেন। শহীদ করার জন্য যতোবড় আঘাতই তাদের উপর আনা হোকনা কেন, তাতে তাদের কোনো কষ্ট হয়না। তারা পায়না কোন যন্ত্রণা। প্রিয় রসুল (সা) বলেছেনঃ শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে, কেবল তারা ততটুকুই অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী- আবু হোরায়রা)

৩। শহীদের লাশ পঁচে না ঃ

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকের সূত্রে কুরতুবীতে আলোচিত হয়েছে এভাবে ঃ হযরত ইবনে জামুহ (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) উভয় আনসার সাহাবীই উহূদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের উভয়কে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। এর চল্লিশ বছর পর একবার প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হওয়ায় তাদের কবর ভেঙে যায়। পানির প্রবল চাপ দেখে যখন অন্যত্র সমাধিস্থ করার জন্য তাদের কবর খনন করা হলো তখন তাদের ঠিক সে অবস্থায় পাওয়া গেলো যে অবস্থায় তাদেরকে দাফন

www.pathagar.com

করা হয়েছিল। মুয়াবিয়া (রা) ঘোষণা দিলেন তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের মৃতদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও। এ ঘোষণার পর মৃতদেহ উঠিয়ে ফেলা হল। দেখা গেল তারা যে অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন ঠিক সে অবস্থায়ই রয়েছেন। খনন কাজের কোন এক পর্যায়ে হযরত হামযার (রা) পায়ে কোদালের আঘাত লেগে গেলে সাথে সাথে তা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ ঘটনা ঘটে উহূদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পর। বস্তুত এসব ঘটনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তায়ালা শহীদদের লাশ পঁচতে দেন না।

৪। কিয়ামতের দিন শহীদরা তাজা রক্ত নিয়ে উঠবে ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন তাকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত রেখে কোন প্রকার গোসল ছাড়াই সমাহিত করা হয়। তাকে নতুন কাপড়ের কফিন পরানো হয় না। শাহাদাতের সময় তার দেহে যে কাপড় থাকে সে কাপড়েই তাকে সমাহিত করা হয়। শহীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান এটাই এবং এ অবস্থায়ই তারা হাশরের ময়দানে উঠবে। ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত বের হতে থাকবে। রাসুল (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়েই সে উঠবে আর তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং রং হবে রক্তের মতোই, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নবী পাক (সা) বলেন, 'কসম সেই সত্তার মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতের মুঠোয়, কেউ আল্লাহর পথে কোন আঘাত পেলে কিয়ামতের দিনে সে আঘাত নিয়ে হাজির হবে। আর আঘাতের অবস্থা হবে ঠিক সেদিনকার মতো যেদিন সে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, এর রং হবে রক্তের মতো কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো' (বুখারী ও মুসলিম)। এটা শহীদের কত বড় সৌভাগ্য যে, সে দিন তারা রক্তাক্ত দেহ এবং রক্তভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে হাশর ময়দানে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে।

৫। কবর আযাব থেকে রেহাই এবং সুপারিশ করার অধিকার লাভ ঃ মহান আল্লাহ শহীদের জন্যে অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষমা, মর্যাদা ও বিরাট পুরস্কারের কথা শুনে কার না ঈর্ষা হবে? আমাদের প্রিয় রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্যে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। সে গুলো হচ্ছে ঃ

ক) প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাত যে তার আবাসস্থল তা চাক্ষুষ দেখানো হয়।

খ) তাকে কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়।

গ) সে ভয়ানক আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকে।

ঘ) তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে, যার এক একটি ইয়াকুত পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।

ঙ) তাকে উপঢৌকন স্বরূপ আয়তনয়না হূর প্রদান করা হবে এবং

চ) তাকে সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মেকদাম ইবনে মা'দীকরব)।

> আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং তার মোকাবিলায় অটল অবিচল থাকলো এমনকি এমন অবস্থায় নিহত হয়ে গেলো, তাকে কবরে কোন প্রকার চিন্তার সম্মুখীন হতে হবে না। (তাবারানী)

www.pathagar.com

৬। শহীদের জন্যে রহমত রিয্‌কে হাসানা ও সন্তোষজনক জান্নাত ঃ

শহীদের বিভিন্ন নেয়ামত এবং অনুগ্রহ রাজির ব্যাপারে আল কুরআনে বহু প্রমাণ মেলে। তাদের সুসংবাদের কোন শেষ নেই। আল্লাহ বলেন, যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তার পথে নিহত হয়েছে কিংবা মরে গেছে আল্লাহ তাদেরকে রিয্‌কে হাসনা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্টতম রিযিকদাতা। তিনি তাদের এমন স্থানে পৌছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (আল হজ্বঃ ৫৮-৫৯)

তারা যদি আল্লাহর পথে নিহত হয় কিংবা গাজী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর নিকট থেকে তারা সমান প্রতিদান পাবে বলে এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। শহীদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার ঃ

মুজাহিদরা খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ কিংবা গাজী উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য মহান পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই মহা পুরস্কার তারাই লাভ করবে যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেবার মতো সৎ সাহস রাখে। আল্লাহ ঘোষণা করেন- সেই সব লোকদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং নিহত কিংবা বিজয়ী হয়। আমি অবশ্যই তাদের বিরাট পুরস্কার দান করবো। (আস- নিসা ৭৪)

সূরা আল ইমরানে শহীদের প্রাপ্য পুরস্কার সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষনা করেন- তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব। আর এমন জান্নাত তাদের দান করবো যার তলদেশে রয়েছে সদা প্রবাহমান ঝর্নাধারা। এ হচ্ছে আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার আর আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার। (আল-ইমরান ঃ ১৩৬)

> আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, প্রকৃত পক্ষে তারা জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পারোনা। (আল- বাকারা ঃ ১৫৪)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসুল করীম (সা) এর নিকট শহীদের অমরত্ব সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাদের প্রাণ সবুজ পাখীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমন করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত, অতঃপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে। (মুসলিম, তিরামিযী, ইবনে মাজাহ)

৮। আল্লাহর সান্নিধ্য এবং যা খুশী তাই পাবার অধিকার লাভ ঃ

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে কোন দৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। কোন নবীও আল্লাহকে দেখতে পাননি কিন্তু শহীদরা মৃত্যুর পর পরই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসুল (সা) শহীদের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেন- হে জাবির, আমি কি তোমাকে তোমার পিতার সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাতের সু-সংবাদ দেবনা? জাবির বললেন, অবশ্যই দিন হে আল্লাহর রাসূল (সা)। তখন তিনি বলেন ঃ হে আমার

www.pathagar.com

গোলাম তোমার যা খুশি আমার নিকট চাও। আমি তোমায় দান করবো। তিনি জবাবে বলেছেন, হে আমার মনিব আমাকে আবার জীবিত করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন আমি আবার আপনার পথে শহীদ হয়ে আসি। তখন আল্লাহ তাকে বলেন, আমার এ ফয়সালা তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, মৃত লোকেরা ফিরে যাবেনা। তখন তোমার পিতা আরজ করেন হে আমার মনিব তবে অন্তত আমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা আপনি দান করেছেন, তার সুসংবাদ পৃথিবীবাসীদের জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন-

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত বলোনা, তারা জীবিত। (জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ঃ জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ)

৯। শহীদ পরিবারের গৌরব ঃ

তিরমীযি, ইবনে মাজাহ হাদীস গ্রন্থে মেকদাম ইবনে মাদীকারাব বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সা) বলেছেন, একজন শহীদকে তার সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।

তাই আল্লাহ তায়ালা যদি কারো সন্তানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করেন তবে তারা শহীদের পিতামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাদের জন্য এর চাইতেও খুশীর বিষয় হলো তারা তাদের শহীদ সন্তানের সুপারিশ লাভের আশা পোষণ করতে পারেন। একজন শহীদ যেমন তার বংশে, পরিবারে এক শ্বাশত ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান তেমনি আবার তার অনুসারীদেরকে ছাড়াও তার আপন বংশের লোকদেরকে চিরদিন জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন। সুতরাং মুমিনদের দৃষ্টিতে শহীদ পরিবার অত্যন্ত সম্মানীয় এক আদর্শ পরিবার। শহীদের পিতা মাতা মুমিনদের নিকট শ্রদ্ধাষ্পদ, শহীদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনকে সকল মুমিন নিজেদেরই আত্মীয় স্বজন মনে করেন। এসব দিক থেকেই শহীদ পরিবার গৌরবান্বিত।

১০। শাহাদাত উচ্চ মর্যাদার মডেল ঃ

শহীদের অফুরন্ত মর্যাদার আরেক বিশেষ দিক হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শহীদদেরকে উচ্চ মর্যাদার এক বিশেষ মডেল হিসেবে ধরা হয়েছে। যেমন- কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করবে, সে ঐসব লোকদের সংগী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোকগণ। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (আন নিসাঃ ৬৯-৭০)। এ আয়াতে পরকালীন উচ্চ মর্যাদার কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

১) নবীগণের স্তর
২) সিদ্দীকগণের স্তর
৩) শহীদগণের স্তর
৪) সালেহ বান্দাদের স্তর

রাসুলে খোদা (সা) নিজেও কিছু সংখ্যক লোককে উপরোক্ত লোকদের সাথীত্ব লাভে সক্ষম হবার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন একবার এক ব্যক্তি নবী পাকের (সা) নিকট এসে বললো, ওগো আল্লাহর রাসুল, আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, আমার মালের যাকাত পরিশোধ করি এবং রমযান মাসে রোজা রাখি। তার বক্তব্য শুনে নবী পাক (সা) বললেন, তুমি যা বললে এর উপর কায়েম থেকে যে মারা যাবে কিয়ামতের দিন সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ, আমর ইবনে মুররাহ আল জু'হানী)। এখন আমাদের কাছে একথা পরিস্কার হলো, শাহাদাত এমন একটি উচ্চ মানের মর্যাদা, যে পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রকৃত ঈমানদারের কাম্য। সিদ্দীক ও শহীদদের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হবার আর কোন অবকাশ

www.pathagar.com

নেই। সুতরাং শাহাদাত উচ্চ মর্যাদার মডেল।

এ সকল সম্মান ও মর্যাদার কারণে সাহাবায়ে কিরামগণ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার জন্য ছিলেন সর্বদা ব্যাকুল, পাগলপারা। একটি ঘটনাই তার উজ্জল নমুনা- একবার রাবী আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশয়ারী (রা) বললেন, তারা দু'জনে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন, রাসুল (সা) বললেন নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজা গুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাড়িয়ে গেল যার কাপড় চোপড় তেমন ছিলনা, বললো হে আবী মূসা, রাসুল (সা) কি বললেন শুনলেন তো? তিনি বললেন হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের সালাম দিয়ে যাচ্ছি আর আসবোনা। তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙে ফেলে দিলেন। এর পর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন, যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রাসুল (সা) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

উপসংহার ঃ

শাহাদাতের রক্ত আল্লাহ বৃথা যেতে দেন না। এটাই আল্লাহর বিনিময়। শহীদের উত্তর সূরীরা যখন সংগঠিতভাবে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন তাদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। বিংশ শতকের কর্মক্লান্ত দিনগুলো যখন বিদায়ের পটে, আমরা বিশ্ববাসী উৎসুক্য নেত্রে মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সুর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অহংকার বিশাল টাইটানিক সব কিছুসহ কালের অতল গহ্বরে বিলীন প্রায় অবস্থায় ক্যাপ্টেন টি.সি. ইলিয়ট বিশ্ববাসীকে জরুরী ম্যাসেজ দিয়ে বলেছেন, Pray for us now, we are at time of our death' -"আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, আমরা মৃত্যুর দ্বারে।" গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ যেন সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভোগবাদ, নেশা, ও যৌনাচারের এ ভয়াল সমুদ্র থেকে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করেছে কোরআনের সেই অমীয় বাণী- "হে মনিব, তুমি আমাদের এই জালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে বের করে নাও"। এই মজলুম, যৌনাশক্ত, দিশেহারা পথিককে অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহের ডাষ্টবিন থেকে তুলে এনে হেরার রাজতোরণ দেখানোর দায়িত্ব নিতে হবে এমন একদল মর্দে মুমিনকে যারা ঈমানের চেতনায় তেজদীপ্ত এবং শাহাদতের উদ্দীপনায় সদা উদ্বেলিত আর যারা বাতিলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে উমর ফারুক, উসমান, হামযা, জাফর বিন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হুসাইন মুসাইয়্যব, সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী, তিতুমীর, সালাহউদ্দীন, ইবনে কাশিম, হাসানুল বান্নাহ, আব্দুল কাদের আওদাহ, সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল মালিক, আব্দুল কাদের মোল্লা, শাব্বির, হামিদ, আইয়ুব, জাব্বার এর মত ভূবন কাঁপানো সে ঘোষণা সদম্ভে উচ্চারণ করতে পারে যা আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন পাকে উল্লেখ করেন- "হে প্রভু আমরা তোমার উপর ঈমান আনলাম আর শহীদদের কাতারে আমাদের নাম লিখে দাও।" বিশ্বজাহানের মালিকের কাছে সিজদাবনত চিত্তে আমাদেরও মোনাজাত, হে আল্লাহ! এই দিক ভ্রান্ত জাতির কণ্ঠে সত্যের অবিনাশী গান তুলে দিতে আমরাও শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করতে প্রস্তুত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

লেখকঃ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মহান মর্যাদা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য

-অধ্যাপক মফিজুর রহমান

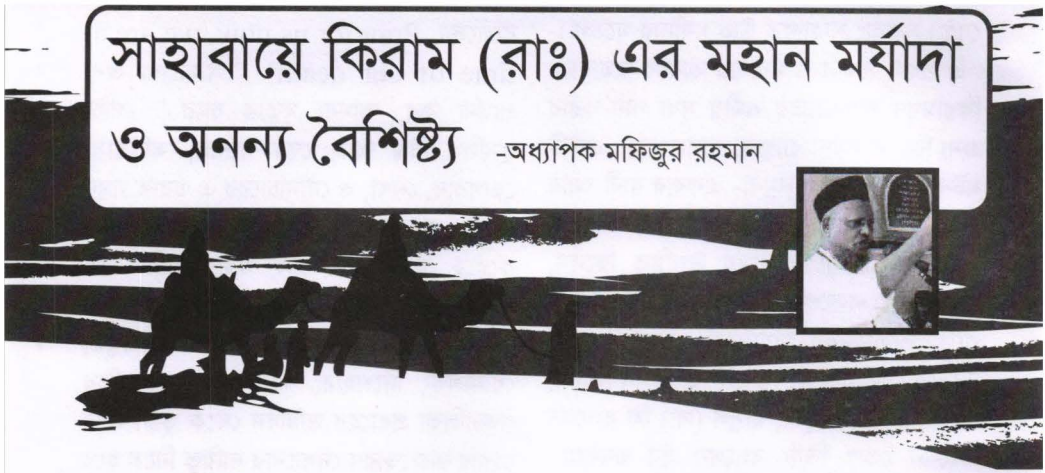

পরিচয় ঃ

সাহাবা শব্দের আভিধানিক অর্থ সঙ্গী বা সাথী আর আসহাব এর বহুবচন। আর স্ত্রী লিঙ্গে মহিলা সাহাবা। তাঁরা মানব জাতির মধ্যে এমন এক সম্মানিত জামায়াত যাঁরা মুহাম্মদ (সঃ) কে পেয়েছেন ও তাঁর রিসালতের উপর ঈমান এনেছেন, তাকে ভালোবেসেছেন ও ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। এর একটি শর্তও যদি না থাকে তারা সাহাবা বলে গণ্য হবে না। কেউ নবীজি (সঃ) কে পেয়েছেন কিন্তু ঈমান আনেননি আবার কেউ মোরতাদ হয়ে গেছে। সাহাবীদের পরিচয় প্রদানের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ কথাটি বর্ণনাকারী ও হাদীস গবেষকদের উস্তাদ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

من صحب النبي (صلعم) او رأه من مسلمين فهو من اصحابه-

অর্থাৎ 'যাঁরা রাসূলে পাক (সঃ) কে দেখেছেন অথবা মুসলমান হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাই সাহাবী'। রাসূলেপাক (সঃ) এর এ সাহাবীদের জীবন যতই অধ্যয়ন করেছি ততই অভিভূত হয়েছি, আবেগে আপ্লুত হয়েছি, অজান্তে অশ্রুসিক্ত হয়েছি, আর হতবাক হয়েছি, এ মানুষগুলোর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে। এক সময় যারা জাহেলিয়াতের তিমিরে ছিল, পাপাচারে লিপ্ত, রক্তপাত, খুন, সন্ত্রাস ছিল যাদের জীবন। দুনিয়ার ইতিহাসের এ পাপীষ্ঠ লোকেরা নবীজির (সঃ) পবিত্র সাহচর্যে পরিণত হয়েছিল সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানবে। একটি সূর্য যেমন অসংখ্য আয়নায় বিম্বিত হতে পারে, তেমনি লক্ষাধিক সাহাবীর জীবনের দর্পণে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুয়তি সূর্য।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদাঃ

তাঁরা শুধু উম্মাতে মুহাম্মদী (সঃ) এর শ্রেষ্ঠ মানব নহেন, এরা সকল যুগের, কালের ও পয়গাম্বরের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আম্বীয়া (আঃ) এর পরে এদের মকাম। আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বের সকল কিতাবে, সাহাবাদের আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে তাঁদের চরিত্র ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

ذلك مثلهم فى التورات ومثلهم فى الانجيل-

www.pathagar.com

তাদের এ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে। (সূরা ফাতাহ্)

নিকষ কালো রাতে দিকভ্রান্ত মুসাফির বা মহাসাগরের ভাসমান দিশাহারা নাবিক আকাশের তারা ধরে পথ খুঁজে নেয়, জীবন লক্ষ্যহারা নিরুদ্দেশ্যের উদ্দেশে চলমান মানবতার জন্য সাহাবারা আকাশের ধ্রুবতারা। তাদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষেরা খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ।

তাদের মর্যাদা ও বুজর্গী এতই উপরে যে আল্লাহতায়ালা সাহাবাদের উপর তাঁর রেজামন্দির সংবাদ কিতাবে অহি করেছেন-

السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه (التوبة)-

অর্থাৎ ''যেসব আনসার ও মুহাজিরেরা প্রথমে ঈমানের দাওয়াত কবুল করেছেন আর তাদেরকে সততার সাথে অনুসরণ করেছেন তাদের উপর আল্লাহতায়ালা রাজি হয়েছেন ; তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। (সূরা তাওবাহ-১০০)

আল্লাহর সন্তুষ্টির নেয়ামতে তাঁরা ধন্য। তাঁরা নবীদের মত মাসুম বে-গুনাহ নহেন। তাঁদের জীবনে গুনাহ হয়েছে কিন্তু উহা তাদেরকে এতই অনুতপ্ত করেছে যে, তাওবার ক্রন্দনে তাদের পাপ শুধু মোছন হয়নি বরং উহা তাদের জীবনকে করেছে আরও নির্মল। হযরত মাগের ইবনে মালেক নবীজির (সঃ) দরবারে এসে নিজের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ব্যভিচার থেকে আমাকে পবিত্র করুন, আমার উপর জেনার শাস্তি বলবৎ করুন। বারবার সাক্ষ্য দেয়ার পর নবীজি (সঃ) প্রস্তারাঘাতে হত্যার নির্দেশ দেন। তার মৃত্যুর দুই দিন পর নবী করিম (সঃ) মাগের এর জন্য কেঁদে দোয়া করছিলেন, আর বললেন আমার সাহাবী মাগের বিন মালেকের তাওবাহ যদি কোন অন্যায়কারী জাতির মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালা সে কওমকেও মাফ করে দেবেন।

দ্বীনে মুহাম্মদীর (সঃ) পয়গামকে সূর্যের উদয় ও অস্তের বিস্তৃত সীমানায় সঠিক ও যথার্থভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে কোরবানী ও ত্যাগ সাহাবীরা দিয়েছেন তার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। সাগরের ভীষণ উত্তালতা, পাহাড়ের কঠিন দুর্গমতা, সাহারার উষ্ণতা, অরণ্যের ভয়াবহ গহীনতা তাদের চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। সব বাধা মাড়িয়ে তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি প্রান্তরে।

উম্মাতে মুহাম্মদীর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যতটুকুন নির্ভেজাল ইসলামী অনুশাসন আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি উহা সাহবায়ে কিরামেরই অবদান। উম্মতের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে তাঁদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। তাঁদেরকে সন্দেহ যুক্ত করা, তাঁদের মর্যাদার উপর আঁচড় কাটা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামিল সমগ্র দুনিয়া তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েছে। নবী করিম (সঃ) এর তামাম হাদীস তাঁদের প্রচারিত ও বর্ণিত সব কিছুই সন্দেহের আবর্তে পড়ে যাবে, নড়ে উঠবে ইসলামের ভিত্তি আর দ্বীনি প্রসাদের প্রতিটি দেয়ালে দেখা দেবে ফাটল।

قال رسول الله (صلعم) اصحابى امانة لامتى (مسلم)

রাসূলে পাক (সঃ) তাঁদের নিকট রেখে গেছেন দ্বীনের আমানত আর তাঁদেরকে রেখে গেছেন গোটা উম্মাহর নিকট আমানত।

সাহাবায়ে কিরামকে একরাম ও সম্মান করা ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের বিষয়ে অসুন্দর ও অশালীন বলা কথা থেকে স্বীয় জিহবা ও কলম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রাসূলের মায়া যে

www.pathagar.com

হৃদয়ে রয়েছে সে হৃদয়ে সাহাবীদের বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করা অসম্ভব। সাবধান! তাঁদের উপর আক্রমণের তীর নবীর পাকের কলিজায় বিদ্ধ হবে। নবীজি (সঃ) বলেন-

قل رسول الله (صلعم) الله الله اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعرى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم-

অর্থাৎ 'সাবধান! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদের বিষয়ে অশুভ ধারণা করবে না। যারা তাদেরকে ভালবাসে, আর যারা তাদের ব্যাপারে দুশমনি রাখে তাঁরা আমার ব্যাপারে তা রাখে- (তাবারানী)

তবে ইতিহাসের সঠিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনে সঠিক কথাটি যথার্থভাবে পেশ করা উচিত। সে ক্ষেত্রে কাউকে এড়িয়ে কাউকে বাড়িয়ে কিছু বলা ও লিখা সুস্পষ্ট জুলুম। বিদ্বেষ যেমন সীমা লংঘন করে তেমনি অতিরিক্ত আবেগও সীমা ছাড়িয়ে যায়। এর কোনটাই ইনসাফ নয়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুম থেকে দূরে থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন-

আল্লাহ তা'য়ালা সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (আল কোরআন)

সাহাবীদের জীবনে মানবীয় ত্রুটি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো সামাজিক জীবনের বিতর্কিত আচরণ ও সিদ্ধান্ত নবীয়ে পাকের (সঃ) মানদন্ডে পর্যালোচিত না হলে পরবর্তীরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। যেমন উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নেতৃত্ব দান। ইহা থেকে নারী নেতৃত্ব বৈধ করার কোন সুযোগ নেই। আবার হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ) স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে মুসলমানদের রায় ছাড়া পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দানকে কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য বলা যায় না।

হযরত আয়েশা (রা) তাঁর উপরোক্ত ভূলের জন্যে সমগ্র জীবন কেঁদেছেন, এতই কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। আবার হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) স্বীয় ভুলের জন্য এতই অনুতপ্ত ছিলেন যে, জীবন সায়াহ্নে তিনি ইয়জিদের বিষয় নিয়ে বার বার কাঁদতে ছিলেন ও তাঁর প্রভুর নিকট ক্ষমা চাচ্ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় সাহাবীদের কাউকে অমর্যাদা করা হয়নি, কেউ যদি মনে করেন সে সমস্ত বুজুর্গরা আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর মর্যাদার উপর আঘাত করেন। যে ভুলের জন্য তারা নিজেরাই অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করেছেন, তওবা করেছেন। তবে উহাকে ভুল না বলাও চরম ভুল ও বাড়াবাড়ির নামান্তর।

সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলতে চাই ইসলামের মধ্যে উম্মতের দ্বীনি মর্যাদার যতগুলো অবস্থান রয়েছে মুফাচ্ছির, মুজতাহিদ, আওলিয়া, মোত্তাকী, পীর মাশায়েখ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কোন বুজুর্গ সাধারণ সাহাবীদের সাথেও তুলনায় আনা সম্ভব নয়। এদের সমগ্র জীবনের তাকওয়ার পুঁজি রাসুলুলাহ (সঃ) দরবারে এক মূহুর্ত অবস্থানের সাথে তুলনীয় নয়। উহাদের বুজুর্গি যেন অতলান্ত সমুদ্রের অথৈই জলরাশির কাছে সুচাগ্র জলকণা। নবীজির (সঃ) সাহাবী হওয়ার জন্যও তাঁর দ্বীনের সাহায্যের প্রয়োজনে এ জামায়াতকে আল্লাহ তা'য়ালা বাছাই করে নিয়েছেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন–

فاختار بم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه- (ابى داود)-

''আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নবী মুস্তফা (সঃ) এর সাহাবী হওয়ার ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্যের

www.pathagar.com

জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। (আবু দাউদ)

এ ব্যাপারে একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা সমস্ত উম্মতের দায়িত্ব। এরা গোটা উম্মতের অহংকার ও মর্যাদা।

তাঁদের মহান মর্যাদাকে মসিময় করার যে কোন চক্রান্তকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। উম্মতের একটি বিভ্রান্ত অংশ শিয়াদের একটি উপদল সাহাবায়ে কিরামদের কারো ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করছে। এমনকি সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ) ও আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য আপত্তিকর। আল্লাহতায়ার কালাম ও রাসূলে পাকের সহি হাদীসের মধ্যে যাদের ব্যাপারে প্রশংসা এসেছে তাদেরকে অসম্মানিত করার সময় আল্লাহ ও রাসূলের উপর যদি তাদের ঈমান জীবিত থেকে থাকে তবে অবশ্যই উহা বাধা প্রদান করত, এ বিষয়ে নবীজি (সঃ) এর সতর্কবাণী প্রণিধানযোগ্য।

قال رسول الله (صلعم) اذا رايتم الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم-

''আমার সাহাবীদের উপর অপবাদ দানকারীকে প্রতিবাদ করে বলবে সাহাবী ও তোমার মধ্যে যে নিকৃষ্ট তার উপর আল্লাহর গজব।'' (তিরমিজি)

সাহাবীদের একের উপর অপরের মর্যাদা প্রসঙ্গেঃ

মহানবী (সা) এর নবুয়তি চুম্বকের যাদুময় স্পর্শ লাভে যাদের জীবন হয়েছে ধন্য তাঁরা সকলে সাহাবী হিসেবে তাঁদের মকাম বা অবস্থান এক ও অভিন্ন। ইহা এমন দরজা যা দিয়ে আর কারো প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এ দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন আমল দিয়ে এ মর্যাদায় সমাসীন হওয়া যাবে না। এখানে যারা পৌঁছেছেন তারা সকলে সাহাবী হিসাবে এক দরজার হলেও তাদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য স্পষ্ট। নিম্নে মর্যাদা ক্রমানুসারে সাহাবীদেরকে বিন্যাস করা হলোঃ

১। খুলাফায়ে রাশেদীনঃ

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর জামায়াতের মধ্যে ইহারা অনন্য মর্যাদার অধিকারী । এরা সাহাবীদের নেতা। এরা রাসুলে পাকের পরে উম্মতের নেতৃত্বের হাল ধরেছেন। নবীয়ে পাক (সা) তাঁর ইন্তেকালের পর ৩০ বছর খিলাফাত আলা মিন হাজিহিন্নাব্যুয়াত থাকবে বলে ইশারা করেছেন।

قال رسول الله (صلعم) الخلافة بعدى ثلاثون سنه-

এ সম্মানিত ব্যক্তিগণ সাইয়্যেদিনা আবু বকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

عن ابن عمر (رض) قال كنا نقول رسول الله (صلعم) حتى ابوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم (الترمذى)-

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) সারা জীবন বলতেন, আবু বকর (রাঃ), উমার (রাঃ) ও উসমানের (রাঃ) উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন। (তিরমিজি)

قال رسول الله (صلعم) ان علي منى وانامنه وبو ولى كل مؤمن-

নবীজি (সঃ) বলেন, আলী আমার হতে, আমি আলী হতে, তিনি মুসলমানদের বন্ধু। (তিরমিজি)

www.pathagar.com

২। আশারায়ে মুবাশ্বিরাহ ঃ

সমস্ত সাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) উপর আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির শুভসংবাদ রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে দশজন সাহাবী এমন যারা জান্নাতী বলে রাসূলের (সঃ) পবিত্র জবানে ঘোষণা দিয়েছেন–

হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলে পাক (সাঃ) বলেন, আবু বকর (রাঃ), আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) এবং আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) এরা সকলেই বেহেস্তী। (তিরমিজি)

৩। আহলে বাইত ও উম্মুল মোমেনীনঃ

নবী পাক (সঃ) এর পরিবার সমস্ত উম্মতের জন্য বিশেষ মর্যাদা অধিকারী। রাসুলে পাকের (সা) আওলাদ ও হুজুরের (সা) মুহ্তারামা স্ত্রীগণ যাঁরা গোটা উম্মতের জননী ও সকলের নিকট সম্মানের । আহলে বায়াতের মধ্যে রয়েছে আলী, ফাতিমা, হাসান, ও হোসাইন (রা)। এঁরা বিশেষ মর্যাদাবান। নবীজি (সা) আহলে বাইত এর জন্য সাদাকা, মানাত হারাম করে দিয়েছেন।

নিজ চাদরের মধ্যে আলী, ফাতেমা ও হোসাইন (রা) কে নিয়ে নবীজি (সা) বলেন হে মাবুদ! এরা আমার আহাল।

دعا رسول الله (صلعم) عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هولاء اهل بيتي-

হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা) নবীজি (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যারা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের (রা) বিরুদ্ধে লড়বে আমি রাসুল (সা) তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। (তিরমিজি)

وعن زيد بن ارقم ان رسول الله (صلعم) قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين انا حرب لمن حاربهم (الترمذى)-

নবীজির (সা) স্ত্রী ও উম্মুল মু'মেনীনদের সংখ্যা ১৩ জন। এদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন কোরাইশ বংশীয়। বাকি ৭ জন অন্যান্য বংশীয়।

নবী করিম (সা) এর সাথে একাধিক বিবাহের কারণ ছিল এত বেশি যে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরী। উম্মতের সামনে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ এর আদর্শ, সমাজের বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার, কেউ বেশি বয়সের, কেউ একেবারে কম বয়সের, কারো বেশি সন্তান, কেউ নিঃসন্তান, কেউ বিধবা, কেউ কুমারী, কারো আগের সন্তান ছিল, কারো ছিলনা, কেউ সম্পদশালী, কেউ গরীব, কেউ উচ্চ বংশে, কেউ আবার সাধারণ। কেউ আযাদ, কেউ আবার মামলুক, কেউ উচ্চ শিক্ষিত আবার কেউ সামান্য শিক্ষিত, কেউ সুন্দরী কেউ আবার কম সুশ্রী, কেউ শান্ত মেজাজের আবার কেউ কঠোর মেজাজের ইত্যাদি বিভিন্ন বংশের, রুচির, অবস্থা, বয়সের স্ত্রীদের সমাহার নবীর পরিবারে আসার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা করেছিলেন, যেন সকল শ্রেণির নারীদের নিয়ে সুন্দর পরিবার গঠন করার বাস্তব আদর্শ মহানবীর জীবন থেকে মানুষেরা খুঁজে পায়। যে রাসূলের (সা) জীবনকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল লক্ষাধিক সাহাবী। অনুরূপভাবে নবীজি (সা) একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের শিক্ষা গ্রহণে আমার মনে হয় রমনীর প্রয়োজন ছিল। রাসূলের (সা) সাহচর্যের বরকতে যারা হয়েছেন সাহাবীর মর্যাদায়। উম্মুল মু'মিনীনরা আরও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের কারণে বেশী ধন্য হয়েছেন। তাঁরা দুনিয়া ও পরকালীন জিন্দেগীতে নবী করীম

www.pathagar.com

(সা) এর পরিবারের সদস্য থেকে উম্মতের জননী হয়ে থাকবেন। খলিফাগণ নবীপত্নীদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা) তাদের জন্য ৪ লাখ ৪০ হাজার দিরহামের সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন।

৪। প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারেরাঃ

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যাদের জীবনে নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন ও জুলুম। ৫ম নববী বছরের শেষের দিকে কুরাইশদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা চরমে পৌঁছে। তখন হুজুর (সা) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিযরতের নির্দেশ দেন। ১১জন পুরুষ + ৪জন মহিলা=মোট ১৫ জন প্রথম মোহাজির। এদের মধ্যে নেতুস্থানীয় ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), জাফর বিন আবু তালিব (রা), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), মুসআব বিন উমাইর (রা), ওসমান বিন মাযউন (রা)। ১০ম নববী বছরে হযরত উমর (রা), আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা), আমের বিন রাবীয়া (রা), তার স্ত্রী লায়লা (রা) সহ আরও কতিপয় ব্যক্তি মদিনায় হিযরত করেন। আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী মুসলমানদের সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলে পাক (সঃ) মদীনায় নাজ্জাশীর জানাজা আদায় করেন।

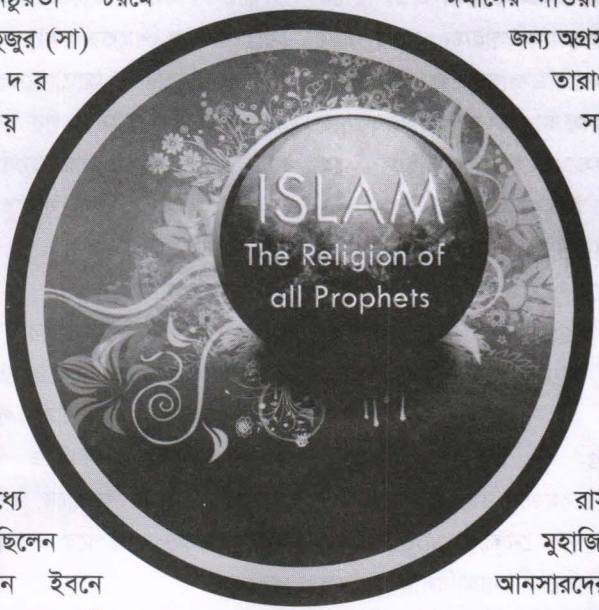

মদীনাবাসীরা মুহাজিরদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের ও সহযোগিতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাজির আনসারেদের প্রশংসা করছেন তারই কালামে-

والسبوقون الاولون من المهجرين ولانصار والذين اتبعوبم- باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه (التوبة)

সে সব মুহাজির ও আনসারেরা, যাহারা প্রথমে ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল আর তারাও যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ রাযী আর তারাও আল্লাহ উপর রাযী। (তওবা-১০০)

রাসুলে পাক (সা) মুহাজির ও আনসারদের শানে অনেক কথা বলেছেন, তাদের জন্য দোয়া করেছেন, আল্লাহ মুহাজির ও আনসারদের মাপ করে দাও। (বোখারী)

আনসারদের ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ আর তাদের ব্যাপারে দুশমনী মুনাফেকীর আলামত। (মিশকাত)

وقال رسول الله (صلعم) اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار- (متفق عليه)-

www.pathagar.com

৫। আহলে আকাবাঃ

মক্কা থেকে ২ মাইল দুরে হেরা পাহাড় ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম 'আকাবা'। সে গোপন স্থানে নবুয়তের ১১শ বছরে মাত্র ১২জন ও পরের বছর উক্ত স্থানে ৭৩ জন মদীনাবাসী (২ জন মহিলাসহ) দ্বীন গ্রহণ করেন ও নবীজীকে (সা) মদীনায় চলে যাওয়ার দাওয়াত দেন। ৫টি বিষয়ে (ক) শিরক (খ) ব্যভিচার (গ) চুরি (ঘ) সন্তান হত্যা (ঙ) অপবাদ থেকে বেছে থাকার উপর কসম করান। অতঃপর যে কোন অবস্থায় রাসুলকে সাহায্য করার জন্য তারা প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসার জবাবে তারা সম্মতির উপর কসম করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কসমের সময় বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার জন্যে স্ত্রী, ছেলে- মেয়ে সহায় সম্পদ সমস্ত কিছু কোরবানী দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। মদিনাকে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হিসাবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণকারী আনসারদের ভূমিকা অনেক বেশী।

৬। আহলে বদরঃ

২য় হিজরীর ১৭ই রমজান বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু জাহেলের নেতৃত্বে ১০০০ (এক হাজার) সশস্ত্র কাফেরের মোকাবিলায় মুহাম্মদ (সা) এর সেনাপতিত্বে ৮৩ জন মোহাজির ও বাকিরা আনসার্ মোট ৩১৩ জন সাহাবী সামান্য অস্ত্রসহ আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হন। ৭০ জন কাফের নিহত ও ১৪ জন মুসলমান শহীদ হন। যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী পাক (সা) বেক্বারার হয়ে সেজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে বলছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আপনার ওয়াদাহ পূরণ করুন। আজকের দিনে মুসলমানেরা পরাজিত হলে আপনার বন্দেগীর জন্যে কে থাকবে?" (বুখারী)

বদরের ময়দানে আল্লাহর ফেরেশতা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন-

اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملئكة مردفين-

"আল্লাহ আপনার প্রার্থনার জবাবে এক হাজার ফিরিস্তা যুদ্ধে পাঠাচ্ছে।" (আনফাল-৯)

ইসলামের এ প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদরী সাহাবীদের আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামেরা বদরী সাহাবীদেরকে অত্যন্ত সম্মানের নয়নে দেখতেন। হযরত হাতেম বিন আবি বালতা (রা) রাসুলে পাকের (সা) মক্কা আক্রমনের সংবাদ পরিবার ও আত্মীয়দের জানিয়ে দিতে গোপন চিঠি পাঠানোর পর ধরা পড়ে নবীজি (সা) এর দরবারে নীত হলে তিনি এ বলে ক্ষমার নির্দেশ দেন-যেহেতু তিনি বদরী সাহাবীদের অন্তর্গত।

৭। আহলে মাশাহীদ ঃ

যে সমস্ত সাহাবী রাসূলের (সা) সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা মর্যাদাবান। প্রথমে অংশ গ্রহণকারীরা পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সকলের উপরে। আল্লাহ কোরআনে বলছেঃ

وفضل الله الجهدين على القعدين اجرا عظيما- (نساء)

"আল্লাহর নিকট মুজাহিদ এর মর্যাদা গৃহে অবস্থানকারীদের চাইতে অনেক বেশি।" (নিসা-১৫)

সাহাবায়ে কিরামদের অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ

তাঁদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে উহাই সমগ্র মানবগোষ্ঠী থেকে তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে। আকাশের অসংখ্য তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদ যেমন স্বীয়

www.pathagar.com

আলোতে সমুজ্জ্বল; মানবতার বিশাল আকাশে নেককারদের অসংখ্য তারকার ভিড়ে সাহাবীরা যেন বিকশিত চন্দ্র। তাঁদের জীবনের ছোট থেকে বড়, অসাধারণ থেকে সাধারণ সব কিছুই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আপন মহিমায় ভাস্কর।

একটি নিবন্ধে এ আলোচনার সংকুলান করা দুরূহ ব্যাপার। আমি চেষ্টা করব আলোচনার দরিয়া থেকে যৎকিঞ্চিত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে।

ঈমানী দৃঢ়তাঃ

প্রথমে আমি সাহাবীদের ঈমানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে চাই। একজন সাহাবীর গোটা জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় ছিল ঈমান আনার ঘটনা। গায়েবের উপর তাদের বিশ্বাস ছিল জাহেরের উপর আমাদের বিশ্বাস যেমন। তাদের বিশ্বাস হালকা ও মামুলি কোন বিষয় ছিলনা। তাদের জীবনের সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ামক শক্তি ছিল তাদের ঈমান। তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এর ব্যবহার তথা চলার প্রতিটি শব্দ, চোখের প্রতিটি চাহনি, হাতের প্রতিটি স্পর্শ ছিল ঈমানের শাহাদাৎ। এ ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। তাদের মাথার উপর করাত রেখে কাটা হয়েছে, এক একটি অঙ্গ কেটে পৃথক করা হয়েছে, ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, শুলিতে বসিয়ে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারা নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছেন, রক্ত দিয়ে জমিন সিক্ত করেছেন, জবাই করা প্রাণীর মত ছটফট করে করে জীবন কোরবান করেছেন কিন্তু ঈমান বিসর্জন দেননি। পাহাড় যেমন করে অনড় অচল হয়ে জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সাহাবীদের হৃদয়ের ঈমানের পাহাড় এর চাইতে ও কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। হযরত কাতাদা (রা) যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কে সাহাবীদের ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বলেন-

الايمان فى قلوبهم اعظم من الجبل-

'তাদের ঈমান এভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল পাহাড় যেমন জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে'।

আ'মলী জিন্দেগীর দিকে তাকালে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তারতম্য লক্ষণীয়। কিন্তু ঈমানের দিকে নজর করলে তাঁদের সকলকে ছিদ্দিকীনদের মকামে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) কালামের উপর বিন্দু পরিমাণ তাঁদের সন্দেহ ছিলনা। এক্ষেত্রে তাঁরা ছিল ইয়াক্বীনের পর্যায়ে যার মধ্যে নিফাকতের কোন অস্তিত্ব নেই।

আপোষহীনঃ

নবীজী (সঃ) সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সুরা ফাতহের আখেরী রুকুতে যে পাঁচটি মৌলিক দিকে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে পাকে ও পূর্বের কিতাবে যিকির করেছেন তাহা অবশ্যই আলোচনায় আসা দরকার।

محمد الرسول الله الذين معه اشداء على الكفار-

অর্থ্যাৎ যে কোন চ্যালেঞ্জ তারা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। তাঁদের রক্ত, বংশ, সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কোন কিছুই দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদেরকে দুর্বল করেনি। দ্বীনের উপর এগুলোকে তাঁরা হিসেবের বস্তু হিসেবে নেয়নি। শত্রুর হাজার হাজার সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও তাঁরা ছিলেন নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

www.pathagar.com

ইরানীদের রাজধানীতে রুস্তমের দরবারে দশ সহস্র সৈন্যের উলঙ্গ তরবারীর মাঝখানে যে কোন চ্যলেঞ্জ এর জওয়াব দানে প্রস্তুত ৭০ জন সাহাবী। নবীজীর প্রিয় সাহাবী মুসলমানদের সেনাপতি হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ (রা) হক ও নাহকের ময়দানে আপন রক্তের উপর তরবারী চালনায় এতটুকুও দ্বিধা করেনি। বদরের কঠিন দিনে নিজের ভাই আপন হাতে নিহত হয়েছে; হযরত আবু ওবায়দা স্বীয় পিতাকে কতল করে তার লাশ জমিনে রেখে দিয়েছে।

রহমদেলঃ

তারা নিজেদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের ব্যাপারে রহম দেল- তাদের দ্বীনের জিন্দেগীতে একের জন্যে অপরের হৃদয় ছিল সংবেদনশীল। ভাইয়ের প্রয়োজনকে সর্বদা নিজের উপর তারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মক্কার সর্বহারা মুহাজিরদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার নির্দশন দুনিয়ার সামনে পেশ করলেন। ইতিহাসের পাতায় এর দ্বিতীয় আর কোন নজীর নেই। শুধু ভাই হিসেবে নেয়নি বরং নিজের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে দ্বীনি ভাইকে অর্ধেক মালিকানা দিয়েছেন। অথচ আমরা ওয়ারিসদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করছি। ঘরের মধ্যে মাত্র একজনের খাবার, রাসুলুল্লাহর মেহমান ঘরে হযরত তালহার স্ত্রী বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করলেন মেহমানের সামনে খাবার দিয়ে বাতি নিভিয়ে দেবেন। গৃহস্বামী খাওয়ার ভান করল আর মেহমান খাবার খেল। আল্লাহতায়ালা অহিতে বলে দিলেন-

يوثرون على انفسهم ولوكان بهم خضاصة-

তারা নিজের প্রয়োজন অস্বীকার করে ভাইয়ের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়। আল কুরআন

তাহাজ্জুদ গুজার ঃ

তারা ছিলেন আল্লাহর হুজুরে দন্ডায়মান ও সিজদায় অবনত থেকে নিশি যাপনকারী-

তোমরা তাদেরকে দেখবে রুকু ও সিজদায় অবনত-

تراهم ركعا سجدا-

সমস্ত সাহাবীরা ছিলেন সালাতের নিষ্ঠাবান পাবন্দ। সালাতে মাকতুবা ছাড়াও তাঁরা সকলেই ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার। সোয়া লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে একজনকেও এমন পাওয়া যাবে না শেষ রাতে যাদের পিঠ বিছানার সাথে ছিল। হায়! আজ মুসলমানদের লাখের মধ্যে একজনকেও এমন পাওয়া সুকঠিন- আল্লাহর কোরআন সাক্ষ্য দিয়ে বলছে-

الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما (الفرقان)-

যারা রুকু ও সিজদায় তাদের রাত শেষ করে দিয়েছে। (ফোরকান)

বে-নেয়াজ

তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের প্রয়োজন পূরণে তাঁরা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে হাত পাতেন নাই। আল্লাহর রেজামন্দি ছিল তাদের একমাত্র কাম্য।

তারা আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে

يبتغون فضلا من الله رضوانا-

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি এমনকি সমগ্র পৃথিবীর মানবের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি তাঁদের হিসেবের বিষয় নয়। দুনিয়ার কোন জাতি কি চায়, কিভাবে চলে, উহাকে তাঁরা থোড়াই কেয়ার করেন। আল্লাহকে রাজি করার প্রয়োজনে সমগ্র দুনিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত। আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে তাঁদের নিকট সমগ্র পৃথিবীর পার্থিব

www.pathagar.com

সব কিছু কদমের ধুলার চাইতেও কম মূল্য বহন করে। বিশ্ব যদি তাঁদের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকর করে, বেঁচে থাকার শেষ সামগ্রী কেড়ে নেয়, তবে তারা অরণ্যের পাতা খেয়ে জীবন কাটাবে। নাফরমানীর শর্তে ঐ ক্ষুধার্ত নবীর সাহাবীরা খাদ্যের একটি দানা অথবা পিপাসায় এক কাতরা পানি পান করবে না। লাগাতার সিয়াম পালন করে আজিয়তের রাজপথ দিয়ে বরণ করে নেবে শাহাদাতের মৃত্যু। কোন সাহাবীকে এমন পাওয়া যাবে না, বাতেলের অনুগৃহিত রিজিকের দানা-পানি গ্রহণ করে রোখসোতের চোরা গলি দিয়ে মহিমান মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেছে নেবে যিল্লুতির জীবন।

নূরাণী চেহারাঃ

এদের চেহারায় রয়েছে বন্দেগীর চিহ্ন। আল্লাহ তা'য়ালা তাই বলেন-

سيماهم فى وجوبهم من اثر السجود-

যদিও কপালে বিশেষ কোন দাগ এখানে মূখ্য নয়। আসল হলো সিজদার কারণে, বন্দেগীর, তাকওয়ার, খোদা পরস্তির নূর তাদের চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। নবীজি (সা) এর সাহাবীদের দিকে প্রথম দৃষ্টিতে একথা বুঝা যেতো যে, এরা সৃষ্টির সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ। ইংরেজীতে কথা আছে Face is the index of mind, চেহারা , মনের সূচিপত্র। ইহা এক নূরানী আভা বিশেষ। কালো মানুষের চেহারায় ও উজ্জ্বল আভা থাকতে পারে। আর সাদা চেহারায়ও অসুন্দরের কালিমা থাকতে পারে। সকল বর্ণের সাহাবীদের চেহারায় ছিল মায়াবী এক ঝলক নূরের আভা। মনের পবিত্রতা, আমলের বিশুদ্ধতা, ঈমানের দৃঢ়তা তাঁদের চেহারায় প্রতিফলিত।

কোরআন অধ্যয়ন ঃ

কোরআন ও হাদীসে রাসুলের আলোকে তাঁদের বহু বৈশিষ্ট্য থেকে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি আলোচনায় আনতে চাই। আল কোরানই ছিল তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয়। তারা দ্বীনের এ নির্ভেজাল উৎস থেকে হেদায়াত গ্রহণ করেছেন। যে কিতাবের প্রতিটি বাক্য, শব্দ, এমন কি বর্ণ পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়েতের সাথে সম্পর্কিত, যাতে সন্দেহজনক একটি বর্ণও নেই।

هذا هدى.والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم- (حثية)-

ইহা পরিপূর্ণ হিদায়েত। যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াত থেকে হিদায়েত গ্রহণে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তির যন্ত্রণা । (জাসিয়া ১১) তৎকালীন যুগে ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার উপস্থিতি পারস্য ও রোমান সভ্যতার বিশাল বিস্তৃতি সত্ত্বেও সাহাবীদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল আল কোরআন। তাঁরা ছিলেন কোরআন সাগরের জল চর। নবীজি (সা) এর দরবারে হযরত উমরকে (রা) তাওরাতের পৃষ্ঠা পড়তে দেখে হুজুরে পাক (সা) এর চেহারা মোবারক এর মধ্যে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠে।

ووجه رسول الله (صلعم) يتغير-

অথচ কোরআনের উপস্থিতিতে উহাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বুজুর্গের লিখিত কিতাবকে নিয়মিত তিলাওয়াত এর ব্যবস্থা উম্মতের জন্যে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?

এত্বেবায় রাসুল (সা) ঃ

রাসুলে পাক এর প্রতি মায়া ও একমাত্র তাঁকেই এত্বেবা করা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যর অন্যতম। তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মূহুর্তে একমাত্র নবীয়ে আকরাম (সা)– কে এত্বেবা ও অনুসরণ করেছেন। জীবনের কোন আনন্দ বা কঠিন কোন বদনাম, কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা বা বিজাতীয় সভ্যতার চাকচিক্য কোন কিছুতেই রাসুলুল্লাহ (সা) এর খুলকে আজিম থেকে এক

www.pathagar.com

মুহূর্তের জন্যেও তাঁদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরেনি। তাঁদের শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে রাসূলে পাকই ছিলেন তাঁদের মুর্শিদ। এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আমাদের সন্তান, পিতা- মাতা, ধন-সম্পদ এমনকি তৃষ্ণার্ত বেদুইনের কাছে ঠান্ডা পানির চাইতেও বেশী প্রিয়। নবীজি (সা) এর নির্দেশ পালনে তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান। কোন প্রকার ওজর পেশ করা দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন, সম্ভব ও অসম্ভবের যুক্তি পেশ করার কোন উদাহরণ কোন সাহাবীর জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাসুলের (সা) সিদ্ধান্তের সামনে তাঁরা নিজেদের জবান, জ্ঞান, আকল, শক্তি যোগ্যতা, সহায়-সম্পদ, জীবন মরণ সব কিছুকে অকাতরে ও বিনয়ের সাথে হাজির করেছেন। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) বলেন," ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন। ইয়া রাসুলুলাহ! আপনি যদি আমাদের মহা সাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।'

قال سعد بن عبادة يارسول الله (صلعم) والذى نفسى بيده لوامتنا ان نخيض البحر لا خضنابا (مسلم)

আ'দেল

রাসুলে পাকের কোন হাদিস বিকৃত করা বা নিজের কোন কথাকে কোরআনের ব্যাখ্যা অথবা রাসূলের হাদীস বলে দেয়া এত বড় গুনাহ যে, তাদের নিশ্চিত ঠিকানা জাহান্নাম।

قال رسول الله (صلعم) من قال فى القران بغير علم فليتبوا مقعده من النار (ترمذى ان عباس)-

অর্থাৎ "যে কেউ কোরআন ও রাসুলের হাদীস ছাড়া নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নেয়।"

হাদীসে রাসুলের আমানত হেফাজত করা, হাদীসের মধ্যে কোন নিজস্ব শব্দ যোজন করা বা কোন শব্দ ইচ্ছাকৃত বাদ দেয়া রাসুলের কোন কথাকে গোপন করা অথবা কোন কথাকে হাদীসে রাসুল বলে অভিহিত করা, বিশেষ করে এ ভয়াবহ অপরাধ থেকে সমস্ত সাহাবী সমগ্র জীবন নিজেদের হিফাজত করেছেন। এ বিষয়ে গোটা উম্মতের ইজমা এই যে, "সমস্ত সাহাবী ছিলেন আদেল"।

الصحابة كلهم عدول-

ইহা প্রমানিত যে লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সাধারণ একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যায়নি যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের আমানত খেয়ানত করেছেন। কালামে রাসুলের সাথে কিছু যোগ বিয়োগ করেছেন, বিকৃত করেছেন নবীজির বচন। এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীদের হাতে দ্বীন অবিকৃত অবস্থায় ছিল ও দুনিয়ার কাছে পৌঁছে গেছে।

'আজ অক্ষত ও অবিকৃত যে দ্বীনের কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে ফেলার ভয়ানক ও হৃদয় বিদারক আয়োজন শুধু শুরু হয়নি অনেক দূর এগিয়ে গেছে।' এ ধ্বংসের নেতৃত্ব দিচ্ছে উম্মতের সে নিকৃষ্ট জীবেরা যাদেরকে রাসুল (সাঃ) বলেছেন ' শেরারুল উলামা' গোমরাহ আলেমদের দল। এরা দ্বীনের অনুসরণ করেনা বরং নতুন নতুন দ্বীন সৃষ্টি করে।

এ বিষয়ে নবীজি (সাঃ) এর সাবধান বাণী স্মরনীয়ঃ

عن عائيشة (رض) قالت قال رسول الله (صلعم) من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهورد (متفق عليه)-

"হযরত আয়েশা (রা) নবীজি (সাঃ) থেকে বলেন, কেউ আমার পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আনবে উহার সবটুকু বাতিল যোগ্য"।

www.pathagar.com

(বুখারী ও মুসলিম)।

এই বিদয়াতী আলেমরা আল্লাহ ও রাসূলের ধারণা বদলিয়ে দিয়েছে। এদের 'আল্লাহ' রাজনীতি অর্থনীতি কোর্ট কাচারী ও সংসদে কি হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না, সেখানে মানুষের আইন দিয়ে সব পরিচালিত হলেও আপত্তির কিছু নেই। বরং সর্বত্র আল্লাহর আইন চালু করার লড়াই সংগ্রামে তিনি অসন্তুষ্ট । আর রাসুল সম্বন্ধে ধারণা অনুরূপ ভয়াবহ। এমন এক রাসুল বানাবার চেষ্টা হচ্ছে যিনি মানব নহেন; যদিও সুরতে ইনসান, তিনি মানবের মত জন্ম গ্রহণ করেননি, তাকে আল্লাহর বান্দা বলা ভয়ানক অপরাধ। মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি আল্লাহ ও রাসুল উভয়ে করেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ সম্পর্কে আর বলার তেমন কিছু নেই। তিনি বেশি রাজি তার জন্ম বৃত্তান্ত মিলাদ শরীফে আলোচনায়। শুধু তাই নয়- এরা আজান, ইকামত, সালাত সবকিছুতে পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। এদের আযান লম্বা। আর এরা জানাযার নামাজের শেষে মুর্দার নাজাতের জন্যে লাশ রেখে মিলাদ, মুনাজাত শুরু করেছে, আর জাহেলদের একদল তাদের বাজার জমিয়ে রেখেছে। ইসলামের দুশমনেরা তাদের জন্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে।

আজকের যুগে কোন সাহাবী যদি আসতেন আর ভন্ডদের এ তামাশা দেখতেন তবে তিনি নেককারদের সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে সেভাবে যুদ্ধ করতেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) মিথ্যা নবীদের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করেছেন।

মোজাহিদে দ্বীন

সাহাবীদের কর্মব্যস্ত জীবন কেটেছে মহানবীর সাহচর্যে ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তাঁদের পরিচয় তুলে ধরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) বলেন,

"আমাদের নবীজির সাহাবী হওয়ার জন্যে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে বাছাই করা হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্যে তাঁরা কোন না কোন পেশা অবলম্বন করতেন কিন্তু তাদের জীবন লক্ষ্য ছিল দ্বীন। তাদের সংসার, ব্যস্ততা, ব্যবসা ও চাকুরী কোন কিছুই তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। এ দ্বীনের আয়োজনে তারা প্রতিষ্ঠিত সংসার বিরান করেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, আপনজনের বিরাগ ভাজন হয়েছেন, জীবনের উপর মরণের ঝুঁকি গ্রহণ করেছে সন্তানদের জনমের তরে ইয়াতিম করছেন, এত কিছুর পরও দ্বীনের ক্ষতি বরদাশত করেননি। খন্দকের যুদ্ধ চলছে কনকনে শীতের মধ্যে সাহাবীরা মাটি খনন করছেন, নবীজি (সঃ) তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। আর তারা জবাব দিয়ে বলছিলেন-

مجيبين له نحن الذى بليعوا محمد على الجهاد مابقين ابدا (بخارى)-

"আমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর হাতে আমরণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করার শপথ করেছি।"

রাসুলুল্লাহর ঐ দ্বীন আমাদের কাছে আছে কিন্তু সে দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদ নেই। আমরা আমাদের পরিজন, সংসার ও জীবনের মান বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত। দ্বীন নিয়ে সময় দেয়ার সময় আমাদের নেই। হায়! সে সময় কবে আসবে, যেদিন সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাতার বন্দি হবে সীসা গলানো প্রাচীর সম। 'খোতাবারা' মানুষদেরকে উহার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। আইম্মারা মেহরাব থেকে জিহাদের ডাক দেবে। মাশায়েখরা উম্মতকে জিহাদের উপর বায়াত করাবে। আর শুরু হবে এক সর্বগ্রাসী লড়াই। মানুষের আইনের ধ্বজাধারীদের জন্যে জমিন হয়ে উঠবে সংকুচিত।

www.pathagar.com

সাহাবীদের বিষয়ে উম্মতের দায়িত্ব

প্রবন্ধের উপসংহার টানার আগে সাহাবায়ে কিরামের বাপারে উন্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে চাই। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

"তাদেরকে চেনো, সম্মান কর ও তাদের জীবন অনুসরণ কর।"

প্রথমত: তাদের সম্পর্কে উম্মতকে জানতে হবে। লক্ষাধিক সাহাবীর জীবন বিস্তৃত ও ব্যাপক। এক একটি জীবন যেন এক একটি জগৎ। উম্মতকে সাহাবীদের রোমাঞ্চকর জীবন সাম্রাজ্যে বিচরণ করতে হবে। আহরণ করতে হবে উহা থেকে জীবন চলার পাথেয়। তাদের জীবন সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরণ করতে হবে মাণিমাণিক্য যা আমাদেরকে করবে প্রাচুর্য্যময় ও সৌন্দর্যমন্ডিত। আমরা আজ যাদের জীবন মহান বলে তুলে ধরি, যাদের জীবন আলোচনার উৎসব করি, সাহাবীদের জীবনের সমুদ্রে এ জীবন নদীগুলো নিজেদের দৈন্যতায় আত্মাহুতি দিয়ে হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: তাদের জীবন আমাদের জন্য সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়। সমস্ত উম্মাত যদি খাবার হয় তারা উহার মধ্যে লবণ তুল্য। তাদেরকে উঠিয়ে নিলে উম্মতের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না, হারিয়ে ফেলবে সকল মূল্য। নবীজি (সাঃ) বলেন-

عن انس (رض) قال قال رسول الله (صلعم)

اصحابى فى امتى كالملح فى الطعام-

"আমার সাহাবীরা উম্মতের খাবারের মধ্যে লবণ তুল্য"

আমাদের তাদের নাম উচ্চারণ করে 'রাজি আল্লাহ তা'য়ালা আনহুম' অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ রাজি হয়েছেন বলতে হয়। নবীদের পর কথাটি আর কার জন্যে বলা যাবে? তাই আমাদের সকল বুজুর্গানে দ্বীনের উপর তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হলে আমাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হবে না।

তৃতীয়ত: তাদের মহান জীবন সকল উম্মতের জীবনের আদর্শ। সকল পয়গাম্বরের উম্মতকে রাসুলে পাকের সাহাবীদের জীবন সৌন্দর্য্য আল্লাহ অহির মাধ্যমে জানিয়েছেন।

"তাদের গুণাবলী রয়েছে তাওরাতে, বিধৃত হয়েছে ইঞ্জিলে (ফাতহ)

তাদের জীবন জানা ও সম্মান করার পর যদি আমরা গ্রহণ করতে রাজি না হই তবে ইহা নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কি? যে জামায়াত ছিরাতে মোস্তাকিমের উপর ছিলেন, যারা জান্নাতের অধিবাসী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে দুনিয়াকে, তারা সকলে ছিলেন ছিরাতে মোস্তাকিমের উপর। কেউ যদি জান্নাতে যেতে চায় তবে নিশ্চিত জান্নাতীদের পথ অনুসরণ করাই তাদের কথা।

সত্যের মানদন্ড

প্রত্যেক জামানার পয়গাম্বরের স্বীয় জামানার জন্যে হক না হকের একমাত্র মানদন্ড। সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্যে অহি জরুরী। যেহেতু নবীদের উপর আল্লাহর অহি নাজেল হয় তাই তারা এ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। উম্মতের কেউ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

"নবীদের সাথে রয়েছে কিতাব ও মিজান"

অর্থাৎ তাদের উপর নাযিল হয়েছে কিতাব ও হকের মানদন্ড। (সুরা হাদীদ) রাসুলে পাক (সঃ) এর আগমন সমস্ত পয়গম্বরদের পয়গাম্বরী খতম করে দিয়েছেন। তাই রাসুলে পাকের সামনে পূর্বের নবীগণও আর সত্যের মানদন্ড নয়। এ জামানায় তাওরাত, জাবুর ও ইঞ্জিলের নবীগণ ও যদি দুনিয়ায় আসেন, তাদেরকে

www.pathagar.com

রাসূলে পাকের মানদন্ডে ওজন করা হবে। কারণ পূর্বের মানদন্ড এখন আর মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত নয়।

قال رسول الله (صلعم) والذى نفس محمد بيده لو بدالكم مؤسى فـاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل- (مسند احمد)-

"ঐ আল্লাহর কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন। আজ যদি তাওরাতের নবী মূসা (আঃ) আবিভূত হন আর তোমরা যদি তাঁকে সত্যের মানদন্ড হিসেবে অনুসরণ করো, তোমরা হিদায়াতের পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অতএব যেখানে আগের নবীরা পর্যন্ত সত্যের মানদন্ড থাকছে না সেখানে সাহাবীদেরকে সত্যের মানদন্ড ভাবার প্রয়োজন কোথায়? সাহাবায়ে কিরাম, তাদের সকলের মান এক রকম নহে, তাদের মধ্যেও রয়েছে মানের তারতম্য, রয়েছে বহু বিষয়ে মত পার্থক্য, তাই তাদেরকে মানদন্ড নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। রাসুলে পাক এর আগমন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের ও আদর্শের একমাত্র মানদন্ড মুহাম্মদ (সঃ)-

"নিশ্চই আপনি একমাত্র মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (আল কুরআন)

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফার উক্তি সকলের জন্য স্মরণযোগ্য:

"আমরা যখন রাসুলে করিম (সঃ) থেকে বর্ণিত কোন হাদীস পাব বিনা বাক্যে উহা গ্রহণ করব উহা আমাদের মাথা ও চোখের উপর। আর যখন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে কোন হাদীস পাব কোন তাবেয়ীনদের (রাঃ) কাছ থেকে হাদীস পাব সে ব্যাপারে কথা হল তারাও মানুষ আমরাও মানুষ।"

তবে হ্যাঁ সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করলে অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর মানদন্ড যাচাই করলে সাহাবীদেরকে সম্পূর্ণ খাঁটি হিসেবে পাওয়া যাবে। তাঁরা যদিও সত্যের কষ্টি পাথর নহেন তবে সত্যের কষ্টি পাথরের যাচাইয়ে নির্ভেজাল খাঁটি সোনা বলে প্রমাণিত। কিন্তু একটি খাঁটি সোনার পিন্ড আর একটি সোনার পিন্ড খাঁটি কি অখাঁটি বা কতটুকু খাঁটি তা যাচাই এর মানদন্ড নয়; অনুরূপ ভাবে সাহাবীরা একে অপরের মানদন্ড বা উম্মতের জন্যে সত্যের চুড়ান্ত মানদন্ড নয়।

মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শ পুরিপূর্ণ যথার্থ ভাবে গ্রহণ ও তাকে হুবহু অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবীরা সমগ্র মানবতার জন্যে কিয়ামত অবধি মানদন্ড। রাসুলে পাকের সুন্নাতের সঠিক ব্যাখ্যা ও সুন্নাতের অনুসণের ক্ষেত্রে উম্মতের তামাম বিতর্কের একমাত্র ফায়সালা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)। রাসুল (সাঃ) কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করলে উম্মতেরা সঠিকভাবে রাসুলের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে। যাঁরা রাসুলে পাকের দরবারে ছিলেন, যাদের সামনে সাইয়্যেদেনা জিবরাইল হাজির হয়েছে, যাদের প্রশ্নের জবাবে রাসুল (সঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সঃ) দ্বীনি জিন্দেগীর সব কিছুতে যারা নিবিড়ভাবে নবীজির আদর্শ (সঃ) সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করার জন্যে সাহাবীদের জীবনই যে একমাত্র 'মেয়ার' সে বিষয়ে নবীজির (সঃ) হাদীস স্মরণযোগ্য:

"রাসুলে পাক (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, নাজাতপ্রাপ্ত কারা? উত্তরে মহানবী (সঃ) বললেন, সে দল আমি ও আমার সাহাবীদের অনুসারী।

উপসংহার

একটি বিস্তৃত ও ব্যাপক বিষয়ে আলোচনা শুরু

www.pathagar.com

হলে একটি নিবন্ধে এর পরিসমাপ্তি সম্ভব নহে। এ বিষয়ে অনেক কথাও লিখা প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্ব আজ রক্তাক্ত, শৃঙ্খলিত, বেদনাক্লিষ্ট, পরাভূত ও হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত। এত বিশাল সাম্রাজ্য, এত বিপুল জনগোষ্ঠী, এত অপরিমেয় প্রাচুর্য ও অঢেল সম্পদ এমনকি পরমাণুর শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও মুসলিম দুনিয়ার অমানিশার ঘোর আজো কাটেনি। জানিনে রাত পোহাবার আর কত দেরি।

আমাদের বস্তি বিরান হয়ে যাচ্ছে, উদ্বাস্তুরা সকলেই আমাদের আপনজন, আমাদের শিশুরা বিনা চিকিৎসায় অকাতরে মরছে, আমাদের মায়েদের সতীত্ব রক্ষার চিৎকার কেউ শুনছে না। আমাদের বয়ে যাওয়া রক্তের স্রোত সৃষ্টি করছে সাগরের। আমাদের উপর চলছে অবরোধ। আমাদের আলমিরায় কি আছে দস্যুদের খুলে দেখাতে হবে। আমাদের সচেতন ভাইদেরকে হায়েনাদের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা তারা সব কিছুকে গুড়িয়ে দেবে। হায় আমরা যেন মানুষ নই। এর চাইতেও বেদনাকর এই যে, মুসলিম দুনিয়ার শাসকদের মাথাটাই সাম্রজ্যবাদীরা কিনে নিয়েছে বিলিয়ন ডলার, নগ্ন নারীর স্পর্শ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার ইত্যাদির বিনিময়ে। এ শাসক দালালদের তারা ব্যবহার করছে মুসলমানদের পুন:জাগরণের আন্দোলন থামিয়ে দিতে। মুসলমানেরা আজ নিজ দেশেও ভিন দেশী। আলজেরিয়া, মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব ও বাংলাদেশের কারাগারে আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের উপর নির্যাতন চলছে। সমস্ত Media কে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ দালালদের বহাল রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটিও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় তাদের NGO Network এর মাধ্যমে অর্থ, অস্ত্র, গণমাধ্যম সবকিছুকে ব্যবহার করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এতে নির্বাচনের বৃক্ষ থাকবে কোন ফল ধরবে না, নিরপেক্ষতা, কেয়ারটেকার, সুষ্ঠ ও অবাধ ইত্যাদি বিরক্তিকর শব্দের গর্জন থাকবে কিন্তু এক কাতরা বর্ষণ হবে না।

আর মুসলিম বিশ্বের গোটা জনশক্তিকে যেহেতু কেনা যাবে না তাই সেখানে তারা ছিটিয়ে দিয়েছে ইসমতে আম্বিয়া, শানে গাউসিয়া, নারায়ে রিসালত ইত্যাকার জন দুর্বোধ্য পেট্রোলের চেয়েও ভয়াবহ দাহ্য পদার্থ। আর ধরিয়ে দিয়েছে অনৈক্যের দাউ দাউ আগুন, যা উম্মতের সব কিছুকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

এ সর্বগ্রাসী ভয়াবহতা মোকাবিলায় কোন শেখ, বুজর্গ বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। এক্ষেত্রে রাহ্মাতুল্লিল আলামীনই একমাত্র সমাধান। যার জন্যে একদল মানুষ এগিয়ে আসতে হবে। যাদের মধ্যে সাহাবায়ে মুহাম্মদ (সঃ) এর ঈমানের দৃঢ়তা, বেপরোয়া মানসিকতা, মানবতার প্রতি মমতাবোধ, হকের জন্যে সর্বস্ব কোরবাণীর জযবা, মুস্তফা (সঃ) এর পূর্ণাঙ্গ ইত্বেবা ও শেষ রাতের আহাজারী থাকবে। শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে মানব রচিত সব মতাদর্শ যখন প্রত্যাখ্যাত, জরাগ্রস্থ এ দুনিয়াকে সঞ্জীবনী দিতে, সৃষ্টি করতে আর একটি সৃজনশীল বিশ্ব, পৃথিবী অপেক্ষা করছে সাহাবীদের চরিত্র সমন্বিত একটি সুসংগঠিত জামায়াতের। হে আল্লাহ। হকের জামায়াতে আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করুন।

লেখকঃ
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ

www.pathagar.com

জাতির উন্নয়নঃ প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা

-মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

নৈতিকমান মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষ ধরণীতে হরেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত নৈতিকমান সকলে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। আজ বিশ্বমানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে নৈতিকমান উন্নয়নের বিকল্প নেই। সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা অনুধাবন করি, আমাদের ভুবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব নেই, শিক্ষাব্যবস্থার হরেক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ গড়ার প্রচেষ্টার অন্ত নেই, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ধরাকে সুন্দর ও শান্তির নিবাস হিসেবে গড়ার মিশনের বুলির জুড়ি নেই। নব নব পরিকল্পনা, উন্নত চিন্তাধারা ও কৌশলের মাধ্যমে জাতির শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রকৃত মানোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে কী? অশান্তির দাবানল বিশ্বব্যাপী দাউ দাউ করে জ্বলা বন্ধ হচ্ছে না কেন? বিচারের কাঠগড়ায় অপরাধী শাস্তি পাওয়ার পরিবর্তে নির্দোষ মানববিচারের জগদ্বল পাথরের চাপায় কাতরে মরছে কেন?

আজকের এই নব্য জাহেলিয়াত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হলে মানবতার নৈতিকমান উন্নয়নের বিকল্প নেই। আজ বিশ্ব মানবতার একমাত্র রক্ষাকবচ হলো নৈতিকমান, যে মানোন্নয়নের ফলে দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

এসব প্রশ্নের সদুত্তর অনেকে সারগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেলেও কী কারণে জাতির প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে না, শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে না, তার সঠিক চিন্তা-ভাবনা আমরা কী করতে পেরেছি? গরিব রাষ্ট্রগুলোর কথা বাদই দিলাম। আমেরিকা, ব্রিটেন তাদের কিসের অভাব? সারা বিশ্ব যাদেরকে উন্নত বিশ্বব্যবস্থার রূপকার বলে মনে করে। তাদের প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষগত মানোন্নয়ন থাকলেও তারাই আবার বিশ্বের কাছে ধিক্কারের পাত্র কেন? ইরাকে নির্বিচারে ট্যাংক বুলডোজার ও বিমান হামলার মাধ্যমে লাখো নারী- শিশুর জীবন চোখের সামনে ক্ষত বিক্ষত করল, এ শিক্ষা কিসের? আফগান জনগণের অধিকার হরণের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দসই নেতৃত্ব নির্ধারণ করে একটি সম্ভাবনাময়ী জাতির সর্বনাশ কোন উন্নত ব্যবস্থার প্রয়োগ? কাগজে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করা, যান্ত্রিক জগতের চরম উন্নতি সাধন করা, বৈষয়িক উন্নতি সাধন হওয়াই কি মানুষের প্রকৃত শান্তি? তারাই কি প্রকৃত মানুষ? যারা বিশ্বব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে একজন ব্যক্তির বিচার করার পরিবর্তে একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিলো, তারা কিভাবে প্রকৃত মানব?

যারা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তারা বিভিন্ন ধরনের গ্র্যাজুয়েশন লাভ করার পর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোতে কর্তব্য পালন করে। তারা চাইলে তো নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জাতিকে

www.pathagar.com

শান্তির অবসাদের ছায়াতলে আশ্রয় দিতে পারত। কিন্তু যদি লক্ষ্য করি যারা আইন প্রণেতা আইনের শাসক, তাদের হাতে আইন কোন হালতে আছে? না আইনের খোলস মাত্র প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রশাসনের যাদের হাতে জাতির জান-মাল, ইজ্জত আবরু তারা কি রক্ষক বা সেবকের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, না নিজের আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত?

আমাদের সমাজে প্রকৃত নৈতিক মানসম্পন্ন ব্যক্তির বড়ই অভাব। এ অভাবের ঘূর্ণায়নের ফলে প্রতিটি স্তরেই সত্য মিথ্যার আবরণে ছেয়ে আছে। সুন্দর অসুন্দরের দিকে ছুটছে। শান্তি অশান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত হচ্ছে। যদি জাতিকে প্রকৃত উন্নতি ও শান্তির দিগন্তে ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে যারা যেখানে দায়িত্বরত আছেন, তারা নিজের মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে, জবাবদিহীতা নিয়ে পালনে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে অধিকার সংরক্ষন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে শ্রেষ্ঠ নৈতিক মান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ আদর্শের নায়ক মুহাম্মদ (সা) এর যুগে নৈতিকমান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আরবের বর্বর জাতিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

আজকের এই নব্য জাহেলিয়াত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হলে মানবতার নৈতিকমান উন্নয়নের বিকল্প নেই। বিশ্ব মানবতার একমাত্র রক্ষাকবচ হলো নৈতিকমান, যে মানোন্নয়নের ফলে দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

লেখকঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

‘জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের
নীরব ভ্রুকুটি হেরি,
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য উঠার
কত দেরি কত দেরি।’

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে পরাজয়ের দাবি কতটা বাস্তবসম্মত?

-ড. রশিদ আল ঘানুশি

যখনই ইসলামপন্থীরা কোন বিপর্যয়ের শিকার হয় অথবা ভোটের রাজনীতিতে সামান্য ব্যবধানে হেরে যায়, তখনই ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে যেসব পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ কাজ করেন, তারা দাবি করেন যে, পলিটিক্যাল ইসলাম কার্যত ব্যর্থ, ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের সব ফোরাম ও মিডিয়াই এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এসব পশ্চিমা বিশেষজ্ঞের অনুসারী মিডিয়া ও পর্যবেক্ষকরা তখন তর্কাতীত ও বাস্তব তথ্য হিসাবে এই কথাটির প্রতিধ্বনি করতে শুরু করেন। মিসরের বর্তমান ঘটনা প্রবাহ এসব ব্যক্তিদের সভা সেমিনার ও মন্তব্যের জন্য যথেষ্ঠ উপাদান সরবরাহ করেছে, জনসম্মুখে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা বৃদ্ধি করতে আপাতভাবে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এসব দাবী কতটা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত? পলিটিক্যাল ইসলাম বলে যা পরিচিত তা কি প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগ্রত ক্ষীয়মান এবং চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ কিংবা পরাজিত হতে যাচ্ছে। নাকি নব উদ্যমে যাত্রার জন্য কৌশলগতভাবে কয়েক ধাপ পেছনে যাচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে তাদের গতিকে উর্ধ্বমুখী করবে?

ইসলামপন্থীরা নিজেদের জন্য পলিটিক্যাল ইসলামের পরিবর্তে 'ইসলামিক মুভমেন্ট' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ইসলামিক মুভমেন্ট বলতে আল্লাহর সব আইন প্রতিপালন, জীবনের সব ক্ষেত্রে সে আইনের অনুসরন, মানবজাতির কাছে আল কুরআনের যে বার্তা তার বাস্তবায়ন-এসব কিছুকেই বোঝায়। পরিসংখ্যানিক তথ্য অনুযায়ী ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ধর্ম যার অনুসারীরা ধর্মের কারনে তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ কুরবানি করতে প্রস্তুত। কাজেই পলিটিক্যাল ইসলাম বা ইসলামিক মুভমেন্ট-যাই বলিনা কেন, এটাই হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আন্দোলন, যার রয়েছে ধর্মীয় ভিত্তি। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে ইসলামিক মুভমেন্ট সম্প্রসারিত হচ্ছে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দ্রুতগতিতে। বিশেষ করে পরিবার ও গোত্র প্রথার ক্ষেত্রে, আধুনিক সভ্যতার দূর্বলতা, অস্তিত্ব রক্ষার উদ্বেগ ও আদর্শিক শূন্যতার কারণে ইসলামী আন্দোলন তথা পলিটিক্যাল ইসলামের গতি খুব কম বাধার সম্মূখীন হচ্ছে। ইসলামিক মুভমেন্টের গতি বৃদ্ধির ঘটনা এমন সময় ঘটছে, যখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা জনগনের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য তা পরিত্যাগ করছে। ফলে সাধারন জনগনের মধ্যে উদ্বেগ ও বিচ্ছিন্ন প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটি হচ্ছে সেকুলারিজমের ক্রমাগত বৃদ্ধির একটি ফলাফল।

www.pathagar.com

ফলে মানুষ সেকুলারিজমের পরিবর্তে সংস্থা-সংগঠনের এমন একটি কেন্দ্রের সন্ধান করছে, যেখানে দেহ ও আত্মার চাহিদা, ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদা, ধর্মীয় ও পার্থিব চাহিদা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব কিছুরই সন্নিবেশ আছে। ইসলামের যে সর্বব্যাপী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বর্তমান সমাজের প্রার্থীত এসব বৈশিষ্ট্যের সব কিছুই বিদ্যমান। আর এসব কারনেই ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অপপ্রচার ও দানবীয় নানা দোষ যুক্ত করার পরও বিভিন্ন পেশা ও সংস্কৃতির মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সব ধর্মের মধ্যেই রয়েছে চরমপন্থী সংখ্যালঘু গোত্র। ইসলামী আন্দোলন খুব সচেতনভাবে এই চরমপন্থা ও উগ্রবাদমুক্ত। মূলধারার ইসলামী আন্দোলন ইসলামকে উপস্থাপন করেছে বিভিন্ন সভ্যতার যে অর্জন ও অবদান তার পরিপূরক ও সম্পূর্নতাদানকারী হিসেবে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ এ অর্জনগুলো হলো- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা, সুবিচার, ন্যায়নীতি, আইনের সমতা, ধর্মবিশ্বাস-লিঙ্গভেদ-গোত্রভেদ নির্বিশেষে সবার সম-স্বাধীনতা, সবার নাগরিক অধিকার, মানবতার মূল্যায়ন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ইসলামী আন্দোলন কখনোই এসবের বিরোধিতা করেনি। বরং আল কুরআনের এসব অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বর্গীয় মানবীয় অধিকার বলে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষনা- 'আমরা নিঃসন্দেহে আদমের সব সন্তানকে সম্মানিত করেছি'।

ইসলামী আন্দোলন সব সময় বিশ্বাস করে- ইসলাম মানুষের সহজাত ধর্ম। তাই ইসলামী আন্দোলন মানব সমাজের সমস্যা সমাধান করতে চায় এবং মানব সমস্যার যে কোন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে চায়। আর এ কাজ করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন ইসলামের চিন্তা-দর্শনের সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ যেকোন সভ্যতার অর্জিত অভিজ্ঞতা, যা মানব সমাজের সামষ্টিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখে, তার সাহায্য গ্রহন করে। ইসলামী আন্দোলন মানবজাতির নীতি, চেতনা ও বিবেকের সবচেয়ে নিকটবর্তী। ইসলামী আন্দোলন-মানবজাতির নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে তা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে তবে তার সহজাত আবেদন নিঃসন্দেহে সব বিতর্ক ও অপপ্রচারকে ছাড়িয়ে যাবে। বিগত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ব্যাপী ইসলামী আন্দোলনগুলো বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং বিরামহীনভাবে এ নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ইসলামী আন্দোলনের উপর ক্রমাগত নির্যাতনেরর অনেক ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে। যেমন- আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকার প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। ইসলামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান দল বা গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পকে যুক্ত হচ্ছে এবং বিগত তিনটি জেনারেশনের ভেতর ইসলামী আন্দোলনের অংশীদারিত্বমূলক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের উপর চালানো অকথ্য নির্যাতনের ফলে তারা অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে অন্য যেকোন রাজনৈতিক দলের তুলনায় জনগনের অধিক সহানুভূতি অর্জন করেছে। কারণ অন্যায়-অবিচারের বিপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের এই ত্যাগ তিতিক্ষাকে সাধারন মানুষ স্মরণ রাখছে এবং মূল্যায়ন করছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে রয়েছে। কারণ ইসলামী আন্দোলন শুধু জনগনের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাকেই সম্মান করছে না বরং জনগনের মৌলিক মানবাধিকার ও ভোটের যে অধিকার রয়েছে তা সংরক্ষন করার জন্য লড়াইও করছে (বিশেষ করে মিসরের ক্ষেত্রে), তা ছাড়া সেখানে মুসলিম ব্রাদারহুড, আরব বিপ্লবের যে চেতনা ও প্রত্যাশা ছিলো-যেমন মিডিয়ার স্বাধীনতা, বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের সব কাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা ইত্যাদির জন্য শান্তিপূর্ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্য দিকে ওয়াবদা পার্টিসহ অন্যান্য তথাকথিত উদারপন্থী দল আরব বিপ্লবের যে চেতনার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। তারা সামরিক প্রশাসনের সহযোগিতা নিচ্ছে। আবার জণগনের বিপরীতে সামরিক ক্যু কে সহযোগিতা ও সমর্থন দিচ্ছে। জনগনের ভোটাদিকার যখন সামরিক শাসন ও তার বন্ধুকের গুলির সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে, জনগণের ইচ্ছা যখন পদদলিত হচ্ছে, মানুষ যখন তার বাক স্বাধীনতা হারাচ্ছে, জেলখানাগুলো যখন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা নির্বিচারে ভর্তি হচ্ছে, যখন বেসামরিক জনগন অকারণে গুলির শিকার হচ্ছে- তথাকথিত উদারতাবাদী দলগুলো পেছনে থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সহযোগিতা করছে।

> ইসলামী আন্দোলনের উপর ক্রমাগত নির্যাতনের অনেক ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে। যেমন- আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকার প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। ইসলামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান দল বা গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে যুক্ত হচ্ছে এবং বিগত তিনটি জেনারেশনের ভেতর ইসলামী আন্দোলনের অংশীদারিত্বমূলক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের উপর চালানো অকথ্য নির্যাতনের ফলে তারা অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে অন্য যেকোন রাজনৈতিক দলের তুলনায় জনগনের অধিক সহানুভূতি অর্জন করেছে।

ইসলামী আন্দোলন বর্তমানে জাতীয়তার সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মানুষের অধিকারের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনে। সেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হামাসের সাথে সহযোগিতার অজুহাত তুলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। আধুনিকতার দাবীদার তথাকথিত এলিট মিসরীয় ও তার দোসর আরবরা যে সামরিক ক্যু কে সহযোগিতা দান করলো-এটা কি আত্মঘাতী নয়? তাদের এ অবস্থান ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিপরীত। ঐতিহাসিক, কৌশলগত এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনভাবেই কি আমরা সেক্যুলারের বিজয় বলতে পারি? সামরিক শাসনের নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও একগুয়েমির কারণে যা হয়েছে তাকে কি পলিটিক্যাল ইসলামী আন্দোলনের পরাজয় বা মৃত্যু বলে বিবেচনা করতে পারি?

প্রকৃতপক্ষে মিসরে যা ঘটেছে তা কোনভাবেই ইসলামী আন্দোলনের পতন নয়। এটি বরং

www.pathagar.com

আরব জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলারদের পরাজয়। যদি তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে জনগনের সারিতে না আসে- তাহলে তাদের অতীত ভূমিকার পতন ঘটবে। ইতোমধ্যে মিসরের সামরিক এই ক্যু ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক বাড়তি সুযোগ নিয়ে আসবে। ইসলামী আন্দোলন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের গৃহীত নীতির পূনর্মূল্যায়ন করতে পারবে এবং তাদের ভূলগুলো সংশোধন করতে পারবে।

মিসরসহ যেকোন দেশের ক্ষেত্রেই ইসলামী আন্দোলন বিরোধী দলগুলোর সাথে আরও যোগাযোগ বাড়াতে শিখবে। বিশেষ করে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার পরিচালনা যে এক দল দ্বারা হওয়া উচিত নয় অথবা রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি যে একটি দল বা একই ধারার দলগুলো দ্বারা প্রণীত হওয়া সমুচিত নয়- এসব বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবে। মিসরসহ সব দেশের ইসলামী আন্দোলন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে যে, জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা এবং তাদের জোটে অন্তর্ভূক্তিই যথেষ্ট নয়, বরং জোটের নেতৃত্ব পর্যায়ে তাদের স্থান দিতে হবে-কারণ ইসলাম হচ্ছে গোটা জাতির সম্পদ। যদিও মুসলিম ব্রাদারহুড মিসরের সামরিক স্বৈরশাসকদের হাতে ধারাবাহিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে-বিশেষ করে জামাল আবদেল নাসেরের হাতে। প্রথমে শুনতে পেলাম জেনারেল আল সিসির সময়ে মোট শাহাদাতের সংখ্যা ৬০-এর বেশি নয়। এর পরেই আমরা শুনতে পেলাম হাজার হাজার লোকের শাহাদাতের সংবাদ, আহত হওয়ার সংবাদ এবং জেলে যাওয়ার ঘটনা। সিসির এই নির্যাতনই তার সামরিক বৈধতাকে খাটো করেছে। আর একটি নির্যাতনের ফলাফল দমন করতে গিয়ে জেনারেল সিসি জনগনের শান্তিপূর্ন ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দমন করার জন্য নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়েই চলছে।

আধুনিক যুগে স্বৈরশাসকদের নির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে হাজারো শক্তিশালী স্যাটেলাইট আলোকরশ্মির সামনে, যা লুকানো অসম্ভব। অতীতে ফারাও সম্রাটদের সময় এসব নির্যাতন সংঘটিত হতো অনেকটা সংগোপনে এবং পর্দার অন্তরালে। ফলে তথ্য গোপনের মাধ্যমে ফারাও সম্রাট জনগনের ওপর তার নিয়ন্ত্রন রাখতে সক্ষম হয়েছিলো, যা সিসির পক্ষে সম্ভব নয়।

ফলাফলঃ উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, সময়ের চেয়ে দর্শন ও চিন্তার জগতে ইসলাম আজ আরও শক্তিশালীভাবে দৃশ্যমান। যদিও আধুনিকতা তার সর্বশক্তি দিয়ে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন মেগা প্রকল্প হাতে নিয়ে ইসলামকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে; কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্নয়ন, সুবিচার, ঐক্য অথবা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা-সব ক্ষেত্রেই তাদের গৃহীত পদক্ষেপ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারনে 'ইসলাম' প্রসঙ্গটি বরাবর সামনে আসছে এবং আধুনিকতার ইতিবাচক দিকগুলো আলোচিত হচ্ছে। পলিটিক্যাল ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন তার নীতি ও কৌশলের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধনের পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এর নিকটতম ফলাফল হবে জননন্দিত কার্যকর সরকার ব্যবস্থা উপহার দেওয়া। তথ্য প্রবাহের এই যুগে কোন নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারবিহীন সামরিক ক্যু এবং ক্যু-প্রচেষ্টার কারণে ইসলামী আন্দোলনকে এখন আর যুগের পর যুগ

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে হবে না। ইসলামী আন্দোলনের শিকড় নিজ নিজ সমাজের গভীরে প্রোথিত। ইসলামী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে। ইসলামী আন্দোলন স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তারা ইসলাম ও আধুনিকতার সুসামঞ্জস্যতার সঠিক বিকাশে তৎপর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'নিঃসন্দেহে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ও সব কিছুরই ওপর তার রয়েছে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যদিও অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়' (সূরা ইউসুফ-২১)।

লেখকঃ প্রধান, আন নাহদা পার্টি, তিউনিশিয়া।

এ মিছিল
রুখতে পারে
সাধ্য কার?
এ কাফেলা
আল্লাহ ছাড়া
বাধ্য কার?

www.pathagar.com

যুব অবক্ষয়ের প্রতিকারের উপায়

-আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

আমরা সামাজিকভাবে এক অবক্ষয়ী সমাজের বাসিন্দা। আমাদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক ধর্মবিমুখ এক ধর্মনিরপেক্ষ, ভোগবাদী ও ভোগসর্বস্ব সমাজ যার সর্বশেষ পরিণতি অবক্ষয়, অবক্ষয় এবং অবক্ষয়। অবক্ষয়ের শিকার বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ যুবসমাজ। তামাম পৃথিবীর ভাঙা ইতিহাস রচনায় এদের রয়েছে এক অনস্বীকার্য ভূমিকা এরাই সৃষ্টির কারিগর, ধ্বংসের প্রমিথিউস। বিশ্বময় মানুষের মধ্যে আবার একটি নতুন রেনেসাঁর পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে। রেনেসাঁত্তোর পৃথিবীর নৈতিক বাঁধনমুক্ত যে ভোগবাদী সভ্য সমাজ গড়ে উঠেছে তার অন্তঃসারশূন্যতা ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং দিন যত যাচ্ছে ততই তা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থ-বিত্ত-আকাশচুম্বী সভ্যতা, দিগন্তপ্লাবি সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন উৎকর্ষতা সত্ত্বেও গোটা ইউরোপ, আমেরিকার বুক চিরে বেরিয়ে আসছে এক অসহায় আর্তপীড়িতের ক্রন্দন। ইউরোপ আজ যেন নিজেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, নিজের গড়া দানবের হাতে বন্দী-মুক্তির জন্য কেঁদেও তার মুক্তি নেই। ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র মানব সভ্যতায় যুব সম্প্রদায়ের রয়েছে মূখ্য ভূমিকা। আজ যুবসমাজ সবচেয়ে বেশী অবক্ষয়ের শিকার। সদা ক্রিয়াশীল যুবক কখনো নিষ্ক্রিয় থাকার নয়। হয় সে মেতে উঠবে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে না হয় মেতে উঠবে ধ্বংসের উন্মত্ততায়। কিভাবে সম্ভব অবক্ষয়ের আবর্তে নিমজ্জিত তারুণ্যের উদ্বেলতাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা?

যুব সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজ

শৈশব-কৈশোর-প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের ন্যায় যৌবন কথাটি মানব চক্রের নির্দিষ্ট স্তরকে বুঝায়। লিঙ্গ পার্থক্য বিবেচনায় না এনে নারী পুরুষ একটি বয়োঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হলে তাদের আমরা বলি যুবক। জাতি সংঘের মতে ১৫-২৪ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলে মেয়েই যুবক হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের চর্তুথ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫-৩০ বছর বয়স সীমায় অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি নাগরিক যুবক হিসেবে গন্য। মালয়েশিয়ার মতো অনেক দেশে যুবকের বয়সসীমা ১৫-৪০।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল, দরিদ্রতম ও বিকাশমান দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯১ সালের আদমশুমারী রির্পোট অনুযায়ী ১৯ বছর বয়স সীমার নীচে জনসংখ্যা ৪৮.৫%। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে অর্থ্যাৎ যুবকের হার বাড়ছে। শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতেই যুবকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ইউরোপ- আমেরিকারসহ তথাকথিত উন্নত বিশ্বে যুবশ্রেনীর স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি খুবই প্রকট। ১৬ বছর বয়স হয়ে গেলেই ছেলেমেয়েরা (Adult, matured), বয়োঃপ্রাপ্ত। এমনকি বাবা কিংবা মা তাদের মারধর করলে তারা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দিতে পারে। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যেখানে বর্তমানে ৩০% এর বেশী মানুষের পিতৃ পরিচয় নেই, নেই মানব সমাজের শ্বাশ্বত মূল্যবোধ গুলোর কোন চর্চা, আমরা তাদের অবক্ষয় নিয়ে আলোচনায় প্রয়াস না নিয়ে প্রয়াস চালবো বাংলাদেশের যুব-অবক্ষয় ও তার প্রতিকার বিষয় আলোচনার।

www.pathagar.com

যৌবনের ধর্ম ঃ

যৌবনের ধর্ম নতুনত্ব, অস্থিরতা, ভেঙ্গে-গড়ার প্রবণতা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশটির নাম যৌবন ও সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়টিই যৌবন। আল্লাহ তা'য়ালা যৌবনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন এভাবে- "যুবকের একটিবার ডাকে তিনি চল্লিশবার সাড়া দেন। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের রক্ত হচ্ছে যৌবনের রক্ত"।

হাদীসে রাসূলে (স:) রয়েছে "পাচঁটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আল্লাহর বান্দারা কেয়ামতের মাঠে একটি কদম সামনে যেতে পারবে না- যে যৌবন দেয়া হয়েছে তা কোন কাজ ব্যয় করছে? যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা কোন কাজে লাগিয়েছে। কোন পথে আয় এবং কোন পথে ব্যয় করেছে ? দৈহিক শক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? যৌবন জীবনের একটি অংশ, দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন। আল্লাহ যৌবনে কৃত নেক আমলের পুরস্কারও দেবেন আলাদা হিসেবে। কেয়ামতের দিন কঠিন অবস্থায় আরশের ছায়ায় আশ্রয়প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষের একটি হচ্ছে ঐ যুবকেরা, যাদের অন্তর মসজিদের সাথে থাকে। নবী কারীম (সা) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়ার সময় বললেন পাঁচটি বিষয়ের প্রতি (সময় থাকতেই) গুরুত্ব প্রদান কর- বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের; রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের; দারিদ্র আসার আগে স্বচ্ছলতার, ব্যস্ত হওয়ার আগে অবসর সময়ের এবং মৃত্যু আসার আগে জীবনের"। মূলতঃ যৌবনের গুরুত্বই আলাদা, ধর্মই অন্যরকম। যেখানে চঞ্চল কিশোরের কৌতুহল থমকে দাঁড়ায়, বয়োবৃদ্ধ, প্রৌঢ় ভাবনার কাছে বন্দী হয়ে যায়, সেখানে যৌবন বিদ্রোহ করে, উদারতা মাড়িয়ে যায় সমস্ত স্থবিরতা ও অলসতাকে। এদেশের এক কবি যৌবনের ধর্ম চিহ্নিত করেছেন এভাবে-

এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার।

এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার।

যৌবনের ধর্ম পুরাতনের বিরোধ আর নতুনেরে গ্রহণ।

ভাল-মন্দ ভূত ভবিষ্যত বিবেচনায় ফুসরত পাওয়ার আগেই যৌবন দূর্বার গতিতে ছুটে যায় নতুন নতুন বিষয়ের দিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সব বড় ঘটনার নায়ক যুবক, চাকা ঘুরিয়ে ইতিহাসের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছে যুবক। নবী করিম (সা) এর দাওয়াত কবুলকারী বিচক্ষণ তরুনটি ছিল হযরত আলী (রা)। দুর্দিনে মুসলমানের সাথী হয়ে সর্বপ্রথম আকাশ কাঁপিয়ে আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে দেন যিনি, তিনি একজন যুবক ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), চারদিকে ইসলামকে বিজয়ীবেশে উপস্থাপন করেন যিনি তিনি ও এক অসীম সাহসী যুবক খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা), মাত্র সতের সওয়ারী নিয়ে বাংলার ভাগ্য বিতাড়িত মানুষের কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন যিনি তিনিও যুবক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বকতিয়ার খিলজী, সিন্ধু নদী পাড়ি দিয়ে হিন্দু পৌত্তলিকতার তিনি অবসান ঘটিয়ে নির্যাতিত মানুষের কাছে মুক্তির শ্লোগান পৌছিয়ে ছিলেন যুবক তিনিই মুহাম্মদ বিন কাশেম। শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয় বিশ্ব জগতে যতগুলো রেকর্ড রয়েছে চাই খেলাধুলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কিংবা বিজ্ঞান যেদিকেই তাকাবেন আপনি বিজয়ীর মঞ্চে যাকেই দেখবেন সেই যুবক। যৌবন তাই বিজয়ের ধর্ম নিয়ে চলে। পরাভব পরাজয়ের চেয়ে যৌবন মৃত্যুকে অনেক শ্রেয় মনে করে।

অবক্ষয়ের কবলে যুবক ঃ

এ পর্যায়ে আমরা আঁকবো এমন এক চিত্র যেখানে বাংলাদেশের যুব সমাজের অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠবে। কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন- অবক্ষয় কি? কেননা একজনের মতে যেটি মূল্যবোধ অপরজনের দৃষ্টিতে সেইটি

www.pathagar.com

গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, পশ্চাদপদতা, একজনের মতে যেটি অবক্ষয় অপর একজনের মতে সেটি প্রগতি, উন্নতি ও অগ্রগামীতা। কিন্তু একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে কাম্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও মান থেকে সরে যাওয়াটাই মূলতঃ অবক্ষয়। ডঃ আহমদুল্লাহ মিয়ার মতে বর্তমানে যুব সমাজ বেকারত্ব, দারিদ্র, হতাশা, নিরক্ষরতা, অদক্ষতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে উশৃঙ্খল আচরণ করছে। এরা নেশাগ্রস্ত, আত্মবিশ্বাসহীন এবং কর্ম-শক্তিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। যুবকদের এই হতাশাজনক অবস্থা তাদের বিভিন্ন ধরণের অপরাধও সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে আকৃষ্ট করে তুলছে। অপর দিকে এক গবেষণায় দেখা যায়, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের বয়স ১৫-৩০ বছরের মাঝে সেসব পুরুষদের ৬০% এবং যুবতীদের ৫০% নেশাগ্রস্ত। এছাড়া ফিরোজ (১৯৮৮) সালে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মাদকাসক্তদের ৮৯% ৩০ বছরের নীচে, মুস্তফা দেখেছেন এদের ৮৪% ৩০ বছরের নীচে এবং অতিসম্প্রতি দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি দৈনিকের রিপোর্টে দেখা যায় নেশাগ্রস্ত ও নেশা দ্রব্যের চোরাচালান ও এই ব্যবসার সাথে জড়িত ৯০% যুবক যুবতী, বস্তিবাসী ও কর্মসংস্থানহীন লোক। উপরের চিত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে এদেশের যুবশ্রেনী মাদকাশক্তিতে বেশি আক্রান্ত।

ডঃ আতাউর রহমান ও মোঃ নুরুল ইসলাম তাদের গবেষণায় বাংলাদেশের যুব সমাজের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান, তারা গতানুগতিক ভাবে পারিবারিক পরিবেশে অভিভাবকের প্রতি আনুগত্যশীল ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্র সমূহে নিজস্ব উচ্চতম সঙ্গী নির্বাচন ও অবাধে সঙ্গলাভের সুযোগ করে নিচ্ছে। প্রেমের বন্ধনে কোন কোন যুবক যুবতী সংসারে পদার্পণ করছে আবার কেউ কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হতাশাজনক জীবনে পাড়ি দিয়ে নেশা, অস্ত্রবাজী কিংবা অপরাপর বিভিন্ন সামাজিক অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এভাবে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মহত্যা, যৌতুকপ্রথা, কালোবাজারী, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীপাচার ও পতিতাবৃত্তির মতো অসামাজিক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের যুব সমাজ অনৈতিকতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সমূহে চোখ বুলালেই দেখা যাবে-খুন রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজীসহ নানাবিধ অসহনীয় সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র, যার সাথে জড়িয়ে আছে অবক্ষয়ী তরুণ তরুণী। খুনের আবার ধরণ কি? পুত্রের হাতে নৃশংস নির্মম মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছেন নেশার পয়সা যোগাতে ব্যর্থ পিতা, যুবক স্বামীর হাত ধরে একদিন ঘর বেঁধেছিলো যে যুবতী, তাকে যৌতুকের বলি হয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে পথের পাশে, পরকীয়া প্রেমের ছোবলে দংশিতা যুবতী বধুর লাশ বার বার আঘাত হানছে আমাদের বিবেকের দ্বারে, মাস্তানীর বিরোধিতা করতে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরছে এলাকার শান্তিপ্রিয় সুবোধ যুবক। এ্যাকশন ফিল্মের প্রভাবে আজ ছোট্টস্কুল ছাত্র ইশা তারই বন্ধুদের হাতে প্রাণ দেয় রাজধানীর বুকে। সারারাত ধর্ষিতা হয়ে মৃতুর কোলে ঢলে পড়ে আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া অসাবধান তরুণী। স্বামীর সামনে সারারাত সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে হত্যাকরা হয় গার্মেন্টস কর্মী অবলা যুবতীকে। সন্ত্রাস কবলিত শিক্ষাঙ্গনগুলোর চিত্রতো আরো ভয়াবহ। দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে কাজ করতে গিয়ে মা-বাবার কাছে লাশের-কফিন হয়ে ফিরে যাচ্ছে কত সাহসী যুবক। ঠিকাদারী আর টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে প্রাণ হারাচ্ছে কত সম্ভাবনাময় তরুণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী আজ জড়িয়ে পড়ছে নেশায়, নেশার

www.pathagar.com

পয়সা যোগাড় করতে নিজেকে জড়াচ্ছে দেহ ব্যবসায়, বড় বড় হোটেলে আজ তারা নিজেকে বিকিয়ে বেড়াচ্ছে। একথারই প্রতিধ্বনি করেছেন ড. হুমায়ুন আজাদ, আগে কাননবালারা আসতো পতিতালয় থেকে, এখন তারা আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে। অবক্ষয়ের এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? উপরের চিত্রটিকে সামনে রেখে আমরা অপর একটি বিষয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারি। আর তাহলো- এই অবক্ষয়ের কারণ কি?

১. নৈতিক অবক্ষয় ঃ (Moral Degradation)

মূলতঃ মানুষ নৈতিক জীব। একটি নির্দিষ্ট বোধ-বিশ্বাসের আলোকে তার নৈতিকতা গড়ে উঠে। আমাদের যুব সমাজ এই বোধ বিশ্বাসের সংকটে পতিত হচ্ছে। এদেশে আজ একটি প্রজন্ম গড়ে উঠছে যারা স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর। আল্লাহকে মানা না মানার বিষয়টি তাদের কাছে খুবই গৌণ। জীবনের ইহকালীন ও পরকালীনতার বিষয়টি তারা কখনো বিবেচনায় আনেনা। তাদের কাছে ইহলোকই শুরু ও শেষ, পরলোক অবিবেচ্য বিষয়। একটাই ওদের দর্শন 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/বাকির খাতা শূন্য থাক, দুরের বাক্য শুনে কি লাভ/মাঝখানে তার বেঝায় ফাঁক'। পৃথিবীতে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রসাদ ও আত্মতুষ্টির প্রসাদ। এক আত্মকেন্দ্রিকতা যুবকদের নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলছে। 'নিজে বাঁচলে বাবার নাম' এই যাদের বোধ তাদের কাছ থেকে সমাজ কতটুকু সামাজিকতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা, দেশপ্রেম আশা করতে পারে? খুবই নগন্য। ইউরোপ আমেরিকায় এই আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙ্গে ফেলছে পারিবারিক প্রথা। সেখানে জন্ম নিচ্ছে এক চাপা কান্না। মায়ের প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি বাবা মার দায়িত্ব সচেতনতা লোপ পেয়ে তৈরী হচ্ছে এক বিস্ময়কর সমাজের। যেখানে আস্তে আস্তে বাবা অঙ্গশায়ী হতে চায় এ অজুহাতে যে তিনি তার পড়ার খরচ দিচ্ছেন আর মা ছেলেরা শয্যাসংগীনি হতে চান তার বাবাকে কাছে না পাওয়ায়। এই একই ধারার সমাজ জীবন আমাদের উঁচুতলায় মাঝে মাঝে খবর হয়ে বেরিয়ে আসছে। আমাদের যুবক-যুবতীরা এর মরণ ছোবল থেকে কি বাঁচবে?

২। মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ (Lose of Values)

নৈতিকতা আর মূল্যবোধ কাছাকাছি শব্দ হলেও এর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। ইসলাম, খৃষ্টান ইহুদী বা হিন্দু মূলতঃ নৈতিকতার নিয়ামক। নৈতিকতার সাথে ধর্মবোধের নিগুঢ় সংযোগ রয়েছে। কিন্তু মূল্যবোধ ধর্মহীন ও হতে পারে। মূল্যবোধ একটি সমাজ ও সভ্যতার অবদান। ধর্মহীনতা সমাজ-সভ্যতা থেকে মূল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। সে বিবেচনায় ধর্ম ও মূল্যবোধ পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজতান্ত্রিক সমাজও এক ধরণের মূল্যবোধের জন্ম দিতো। আমাদের যুবকেরা ক্রমশঃ মূল্যবোধের সংকটে নিপতিত হচ্ছে। আমাদের ধর্মবোধ হারানোর পাশাপাশি এক কর্মহীন ধর্মবোধ জন্ম নিচ্ছে। এমন বহু লোক আছেন যারা নামাজ পড়েন, সুদ খান, ঘুষ খান ও দেন, পর চর্চা করেন, মিথ্যা বলেন ইত্যাদি নানা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করেন। যুবকেরা বড়দের এই আচরণ দ্বারা নিত্য প্রভাবিত হবেন এটিই স্বাভাবিক। এটাই কর্মহীন ধর্মহীন ধর্মবোধের কুফল। আগেই বলেছি পারিবারিক প্রথা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জাতীয় চেতনা এ সব মূল্যবোধ ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠি স্বার্থের কাছে। এরই ফলে অভাব দেখা দিচ্ছে উদারচেতা, সাহসী, দেশপ্রেমিক, সামাজিক ও

www.pathagar.com

জনকল্যাণকামী যুব সম্প্রদায়ের।

কেন এই অবক্ষয়ঃ

আমাদের তরুণেরা হঠাৎ করেই এক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ে, না কি এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী ষড়যন্ত্রের ফল? হ্যাঁ একদিকে এটি আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি, উদাসীনতা আর বেখেয়ালীর পরিণতি অপরদিকে তা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের উপর চেপে বসা শাসকগোষ্ঠি ও বর্তমান বিশ্বমোড়লদের পরিচালিত অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফল। এসব ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিক হচ্ছে-

এক. নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঃ

১৮৮৩ সালে লর্ড ম্যাকলে যখন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করেন তখন তার ভূমিকায় উল্লেখ করেন- "we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions who we govern: a class of persons Indians in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect" অথ্যাৎ আমরা এমন একটি শ্রেণী তৈরি করবো যারা আমাদের ও শাসিত বৃহৎ জনগোষ্টির মাঝে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্তে-মাংসে-বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত তরুণরা আজ ইংরেজ, আমেরিকান বা ভারতীয় হচ্ছে, ভাল বাংলাদেশী বা ভাল মুসলমান হচ্ছে না। কেননা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম উপেক্ষিত, দেশপ্রেম অনুপস্থিত, নৈতিকতা জাগতিকতার কথা। সে শিক্ষাব্যবস্থা সুদকষার মাধ্যমে লাভের হিসেব শিখায়, ভেজালের উপর লাভ-ক্ষতির হার বের করতে বলে। ঘুষকে অনুৎসাহিত করে না। সে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত যুবক আত্মকেন্দ্রিক, মুনাফাখোর, সুদী ও ঘুষখোর হবে এটাই স্বাভাবিক। যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে বানরের বংশধর হিসেবে জ্ঞান দেয়, মানব জন্মের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতন রাখে তাতে শিক্ষিত হয়ে কেউ অমানুষ ও মানবতাবিরোধী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কেবল সিলেবাস-কারিকুলাম নয় সামাজিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, শিক্ষার পরিবেশকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেনো এখানে মানুষ বিপথগামী হয়। সহ-শিক্ষায় শিক্ষিত তরুনেরা এক পর্যায়ে জুটি বাঁধবে, অবৈধ সম্পর্ক রক্ষা করবে, প্রেমের মহড়া দিবে তারপর আবার হতাশও হবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা।

দুই. প্রচার মাধ্যম (Media)

বর্তমান সময়টি মিডিয়া সাম্রাজ্যের সময়। যে জাতি বা দেশের হাতে মিডিয়া তারাই এখন পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছে। কাঁধে তুলে নিচ্ছেনা বরং অদৃশ্য সুতোর টানে এখন সবকিছু তাদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মালিকেরা শেষ করে দিচ্ছে আমাদের যুব চরিত্র। দেশের কতিপয় সাপ্তাহিক ও দৈনিকের পাতায় পাতায় এবং অন্যান্য পত্রিকায় যেসব অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন বিকৃত ফিচার রচনা ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীল ও বিকৃত ফিচারাবলী ছাপানো হয় তাতে যুবকেরা এতটুকু ঠিক থাকাইতো বিস্ময়কর। বিবাহিত ও অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা এসব গল্প, উপন্যাস, ফিচার পড়ার পর তা বাস্তবতায় দেখতে আকুল হয়ে উঠে। তাদের ভেতর অতি সংগোপনে একটি নৈতিক ও মূল্যবোধগত পরিবর্তন ঘটে যায়, যার ন্যূনতম মাত্রা হলো এসব কিছুকে নীরবে সয়ে যাওয়ার তথাকথিত (Tolerance) ক্ষমতা।

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী দেশ ও বাইর থেকে এমন কিছু পত্র-পত্রিকা দেশে আসে যেগুলো পড়তে যে কোন রুচিশীল মানুষের বিবেকেই বাঁধবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা এখানে বলাই বাহুল্য।

কি না পারে এই মিডিয়া?

অবাস্তবকে বাস্তব, মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার। অখ্যাতিকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে নেয়া আর খ্যাতিমানের খ্যাতিকে কেড়ে নেয়ার এক অসূরীয় শক্তি আছে এর হাতে। দেশের টি.ভি চ্যানেলের চেয়েও অনেক গুণে মারাত্মক হচ্ছে শুধুমাত্র সস্তা বিনোদন প্রোগ্রামে ঠাসা ক্যাবল নেটওয়ার্ক, ডিস এন্টেনা ইত্যাদি। এসব চ্যানেলে এক নাগাড়ে, ঘন্টা খানিক মা-বাবা, ভাই-বোন সমেত দেখার মতো কোন প্রোগ্রাম থাকে না। থাকে মারদাঙ্গা ছবি, কিংবা প্রায় অর্ধ ও পূর্ণ নগ্ন কোন ছায়াছবি। কোন নাচ গানের অনুষ্ঠান। ডিশের কল্যাণে এসব কিছু ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আরও বড় বিপদ হয়ে এসেছে ইন্টারনেট। ব্যক্তিগত কম্পিউটারে বসে ছেলে-মেয়েরা একাকী অফসিন (নগ্নদৃশ্য) লোড করে ভোগ করতে থাকবে তখন পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ। গভীর রাত পর্যন্তন এসব দেখার পর এর প্র্যাকটিস্ করার এক অদম্য দানবীয় ইচ্ছা জেগে উঠে যুবক-যুবতীদের মনে। আর তারই পরিণতি হয় এক ধ্বংসকর অবক্ষয়। মালয়েশিয়ার মতো উন্নত দেশ যেখানে ডিশ ও ক্যাবলের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বাজায় রাখছে সেখানে একটি হত দরিদ্র দেশে এগুলোর এ অবাধ লাইসেন্স আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল আর কি উপহার দিতে পারে?

তিন. মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়ি, নারী ব্যবসা ঃ

যুবক-যুবতীরা দেশের পরিচালক নয়, ওরা পরিচালিত। দেশে বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থা, সমাজপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তাদের মডেল। অবক্ষয়ে ছেয়ে আছে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের। যে সমাজ নিজে দরদী (Caring) নয়, যে সমাজ আগামী প্রজন্মের মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করেনা, যে সমাজ ভাল হবার কোন মহৎ উদাহরণ স্থাপন করতে পারে না, সে সমাজে বেড়ে উঠা যুবক-যুবতীরা আর কতটুকু ভাল হতে পারে? ওরা যখন ক্ষুধা-দারিদ্র-বেকারত্বের লড়াই করছে তখন ওদের সামনে এসে দুমুঠো অন্ন, লোভনীয় বেতন ভাতা নিয়ে দাঁড়িয়েছে এনজিও। এনজিও ওদের ঘরের বাঁধনমুক্ত এক অনাচারী জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, পরিবার ভাঙছে। কেড়ে নিচ্ছে ক্রমান্বয়ে ওদের লালিত ধর্মবোধ, বিশ্বাসগুলো। কলূষিত এ সমাজে প্রতিবাদী তরুণ হয় মোড়লের গোলাম, না হয় প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে।

চার. বেকারত্ব ঃ

আগেই আমরা বলেছি বাংলাদেশে বেকার তরুণের সংখ্যা ১২ মিলিয়ন, এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রথাগত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসা পাশ শিক্ষিত বেকার তরুণের সংখ্যাও অনেক। যৌবনের উদ্দাম নিয়ে এ তরুণ তরুণীরা বেকারত্বের নির্মম শিকার হয়ে এক পর্যায়ে আয়-রুজির বিকল্প পথ খুঁজতে গিয়ে অবক্ষয়-মূখী যাত্রা শুরু করে। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধ ও অপর্যাপ্ত প্রয়াস যুবক-যুবতীদের জন্য যে কারিগরী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে তা সিন্ধুর মাঝে বিন্দুবৎ।

পাঁচ. জেনারেশন গ্যাপঃ

কথাটি শুনতে খারাপ লাগলেও বাংলাদেশের বর্তমান যুব অবক্ষয়ের এটি অনত্যম কারণ। একদিকে কিছু অতি বিত্তবান পিতামাতা তাদের সন্তানদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে

www.pathagar.com

প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। ওরা কোথায় যাচ্ছে, কি করছে খোঁজ খবর রাখছেন না, ওদেরকে প্রশ্রয় ও প্রাচুর্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। অপর দিকে আর কিছু অভিভাবক উঠতি তরুণ-তরুণী ছেলে-মেয়েটির সাথে ফ্রি হতে পারছেন না, একটা গ্যাপ মেন্টেইন করে চলছেন। ফলে কি হচ্ছে? ওরা আমাদের অজ্ঞাতেই কোথায় যেনো হারিয়ে যাচ্ছে, লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে অপরাধ প্রবণ, অবক্ষয়মূখী হয়ে যাচ্ছে। বলা যায় সংস্পর্শ ও স্নেহ বঞ্চিত তরুণ-তরুণীটি স্বাভাবিক ভাবেই খুঁজে ফিরে বাইরের বন্ধু ও শুভাকাংখী যা অধিকাংশ সময়ই তাদের জন্য হিতকর হয়না।

যুব অবক্ষয়ঃ প্রতিকারের উপায়

আমরা ভুলে যাই- Prevention is better than cure.

অসচেতন হওয়ার কারণেই আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে আজ তার প্রতিকারের পথ খুঁজছি। অবক্ষয়ের এই ধারা প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিকার যোগ্য নয়। তবুও আমরা জাতির ভবিষ্যত রক্ষার তাগিদে, আগামী দিনের যুব সম্প্রদায়কে সুস্থ সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে পারি।

এক. ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাঃ

ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র পাশ্চাত্য তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-মুক্ত করেছে। তাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বও ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ণ করে তাদের মত লেজ কাটাদের দলে অর্ন্তভূক্ত হতে থাকে। এরই ফলে অনৈতিকতার সমস্ত দুয়ার খুলে যায় তরুণ-তরুণীদের সামনে। শিক্ষা ব্যবস্থার এই দীনতার কারণেই পাকিস্তান আমল থেকে তরুণরা অবক্ষয়ের শিকার হতে থাকে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে সরকারের টনক নড়লেও তেমন কাজ হয়নি তাতে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর আবার চাপিয়ে দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। আজ ইউরোপ-আমেরিকাতেও একই আওয়াজ 'Back to the religion'. ধর্মই মানুষের স্বস্তি ও শান্তির একমাত্র ঠিকানা। ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে ছেলে-মেয়েরা ছোট বেলা থেকে আল্লাহর দাসত্ব, তাঁর ভয়, সৎপথে চলা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, দেশের ভালোর জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। যুবকদের ভেতর শৃঙ্খলাবোধঃ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মাতাপিতাকে মেনে চলা ইত্যাদির অনুভূতি সৃষ্টি করতে হলে ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক সুনিবিড় করতে হবে। নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে আনা। ইউরোপ- আমেরিকার হতাশাগ্রস্ত-পথভ্রান্ত তরুণেরা ধর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার পরই লাভ করছে উন্নত নৈতিকতা ।

দুই. শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনঃ

শুধু ধর্মীয় শিক্ষার সংযোগ নয় বরং আমাদের যুব সম্প্রদায়কে সত্যিকারের মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তুলতে হলে দরকার একটি পরিপূর্ণ আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। Jhon Milton এর ভাষায় 'Education is the harmonious development of body, mind and soul'. কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই তিনের সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সহায়ক নয় বরং প্রতিবন্ধক। শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশপ্রেম, মানবিকতা, সততা মহানুভবতা সৃষ্টির জন্য কারিকুলাম পর্যালোচনা করে সংযোজন ও বিয়োজন করা দরকার। বেকার তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থাকে কারিগরি ও প্রয়োগিক শিক্ষা সমৃদ্ধ করে যুবকদের বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। শিক্ষার পরিবেশকে মার্জিত করতে হবে। সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

তিন. প্রচার মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠাঃ

অবাধ তথ্য প্রবাহের নামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত দানবকে নিয়ন্ত্রণের লাগাম পরাতে হবে। চরিত্র বিধ্বংসী, যৌনতার দিকে ধাবিত করতে পারে এমন গল্প-কবিতা- নাটক উপন্যাস-ফিচার ইত্যাদির প্রচার বন্ধ করতে হবে। ডিশের দানবকে শেকল পরাতে হবে। রেডিও, টিভিতে যেসব অনৈতিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয় তা বন্ধ করতে হবে এবং তার স্থলে উত্তর-বিকল্প কর্মসূচী চালু করতে হবে। প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনেই অপরাধ প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে আর এই পশু প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে ডিশের নগ্ন কালচারকে অস্বীকার করা যায় না। ছেলে-মেয়েরা ঝুঁকে পড়েছে এডাল্টফিল্মের দিকে। শুধুমাত্র যুবক তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় নয়, আমাদের সংস্কৃতি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, উৎকর্ষ যান্ত্রিকতার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় তা ভস্মীভূত হতে চলেছে। এ অবস্থায়ও কি সরকার আইন করে এগুলোকে নিয়ন্ত্রনে আনার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না?

চার. আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ ঃ

দেশে প্রচলিত আইনের সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ। স্থান-কাল পাত্র ভেদে আইনের যে নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়' এ কথাটি বক্তৃতায় সুউচ্চ নিনাদ না হয়ে বরং বাস্তবরূপ লাভ করা দরকার। যুবক-তরুণেরা যখন দেখবে আইন অবক্ষয়ের পক্ষে নয় বরং নীতি-নৈতিকতা ও সুস্থতার পক্ষে তখনই তাদের মাঝে জন্ম নেবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমীহ। আইনের ভয়ে ও অনেকাংশে তারা বিপদগামীতা থেকে সরে থাকবে।

পাঁচ. কর্মসংস্থানের উদ্যোগঃ

অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। আমাদের যুবক-যুবতীদের মাঝে যে বিরাট বেকার অংশ রয়েছে তাদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান করতে হবে। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে। সেখানে যুবতীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি। এনজিওরা যে কর্মসংস্থান করছে তাও মেয়েদের জন্যই বেশি। এমতাবস্থায় একটা ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বেকার যুবকগুলো কর্মজীবি যুবতীদের আসা যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে নানা রকম ন্যূইসেন্স সৃষ্টি করে। এসব বেকার যুবকদের হাতে কাজ তুলে দিতে হবে। ব্যাপক কারিগরী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। যুব মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নযন অধিদপ্তরের মাত্র ১৫৪টি স্থায়ী ইউনিটের পরিবর্তে কমপক্ষে ৪৬৮টি থানার প্রত্যেকটিতে একটি করে স্থায়ী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে যুব-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূখী তৎপরতায় জড়িয়ে নিতে হবে। বেকার যুবক-যুবতীদেরকে সরকার দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ আহমদুল্লাহ মিয়ার বক্তব্য প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "এদেশের যুব সমাজের চাহিদা হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মের সুযোগ, স্বাস্থ্য সুবিধা, অর্থপূর্ণ বিশ্বাস, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাড় আস্থা, জাতীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিগত আবেগের সন্তোষজনক অবস্থান"।

ছয়. জেনারেশন গ্যাপ দুর করতে হবেঃ

উঁচুতলার মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে দেশ-মাটি সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ছেলে মেয়েদেরকে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যেখানে যেমন খুশী চলতে দেয়া এবং চাহিবামাত্র অর্থ হাতে তুলে দেয়ার যে বিষফল তা তাদের উপলব্ধি করতে

www.pathagar.com

হবে। বিত্তশালীদের ছেলেমেয়েদের এ আচরণ সমাজের আর অন্য দশজনকেও প্রভাবিত করে। ওরা সামর্থহীন অথচ ওদেরও এরূপ করার সাধ জাগে। তখনই শুরু হয় সামর্থ অর্জনের বৈধ-অবৈধ প্রয়াস যা জন্ম দেয় নানা সামাজিক অপরাধের। ছেলেমেয়েদের মাঝে দেখা দেয়া অসংগতিপূর্ণ আচার-আচরণগুলো অভিভাবকরা চাইলে দরদমাখা সম্পর্ক দিয়ে দূর করে দিতে পারেন। একটু যত্ন-প্রয়াস আমাদের সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করতে পারে বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে।

সাত. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ঃ

উপরে যতগুলো কথাই আমরা বলেছি সেগুলো মুখরোচক, শ্রুতিমধুর কিন্তু বাস্তবে খুব কঠিন। যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে, যে সমাজের প্রতিটি সদস্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই, ধনী-নির্ধন সবাই সমান, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, অন্যায় যেখানে প্রত্যাখ্যাত, ন্যায় ও সুবিচার যেখানে নিশ্চিত, মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা যেখানে সরকারের মূখ্য দায়িত্ব, যেখানে অপবিত্রতা-অশ্লীলতার কোন স্থান নেই, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি ভালবাসা যেখানকার অনন্য বৈশিষ্ট্য, এমনি একটি দরদী (Caring) সমাজ কায়েম করতে পারলে যুব অবক্ষয় আপনা থেকেই রোধ হয়ে যাবে।

উপসংহার ঃ

যুবক মাত্রই শক্তি, সাহস, সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। আমাদের যুবক-যুবতীরাই আমাদের আগামীর প্রতিশ্রুতি। আমরা যে সুখী-সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হল আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন। তেল-গ্যাসসহ আমাদের যে খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডারের সম্ভাবনার কথা প্রায়শঃ শোনা যায় তার চাইতে বহুগুণ বেশী সম্পদ লুকায়িত রয়েছে যুব-সম্প্রদায়ের মাঝে অবক্ষয়ী সমাজের পাল্লায় পড়ে আজ এই যুবক-যুবতীরা সম্পদ না হয়ে আপদে পরিনত হতে যাচ্ছে। সময় এসেছে ওদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার। জাগতিক উপায়-উপকরণ ও যোগ্যতায় সমৃদ্ধ করার যে প্রয়াস ইউরোপ আমেরিকাসহ তথাকথিত উন্নত বিশ্ব তাদের যুব-সম্প্রদায়ের জন্য পাচ্ছে এগুলো থেকে কল্যাণকর দিকগুলো অবশ্যই আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু কেবল এতেই আমাদের চলবেনা। আমাদের যুব-সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি বাড়তি জিনিস নিশ্চিত করতে হবে আর তা হলো সুউন্নত নৈতিক চরিত্র, ঐশী বিধানের প্রতি আনুগত্য। কাজটি সরকার, বিরোধীদল, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবি, লেখক, কবি, সাহিত্যিক বা সমাজ কর্মী কারো একার নয়। সকলকে সমান ভাবে সমান গুরুত্ব দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই যুব সম্প্রদায়ের অবক্ষয় প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য।

লেখকঃ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর স্মৃতি কথা

বিজয়! সাহসী উপাখ্যান! দুঃখময় স্মৃতি! বেদনা! ব্যর্থতা! অক্ষমতা

-মজিবুর রহমান মন্‌জু

২৮ অক্টোবর কী বেদনার রংয়ে আঁকা ইতিহাসের পাশবিকতম হত্যাযজ্ঞের কোন নীল দর্পন!

জুলুমের সামনে জীবন দিয়ে বিজয়ের মশাল উচ্চ করে ধরার আবহমান ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি। নাকি সন্তোষ, বেদনা, ব্যর্থতা, অক্ষমতা সব কিছুর সমন্বয়ে এক বহুমাত্রিক জীবন অধ্যায়। মূলত : একেক জনের কাছে ২৮ অক্টোবর এর স্মৃতির রেখাপাত একেক ধরনের। শিক্ষা, ভবিষ্যত, নেতৃত্ব কোন চেতনায় দৃষ্টি রাখবো এ ঐতিহাসিক দিনটির দিকে ? অজস্র মানুষের আবেগ অনুভূতি ছুঁয়ে, সে দিনটির স্মৃতিলিপির সাথে একাত্ম হয়ে যারা বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাদের মধ্যে আমিও একজন । ফলে স্মৃতি রোমন্থন করে আবেগাপ্লুত বাক্য নির্মাণ কম হয়নি। ভাবছিলাম অন্য কোন দৃষ্টি দিয়ে ২৮ অক্টোবর কে দেখা যায় কিনা ? ২৮ অক্টোবর নিয়ে একজন শুভার্থী সংবাদ কর্মীর সাথে আলাপ হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে । তিনি কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরে বলেছিলেন, ২৮ অক্টোবর নিয়ে আত্মপর্যালোচনামূলক কিছু হয়েছে কি ?

প্রশ্ন করলাম, কেন? ২৮ অক্টোবর আমাদের অবস্থা ও অবস্থান কি ছিল । সার্বিক পরিস্থিতি আমরা যথার্থভাবে মোকাবেলা করতে পারছি কিনা। আমাদের সাফল্য-ব্যর্থতার দিকগুলো কি কি ? ইত্যাদি। এগুলোতো আভ্যন্তরীণ আলোচনা বা বিশ্লেষণের বিষয় । দায়িত্বশীলগণ তা যথাসময়ে নির্দিষ্ট ফোরামে যথাযথভাবে আলোচনা করেছেন। আমার জবাব শুনে তিনি মৃদু হাসলেন, কিছুটা আক্ষেপের সুরে বললেন, আমি আরও কয়েকজনের কাছে শুনেছি সেদিনের বিষয় নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা হয়েছে । কিন্তু কি আলোচনা হয়েছে তা কেউ বলতে পারলেন না। যারা সংশ্লিষ্ট এবং যাদের জানা প্রয়োজন তারা পর্যালোচনার বিষয় গুলো নিশ্চয় জানেন। আর এ জাতীয় বিষয় সবখানে প্রকাশ করতে হবে সেটা জরুরী নয়। তিনি আমার কথায় কিছুটা আহত হলেন বলে মনে হয়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুঢ় সুরে বললেন : বদর ওহুদসহ রাসূল (সঃ) এর নানান বীরত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি বিষয় কি আমাদের জানা প্রয়োজন? সেগুলো আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কি প্রকাশ করা জরুরী ছিল ? আমি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললাম, জ্বি ছিল । তাহলে আমরা যারা এ আন্দোলনের কর্মী বা সুহৃদ তাদের সবারই ২৮ অক্টোবর এর বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন । পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বদর, উহুদ, হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয় থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাসে বড় প্রত্যেকটি ঘটনা পর্যালোচনা বিশদভাবে করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে

www.pathagar.com

অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আপনারাতো বক্তব্য প্রদান কালে সেদিনের ঘটনাকে উহুদের সাথে তুলনা করে থাকেন। তার কথা শুনে আমি হেসে বললাম, বদর উহুদসহ রাসুল (সঃ) এর সংগ্রাম মুখর সীরাত গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য আবেগের মাইলফলক । আমরা আবেগ প্রবণ হয়ে আমাদের জীবনের সাথে সেগুলো মিলিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। আবেগের সব কথা বা বক্তব্যকে এত সিরিয়াসভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। তাহলে আপনার দৃষ্টিতে ২৮ অক্টোবর খুব সাধারণ একটি ঘটনা ! তার কথায় কিছুটা উত্তেজনা প্রকাশ পেল । না না আমি তা বলছি না। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ২৮ অক্টোবর নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহ-াসিক অধ্যায় । যদি তাই হয় তাহলে সেদিনকার পুরো বিষয়টি প্রত্যেক কর্মীর মনে এমনভাবে থাকা উচিত যাতে সাংগঠনিক জীবনে ছোট খাট সংঘাত মোকাবেলার ক্ষেত্রে এ শিক্ষা কে কাজে লাগাতে পারে । ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে পরস্পরের সমালোচনা বা নিজেদের সাহসী ভূমিকার জন্যে নয়, আত্মপ্রসাদের উদ্দেশ্যে নয় বরং ভবিষ্যতের জন্যে তা হতে পারে পথ নির্দেশক। তার কথা গুলো নতুন বা ভিন্ন ধারার কিছু না হলেও আমাকে অন্যরকম করে নতুনভাবে স্পর্শ করল । আন্দোলন কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা বহু নিবেদিত ভাইয়ের তীর্যক কথাকে সমালোচনা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সাংগঠনিক জীবনে এটা আমার অর্জিত শিক্ষা। ২৮ অক্টোবরের ব্যাপারে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে নিজেকে আজ আবারো একবার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে ইচ্ছে হলো ভীষণ ভাবে। আমি ইসলামী আন্দোলনের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই। একজন মধ্যম সারির কর্মী মাত্র। তথাপি ২৮ অক্টোবরে নিজের ভূমিকা নিয়ে শুরু হল আমার ভেতরকার এক প্রচন্ড অন্তর্দাহ ! অস্থির এক মর্মবেদনার কল্পলোকে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরে। আমি পৌঁছে গেলাম দেড়হাজার বছর পুরোনো উহুদ প্রান্তরে । সময়টি ৩য় হিজরীর ৫ই শাওয়াল । কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার অভিলাষে মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। মক্কায় অবস্থানকারী চাচা হযরত আব্বাস (রা) প্রেরিত গোপন দূত মারফত রাসুল (সঃ) পূর্বেই এই সম্ভাব্য আক্রমন সম্পর্কে সংবাদ পান। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে রাসুল (সঃ) একাধিক গুপ্তচর প্রেরণ করে কুরাইশের আগমন নিশ্চিত হন এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করেন। ১১ই শাওয়াল শুক্রবার সকালে রাসূল (সঃ) সাহাবীদের সাথে সম্ভাব্য আক্রমন মোকাবেলা প্রসঙ্গে মতামত ও পরামর্শ গ্রহন করেন। মদিনার অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে নাকি সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা হবে এ নিয়ে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। রাসূল (সঃ) মদিনা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ মোকাবেলার জন্যে মনস্থির করেন এবং তদানুযায়ী ১১ই শাওয়াল আছরের নামাযের পর ১০০০ সৈন্য নিয়ে উহুদের দিকে রওয়ানা হন। ওহুদের নিকটবর্তী হলে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে ৩০০ জন রণভঙ্গ দিয়ে মদিনায় ফিরে যায় । অবশিষ্ট মাত্র ৭০০ জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে রাসুল (সঃ) পরদিন অথ্যাৎ ১২ শাওয়াল ফযরের নামাজের পর কাফেরদের প্রতিহত করার ঘোষনা দেন। যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ কে মুসলমানদের ঘাঁটির পিছনে গিরিমুখে সার্বক্ষণিক সর্তক পাহারায় নিযুক্ত করেন । বাকী ৬৫০ জন নিয়ে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি তুলে কাফেরদের সর্বাত্মক মোকাবেলা করেন রাসুল (সঃ) । অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর তীব্র

www.pathagar.com

প্রতিরোধের মুখে কুরাইশ বাহিনী পিছু হটে পলায়ন করতে থাকে । মুসলমান যোদ্ধাগন কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করে এগিয়ে যান। যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত আর পাহারার প্রয়োজন নেই এ কথা ভেবে পিছনের ঘাঁটিতে নিযুক্ত ৫০ জন তীরন্দাজ তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নিষেধ অমান্য করে শত্রু তাড়ানোর কাজে নেমে পড়েন । আর এ সুযোগে তৎকালীন শত্রু পক্ষীয় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ তার ঝটিকা বাহিনী নিয়ে পেছন থেকে আক্রমন করে মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদুস্থ করে। ওহুদে রাসুল (স) মারাত্মক ভাবে আহত হন। তার শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণাধিক প্রিয় চাচা বীর হামজা সহ সর্বসাকুল্যে ৭০ জন বিখ্যাত নিষ্ঠাবান সাহাবীর শাহাদাত ও অপরিসীম রক্তদানের প্রোজ্জল ইতিহাস সীরাতে রাসূল (সঃ) এক নিদারুন মর্মবেদনা হয়ে রইল সারা জীবনের জন্যে । ওহুদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ২৮ অক্টোবরে আসা যাক । খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, ২৮ অক্টোবর ঘিরে পল্টনে আওয়ামী লীগের রণসাজ সম্পর্কে আমরা কি যথার্থ তথ্য পাইনি ? লগি বৈঠা নিয়ে তাদের দলীয় কর্মীদের পল্টনে সমবেত হওয়ার নির্দেশ তো গোপন কিছু ছিল না। গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে তা ফলাও করে প্রচারও করেছে। সকাল থেকে বিভিন্ন থানা ও অঞ্চল থেকে তাদের প্রস্তুতির নানান তথ্য ও একটি অশুভ পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। তার মোকাবেলায় আমি কিংবা আমরা কি কার্যকর সঠিক পন্থা গ্রহণ করেছিলাম ? মনে পড়ে, সে ঐতিহাসিক দিনে শাখাগুলোর প্রতি আমাদের নির্দেশনা ছিল থানা ও ওয়ার্ড থেকে বাসযোগে অথবা পদব্রজে মিছিল করে বায়তুল মোকারম উত্তর গেইটে আসার জন্যে। স্বাভাবিক সময়ে রাজনৈতিক সমাবেশে আসার জন্যে যে রকম নির্দেশিকা থাকা দরকার ঠিক সেরকমই। থানাগুলো থেকে যখন কর্মীরা আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ততক্ষনে আমাদের সমাবেশ স্থলে শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র হামলা । নিজেদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাওয়াতো দূরের কথা হামলার খবর পেয়ে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই আমাদের ভাইয়েরা যে যেভাবে পেরেছে প্রথমে তাদের আক্রমন প্রতিহত করতে ছুটে গিয়েছে। সামান্য কঞ্চি বা পাথরের কোন সংগ্রহ ছিল না। আক্রমণকারীদের নিক্ষিপ্ত ইট পাথর কুড়িয়ে তা দিয়ে সেদিন প্রতিরোধ করা হয়েছে। কোন পাশে কে থাকবে, কোন দিকে অবস্থান নিয়ে সন্ত্রাসীদের কৌশলগতভাবে প্রতিরোধ করা যাবে কোন কিছু চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। অফিস ও মঞ্চের কাছ থেকে সেদিন যিনি পল্টন মোড়ের দিকে জীবন বাজী রেখে এগিয়ে গেছেন কিছুক্ষন পর দেখা গেল তিনিই রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসছেন । খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সকল কর্মী ভাইয়েরা মহানগর অফিসে আসতে চেয়েছিলেন তারাও অনেক নির্দয়ভাবে পথিমধ্যে আক্রান্ত হন। ওহুদে রাসুল (স) গিরিপথ পাহারায় বিশেষ তীরন্দাজ বাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন, সে বাহিনী যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে অটল থাকতো তাহলে ওহুদের ইতিহাস হতো ভিন্ন। কিন্তু সেদিন নোয়াখালী হোটেলের সম্মুখ সড়ক, হোটেল কস্তুরি সংযোগ পথ, দৈনিক বাংলার মোড় সবগুলোর প্রবেশ পথেই ছিল লগি বৈঠাধারীদের নিয়ন্ত্রনে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও প্রবেশ পথ গুলোতে তেমন কোন অবস্থান বা পদক্ষেপের কথা আমরা ভাবিইনি । সবচাইতে মর্মযাতনার বিষয় হল, আহত রক্তাক্ত ভাইদের কাতর আহাজারি। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কাউকে আমরা হাসপাতালেও নিয়ে যেতে পারিনি। পরিস্থিতি মোকাবিলার সেদিনকার প্রস্তুতিগত দুর্বলতার কথা ভাবতে গিয়ে আজ সত্যিই নিজেকে ক্ষমাহীন অপরাধী মনে হয়। সংখ্যায় অল্প হলেও সেদিন বাতিলের অমানবিক হিংস্রতার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পল্টনে অবস্থানকারী আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা ।

www.pathagar.com

ক্ষত-বিক্ষত কারো বুক, কারো মাথা, ছোপ ছোপ রক্তের ধারায় সবার শরীর। এ যেন জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া একদল সংশপ্তক সৈনিকের জীবন উৎসর্গের প্রাণপণ লড়াই। রক্তাক্ত গাজী ও জিন্দাদিল শহীদ ভাইদের সেদিনকার অপরিসীম ত্যাগের মহিমা ঢেকে দিয়েছে আমাদের সকল ব্যর্থতা। আমাদের পাহাড়সম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাতিলের উন্মুক্ত লেলিহান থাবা আছড়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে আমাদের মজলুম ভাইদের সাহসের কাছে। আজো প্রিয় ভাই মাসুম, শিপন ও জসিম উদ্দিনের উপর সে নির্মমতার দৃশ্য দেখলে মনে হয় সে আঘাতগুলো খান খান করে দিচ্ছে আমার অন্তরাত্মা। আমাদের প্রিয় ভাইদের জন্যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। মানবরূপী হিংস্র হায়েনাদের হাতে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তারা আমাদের শিরকে উচ্চ করে গেল চিরদিনের জন্যে। তাই শত সহস্র ব্যর্থতার গ্লানি সত্ত্বেও ২৮ অক্টোবর অনির্বাণ ইতিহাসে আমাদের বিজয়ের শাণিত মিনার হয়ে থাকবে চিরকাল। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা, অসর্তকতা, সরল সহজ ভাবে এত বড় ঘটনার মোকাবেলা করতে যাওয়া যে অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্ত তার কী কোন উপলব্ধি আমাদের তাড়িয়ে নিবে না। ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণে আমরা কি জবাব দেব আগামীর অনুসন্ধিৎসু প্রজন্মকে ! হয়তো কেউ সেভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে না প্রশ্নের তীব্রতা নিয়ে। ক্ষমার বিশালতায় পার পেয়ে যাব মানব চক্ষুর কাছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন এ শিক্ষা থেকে আমাদের শুধরে দেয় চিরতরে। আজ একান্তভাবে এই কামনাবোধ বাক্য প্রার্থনা।

লেখক

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

> "উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে জাগিয়েছে স্বপ্ন ভাসা তীর, তাওহীদি বন্দরে আজ লাখো নাবিকের ভীড়।"

www.pathagar.com

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষাঃ যারা হয়েছিলেন নিখাদ

ডা. মোঃ ফখরুদ্দিন মানিক

সত্য-মিথ্যা বা হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। দ্বন্দ্ব শুধু আজকে নয়, বরং মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে এই সংঘাত শুরু হয়েছে। এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্য সবসময় বিজয় লাভ করেছে। যুক্তি, বুদ্ধির বিবেচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা সাময়িক জয় লাভ করলেও তা কখনও চিরস্থায়ী হয়নি। সত্য একটি কালজয়ী আদর্শ। বুদ্ধি ও জ্ঞান আর যুক্তি এবং ক্ষমতার বলে কেউ কেউ এই সত্যকে ছাপিয়ে রাখতে চাইলেও সময়ের ব্যবধানে সত্যের মশাল এমনভাবে প্রজ্বলিত হয়েছে যার তেজোদ্দীপ্ত আলোকরশ্মি মিথ্যাকে পরাজিত করেনি বরং শক্তি এবং ক্ষমতার অহঙ্কারে নিমজ্জিত এই মিথ্যার ফানুসগুলো চরম পরিণতি বরণ করে বর্তমান এবং অনাগত পৃথিবীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে। এটি শুধু তাত্ত্বিক কোনো কথা নয়, শত কোটি বছরের এই পৃথিবী ইতোমধ্যে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক অথবা তাত্ত্বিক কোনো বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই বিশ্বাসীদের পৃথিবীর স্থিতি, স্থায়িত্ব, ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি যে মহান সত্তার হাতে সেই মহান রাব্বুল আলামিন শাশ্বত সেই বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এই কথা অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন, ''সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" (আল কুরআন)

ইসলাম হচ্ছে বড় সত্য, সবচাইতে বড় বাস্তবতা, সবচাইতে বৈজ্ঞানিক এবং সময় উপযোগী একটি জীবনব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে ইসলাম অন্য সকল ধর্মের মতো অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্মের নাম নয়, এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

যুগে যুগে যারা এই ইসলামকে ধারণ করেছে তাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে এক বন্ধুর অমসৃণ কন্টকাকীর্ণ পথ, অতিক্রম করতে হয়েছে লোনা দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গমালা, মরু সাহারার ভয়ঙ্কর সাইমুমের সামনে থাকতে হয়েছে অবিচল। প্রমাণিত হতে হয়েছে অগ্নিপরীক্ষায় নিখাদ। মূলত ইসলামকে ধারণ করলে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য যখনই ঈমানদার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছে তখনই বাতিলপন্থী তথা ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে তাকে বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপপ্রচার, নির্যাতন, হত্যা, ষড়যন্ত্রসহ সবগুলো কৌশলকে অবলম্বন করেছে ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করে দেয়ার জন্য কিন্তু সত্যের এই মশালধারীরা ত্যাগ-কুরবানির এক উজ্জ্বল নমুনা প্রদর্শন করেছে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তারা যেমন মাথা নত করেনি তেমনি ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় কোনো ধরনের উগ্রতা বা কোনো ধরনের হঠকারিতা প্রদর্শন করেনি। মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা কি মনে করেছ এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর তা নেমে আসেনি।" তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল,

www.pathagar.com

এমনকি সেই সময়ে নবী-রাসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে, তখন তাদেরকে এই বলে সান্তনা দেয়া হয়েছিল– অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।'

আল্লাহর সেই প্রদত্ত সাহায্যের ওয়াদার জন্য অপেক্ষা করেছিল। এই পৃথিবীর সেরা মানুষ হচ্ছেন নবী এবং রাসূলগণ। যারা সত্যের মাপকাঠি এবং ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই সেরা মানুষদেরকে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আ)-কে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল নমরুদের অগ্নিকুন্ডে, হযরত ঈসা (আ) কে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অসীম কুদরতে তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন।

করাত দিয়ে চিরে দ্বিখন্ডিত হতে হয়েছিল হযরত জাকারিয়া (আঃ) কে। ইহুদিদের রাজা হিরোডিয়াস হযরত ইয়াহিয়ার (আ) শিরচ্ছেদ করে উপহার দিয়েছিলেন তার প্রেমিকাকে। হযরত মূসা (আ)-কে পড়তে হয়েছিল ফেরাউনের তৈরি করা অনেক ষড়যন্ত্রে। আর সকল নবী-রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল (সা) কেও অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অপপ্রচার, মিথ্যাচার, নির্যাতন, অবরোধ, জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার এবং শেষ পর্যন্ত তারা রাসূল (সা)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথচ তিনি তাদের কাছে ছোটবেলা থেকে আল আমিন, আস সাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নবুওয়তের পূর্বেও অজ্ঞতা বা নিজের অজান্তে মক্কার প্রচলিত জাহেলিয়াতের কোনো একটি রাসূল (সা) কে স্পর্শ করতে পারেনি। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো, ''হে কম্বলাবৃতকারী, জেগে ওঠো, সাবধান কর, তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।'' (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৪)

রাসূল (সা) তখন মক্কার চিরাচরিত নিয়মানুসারে যখন সকল অধিবাসীকে এই বলে আহ্বান করলেন, ইয়া সাবাহা, ইয়া সাবাহা, এই আওয়াজ শুনার সাথে সাথে সবাই একত্রিত হলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে, তারা জবাব দিয়েছিল অবশ্যই কারণ আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী বলে জানি। ঠিক তার পরই রাসূল (সা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন' বল আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।'

রাসূল (সা)-এর এই বক্তব্য শুনার সাথে সাথে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। পাগল, জাদুকর, কবি বলে রাসূল (সা) কে বিদ্রুপ বানে জর্জরিত করলো। অথচ রাসূল (সা) ছিলেন এই সকল আচরণ থেকে পূতপবিত্র। মক্কাবাসীদের এহেন আচরণে রাসূল (সা) কিছুটা বিব্রত হলেও তিনি হতাশ হয়ে যাননি। ধৈর্য ও সহনশীলতা নিয়ে মক্কার সকল মানুষের দুয়ারে দুয়ারে কড়া নেড়ে তাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানাতে থাকলেন। মানুষের চিন্তা ও বিবেকের দুয়ারে আঘাত করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন, ভেঙে দিলেন আরব-অনারবের বিভেদের দেয়াল, প্রবাহিত করলেন ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের স্রোতধারা, যার সম্পর্কে ফিলিপ ফেরি হিট্টি প্রণীত দ্যা হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেন, এক খোঁচায় আরবীয় সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি অর্থাৎ উপজাতীয় আত্মীয়তা ধর্মবিশ্বাসের নতুন বন্ধন দ্বারা পরিবর্তিত হলো। অর্থাৎ আরবের সমস্ত

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য এক ধরনের যুদ্ধবিরোধী আদেশ বলবৎ হলো। এই নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের কোনো যাজকবর্গ, যাজকতন্ত্র প্রধান বিশপের এলাকা কিছুই রইল না। মসজিদই ছিল এই সম্প্রদায়ের সমাবেশস্থল, সামরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্র ও সকল মানুষের আরাধনার স্থান।

প্রার্থনার পরিচালক অর্থাৎ ইমাম ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীদের সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং এই ধর্মবিশ্ববাসীদের প্রত্যেকেই গোটা বিশ্বের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একে অপরকে রক্ষা করার নির্দেশ পেয়েছিল। মহিলা ছাড়া আর যে দু'টি জিনিস আরবীয়দের কাছে প্রিয় ছিল মদ ও জুয়া, তা হারাম করা হল।

নবুওয়াতি ফলগুধারায় ইসলাম পূর্ব আরব এবং ইসলাম পরবর্তী আরবে সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা বুঝা যায় আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের নেতা জাফর ইবনে আবু তালিবের নাজ্জাশীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে। জাফর (রা) বলেন, 'আমরা ছিলাম জাহেলি যুগের মানুষ, মূর্তিপূজা করতাম ও মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতাম। অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিলাম, পরিবারকে ত্যাগ করে আমরা তাদের রক্ষা করার মৌখিক চুক্তি লঙ্ঘন করতাম। আমাদের মধ্যে যে সবল সে দুর্বলকে গ্রাস করতো। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে থেকেই একজনকে তার দূত করে আমাদের কাছে পাঠালেন ততক্ষণ আমাদের অবস্থা ছিল এ রকম। সেই দূতের পূর্ব পুরুষদের আমরা জানি এবং তার সত্যপরায়ণতা, সততা ও পবিত্রতা আমরা স্বীকার করি। তিনিই আল্লাহকে মান্য করা, তার আরাধনা করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানান। আল্লাহর পরিবর্তে আমরা যে সকল পাথর ও মূর্তিপূজা করি তা পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি আমাদের অবিবাহিত অবস্থায় যৌন সহবাস করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, অনাথ শিশুকে অধিকার বঞ্চিত করতে, সতী নারী সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি কেবল আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নামাজ পড়তে, জাকাত দিতে ও রোজা রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

রাসূল (সা)-এর এই নেতৃত্বে ইসলামী ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গোটা আরবের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিরাট অংশকে প্রভাবিত করে।

রাসূলের ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনে সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন একটি জাতির উদ্ভব ঘটান, যারা কখনো ঐক্যবদ্ধ ছিলো না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেন যা আগে শুধু একটি ভৌগোলিক সীমানাকেই বুঝাতো কিন্তু তার জাতীয় চরিত্র বলতে কিছুই ছিল না। রক্তের বদলে রক্ত ছিল আরবের আদিম আইন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বনু জর ও বনু তাগলিব গোষ্ঠীর মধ্যে রামুস যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ৪০ বছর। সেই বর্বতার মূলোৎপাটন করে বালাদুল আমিন ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। আর সেজন্য রাসূল (সা) কে তার জীবদ্দশায় আহত, রক্তাক্ত, দান্দান মোবারকের শাহাদাত, প্রায় ৩ বছরের শিয়াবে আবু তালিবে অবরোধ, পাথর বৃষ্টিতে জর্জরিত হওয়া ছাড়াও তার জীবদ্দশায় ছোট বড় ২৭টি যুদ্ধের নেতৃত্বসহ প্রায় ৮৩ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। সাহাবীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় শিহাবে আবু তালিবে কষ্টকর দিনগুলোর কথা।

www.pathagar.com

খাবার আর পানীয়ের অভাবে গাছের ছাল এবং পাতা খেতে খেতে তাদের মুখ এবং গলাতে ঘা হয়ে যায়। খাবারের অভাবে ঘরের উপরে ছাদে দেয়া উটের শুকনো চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। দুগ্ধপোষ্য অনেক শিশু দুধের অভাবে মারা যায়।

এত কঠিন নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন, "আলিফ লাম মিম, লোকেরা কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললে ছেড়ে দেয়া হবে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।" (সূরা আন কাবুত : ১-৩)

ঈমানের এই অগ্নিপরীক্ষার চিত্র ফুটে ওঠে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা)-এর জীবনী থেকে। খাব্বাব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি ছিলেন উম্মে আনসার নামক এক মহিলার ক্রীতদাস। তিনি কয়লার মধ্যে লোহা গলিয়ে ঢাল, তলোয়ার ও বর্শা তৈরির কাজ করতেন।

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তার মনিব এবং উম্মে আনসারের ভাইয়েরা তাকে অকথ্য নির্যাতন করতো। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুয়ে রেখে পাথর চাপা দিতো।

আর তার শরীরের রক্ত মাংসগুলো গলে গলে কয়লা ঠান্ডা হয়ে যেত, কয়লার আগুনে ঝলসে গিয়ে তার শরীরে এমন গর্ত হয়েছিল যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই গর্তগুলো পূরণ হয়নি। সেই জন্য তিনি সব সময় গায়ের ওপর চাদর জড়িয়ে রাখতেন। চাদরের ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সেই পিঠ দেখানো ছাড়া দুনিয়ার কোনো মানুষকে দেখাবো না। এত নির্মমতার মধ্যেও তিনি ঈমান থেকে দূরে সরে যাননি। সেই ধারাবাহিকতায় নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও জুলুম এখনো সত্যের পতাকাধারীদের ওপর অব্যাহত রয়েছে। এর চাইতেও নির্মমতার কথা স্মরণ করে দিয়ে রাসূল (সা) সাহাবীদের সতর্ক করে দেন। হযরত খাব্বাব (রা)-এর বর্ণনা থেকে একটি হাদিসে রাসূল (সা)-এর বক্তব্য ছিল এ রকম : রাসূল (সা) একবার কাবাঘরের ছায়ায় বসে আছেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে খাব্বাব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। এ কথা শুনে তার চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনগণ এর চেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে, তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তাতে বসিয়ে মাথার ওপর করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হতো, কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে লোহার চিরুনি দ্বারা হাড্ডি-মাংসগুলোকে আলাদা করা হতো যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে নেয়।

এই জুলুম নির্যাতন ঈমানদারদের জন্য নতুন নয়। অতীতে যারাই ঈমানের দাবি করেছে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর এই পরীক্ষা হচ্ছে আমরা ঈমানের দাবিতে কতটুকু সত্যবাদী তা যাচাই করার জন্য। ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই তো আল্লাহ বলেন, "আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং ধৈর্যশীল।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি পেছনের রাজনীতি

অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বাবু

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের রাজনীতিতে যে বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে তার নেপথ্যে রয়েছেন বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা। বেশ কিছুকাল থেকেই সেই বামরা ভর করেছে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে। সে জন্য দলটি এর আগে বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে রাজনীতি করলেও ক্ষমতায় যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে যুদ্ধাপরাধের বিচারের মতো মীমাংসিত বিষয়কে আগে কখনো ইস্যু করেনি। কারণ আওয়ামী লীগের নেতারা জানতেন, বিষয়টি তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩০ মে সাধারণ ক্ষমা (General amnesty) ঘোষণার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। এ নিয়ে রাজনীতি করলে লোকে হাসাহাসি করবে। সেই হাসাহাসির কাজটি শেষ পর্যন্ত বামপন্থীদের উসকানিতে করছে আওয়ামী লীগ। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা, আওয়ামী লীগের এই দাবির মধ্যে আদৌ কোনো সৎ উদ্দেশ্য নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক ভন্ডামি ও প্রতিহিংসা। এই পুরনো মীমাংসিত বিষয়কে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসে এই দেশকে তাদের মিত্র শক্তিদের কাছে বিক্রি করার পাঁয়তারা করছে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সমস্ত বামপন্থী স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'দুই কুকুরের কামড়া কামড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তারাই আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষকের ভান করছেন। কারণ একটিই, তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছে। তাই নিজের দলীয় প্রতীক বিসর্জন দিয়ে নৌকাকে ধরে নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছে।

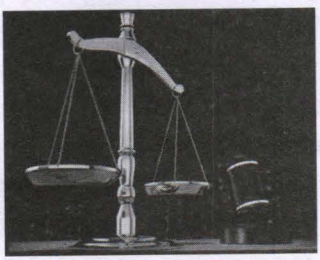

যুদ্ধাপরাধ অবশ্যই জঘন্য অপরাধ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানেই যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেখানেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। সেটা হয়েছে যুদ্ধের পরপরই, যেমন- জার্মানির নুরেমবার্গ ট্রায়াল। তার অব্যবহিত পরে জাপানের সামরিক আদালতে স্ব স্ব দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদাহরণ দেয়া যায়। সাম্প্রতিককালে বসনিয়ার গণহত্যার জন্য যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবাধান মিলোসভিচের যুদ্ধাপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালে হয়েছে। এখন চলছে আরেক সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচের বিচার। রুয়ান্ডার গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার চলছে। আমাদের দেশে বেশ কিছু দলীয় বুদ্ধিজীবী, তারা পেশাগত দায়িত্ব কতটুকু পালন করেন

www.pathagar.com

জানি না তবে ইতিহাসবহির্ভূত বিবৃতি দিয়ে শুধু নয়, টক শোতেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও উসকে দেবার কাজটি বেশ দক্ষতার সাথেই করছেন। যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে কথায় কথায় তারা জার্মানির নুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা তুলে ধরেন। অথচ তারা ভুলে যান এর পিঠেও কথা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম পরাজিত শক্তি জার্মানির নাৎসী নেতাদের বিচারের জন্য যে আট সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল তার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার দু'জন সদস্য ছিলেন। এরা হলেন মেজর জেনারেল আইটি নিকেৎচেক্কো এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ ভলকাচ। নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদরা বলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী (রেড আর্মি) জার্মান সাধারণ নাগরিকদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার ও মহিলাদের বলাৎকার করেছিল, তার জন্য আরেক নুরেমবার্গ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটি হয়নি। জাপানের সাধারণ নাগরিকদের ওপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিরুদ্ধে সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ এই সমস্ত বিচার কিছুটা হলেও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আমাদের দেশের বিষয়টিও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও মিডিয়া মোটামুটিভাবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। এদের অনেকেই রাজনীতি তাড়িত ব্যক্তি। পরমতসহিষ্ণুতা নেই বললেই চলে। এরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে। অথচ তাদের দল যখন একজন স্বৈরাচারের সঙ্গে ক্ষমতায় যাবার জন্য আঁতাত করে তখন তারা সেটাকে নীরবে হজম করে। তারা এমনকি এটাও ভুলে যাওয়ার ভান করে যে সেই স্বৈরাচারী ব্যক্তিটির অন্যতম অবদান হলো ইসলামকে একমাত্র রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এবারের নির্বাচনে তার অন্যতম অঙ্গীকার ব্লাসফেমি আইন করা। অথচ জামায়াতে ইসলামী যখন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্লাসফেমি আইনের কথা বলে তখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই একদেশদর্শিতা ও দ্বিচারিতা অবশ্য এদের স্বভাব। আসলে এদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশপ্রেমিক ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে চাপের মুখে রেখে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি দিয়ে দেশকে তাঁবেদার বানানো, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়া।

যাই হোক, এবার আসল বিষয়ে আসা যাক। স্বাধীনতার ৪১ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি কতটা যৌক্তিক? আন্তর্জাতিক আইনে এই বিচার এখনো সম্ভবপর কি না? দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি অতীতে মীমাংসা হয়ে গেছে আবার সেই বিচার করা কতখানি আইন সঙ্গত? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তির অনেক আগেই জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইরত দেশগুলো যাদের আমরা মিত্রশক্তি বলি, তারা একমত হয়েছিল এই ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনাকারীদের বিচার করতে। এই বিষয়ে যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ৩০ মে ১৯৪৫ লন্ডনের রাজকীয় ন্যায় আদালতে হাউসটেড সেশনস ওয়ার কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড রাইটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে একটি নতুন চুক্তিনামা হয়। ৭ আগস্ট ১৯৪৫ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তীকালে জার্মানি ও জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়। তবে এই বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে বিজয়ী পক্ষের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে ঐকমত্য ছিল যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দন্ড প্রদান করতে হবে। আর তথ্য প্রমাণের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া হয়।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সরকার ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় এই বিচারটা কিভাবে হবে তারও দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। যেমন- The trial shall be held in Dacca (Now Dhaka) before a Special Tribunal consisiting of Judge having status of Justice of the Supreme Court. এই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জন্য তখনকার আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলমাকে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয়া হয় অথচ আদালত গঠন করা হয়নি। কেন করা হয়নি সেটা গবেষণার বিষয়। সম্ভবত এ ব্যাপারে স্বয়ং শেখ মুজিবের আগ্রহ ছিল না কারণ তিনি হয়তো Forget And Forget The Past নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এর উত্তর আরো ভালোভাবে দিয়েছেন ভারতের বিখ্যাত রাজনৈতিক লেখক ও কূটনীতিক জেএন দীক্ষত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার বিখ্যাত Liberation And Beyond গ্রন্থে বলেছেন : স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান জুন মাসেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পিএস হাকসারের কাছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে অনাগ্রহ দেখান। কারণ তিনি জানতেন সাম্রাজ্যবাদী ভারতের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের সহযোগিতা দরকার। ভারত যে নতুন বাংলাদেশের জন্য কাল হয়ে উঠবে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

নুরেমবার্গ বিচারের আগে জার্মান বাহিনী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সেই কারণে মিত্রশক্তি তাদের ঘোষিত চুক্তি অনুযায়ী আদালত গঠন করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ঘটলো তার ব্যতিক্রম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে করলো মিত্র বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল অরোরার কাছে এবং আত্মসমর্পণকৃত ৯৫ হাজার পাকিস্তানি সেনা গিয়ে পড়লো ভারতের হাতে। ভারত সিমলা চুক্তির আগে থেকেই পাকিস্তানকে বারবার আশ্বাস দিয়ে আসছিল বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা হবে না। কারণ পেশাদার ভারতীয় সেনাবাহিনী এ রকম বিচারের ঘোর বিরোধী ছিল। যেসব সেক্টর কমান্ডার আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ধুয়া তুলছেন তারা সবাই সেদিন ছিলেন ক্ষমতার ভাগীদার। সেই সময় তারা কোথায় ছিলেন? তখন কেন তারা প্রতিবাদী হলেন না? আজকে মুক্তিযুদ্ধে মহান সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল বেঁচে থাকলে তার কাছ থেকে অনেক তথ্য জানা যেত। মুল কথা হলো আওয়ামী লীগ এই বিচার প্রক্রিয়ার কোনো কিছুই শুরু করতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশ ততদিনে পুরোপুরি ভারতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমার ব্যাপারে বাংলাদেশের জনসাধারণের কোনো মতামত না নিয়েই ভারত-পাকিস্তানের সাথে ত্রিদেশীয় চুক্তি করল। সেই সময় মওলানা ভাসানীর ন্যাপ এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেছিল।

আন্তর্জাতিক আইন বলে, যদি মূল আসামিদের বিচার না হয় তাহলে তার সহযোগীদের বিচার না করাই ভালো। মূল যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনাকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়ার পর তাদের সহযোগীদের বিচার করতে চাওয়ার নৈতিক অধিকার থাকে না। এই ১৯৫ জনকে যদি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত তাহলে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত

www.pathagar.com

সহযোগীদের নাম, পরিচয় ও কর্মকান্ড জানা যেত। আর আইনের কথা হলো কেবল দলীয় সদস্য থাকলেই যুদ্ধাপরাধ হয় না। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকতে হয়। অস্ট্রিয়ার অধিবাসী জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ড হেইম ও বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কথা সাহিত্যিক গুন্টারগ্রাস নাৎসী বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তাই বলে তার জন্য তারা বিচারের মুখোমুখি হননি।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জার্মানির নুরেমবার্গ বিচারের সময় ২০ গাড়ি ভর্তি দলিলপত্র, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়া থেকে ও ৩ হাজার দলিল বাছাই করা হয়েছিল। এগুলো সবই ছিল প্রমাণিত। এমনকি আসামিদের স্বীকারোক্তিও ছিল। বাংলাদেশে কতজন রাজাকার আলবদর ছিল কেউ বলতে পারবে না। সেক্টর কমান্ডাররাও সে সংখ্যা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব মাত্র একবার ছাড়া কোনো সময় যুদ্ধাপরাধের বিচারের কথা বলেননি। কেবল মাত্র ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় বিজয় দিবসেই তিনি দেশের কারাগারগুলো থেকে ৩০ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেন। এদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না। মিডিয়ার অনেক টক শোতে শুনেছি আওয়ামী লীগপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবী দাবি করেন, দালাল আইন এখনো কার্যকর আছে। কিন্তু দালাল আইন আর যুদ্ধাপরাধের আইন এক নয়। বহু লোককে দালাল আইনে আটক রাখা হলেও আদালতে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এটা লক্ষ্য করে দালাল আইন রহিত করেন। এটা তার দূরদর্শিতার পরিচয়। অথচ আওয়ামী লীগ কথায় কথায় শহীদ রাষ্ট্রপতিকে দায়ী করে বলেন, তিনিই নাকি যুদ্ধাপরাধীদের পূণর্বাসিত করেছেন। বরং তার উল্টোটাই সত্য। তিনি বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাই সেক্টর কমান্ডারদের কাছে বিনীত প্রশ্ন–

১. শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে এই সমস্ত যুদ্ধাপরাধীর বিচার করলেন না কেন?

২. আওয়ামী লীগ যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য গোলাম আযমের আশীর্বাদ ও পদধূলি নিয়েছিলেন তখন কি গোলাম আযম যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না?

৩. বিচারপতি নূরুল ইসলামকে আওয়ামী লীগ যেদিন মনোনয়ন দিয়েছিল সেদিন শেখ হাসিনা কি জানতেন না স্বাধীনতা যুদ্ধে তার কী ভূমিকা ছিল?

আসলে তারা সবই জানেন ও বোঝেন। কেবল রাজনৈতিক কুমতলবে জাতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য এরা আজ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এক্ষেত্রে আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশের ভূমিকাও অত্যন্ত আপত্তিকর। তারা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে আমাদের দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেছেন। একেই বলে ভূতের মুখে রাম রাম। কারণ, ১৯৭৪ সালে ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের যে ত্রিদেশী চুক্তিবলে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও ৯৫ হাজার সৈন্যকে ছেড়ে দেয়া হয়, তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি এবং সেই চুক্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনিই স্বাক্ষর করেছিলেন।

সেই চুক্তিতে বলা হয়েছে : 'The foreign minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to go proceed with the trials as an act of clemency. It was

www.pathagar.com

agreed that the 195 war prisoners may repatriated to Pakistan along with other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement.' ধরে নিতে হবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই বিষয়টিকে মীমাংসা করার জন্যই এই চুক্তি করেছিল। যুদ্ধাপরাধের বিচার সেদিনই শেষ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সাংবিধানিকভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করার অধিকারী ছিল না। বিষয়টি নির্ধারণ করার ক্ষমতা ছিল বাংলাদেশের তৎকালীন সংসদের। আজকে কেন সেক্টর কমান্ডাররা এর জন্য ড. কামাল হোসেন বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের হর্তাকর্তাদের বিচার দাবি করছেন না? তিনি বা তারা তো আইন বিরোধী বলে এই চুক্তির বিরোধিতা করতে পারতেন, করেননি। এখন আবার তিনিই তাদের বিচার চাইছেন। জার্মান এক রণপন্ডিত যুদ্ধ দেখে বলেছিলেন : অপর কোনো পন্থায় রাজনীতি পরিচালনার নামই যুদ্ধ। ভয় হয়, সেক্টর কমান্ডারদের এই গভীর ষড়যন্ত্র দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে কিনা। ফলত বাংলাদেশ এক অকার্যকর রাষ্ট্র, বিদেশে এই প্রচারণা করা সহজসাধ্য হবে। যারা ট্রানজিট ও গ্যাস পাবার প্রত্যাশায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছেন তাদের হবে পোয়া বারো।

> আমাদের দেশের একশ্রেণীর পত্রপত্রিকা (মূলত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত) জামায়াতে ইসলামীকে নগ্নতার চরমপর্যায়ে এগিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ তারা ভুলে যান আমাদের সংবিধান কোনো সময় ধর্মভিত্তিক দলকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করার জন্য হুকুম করেনি।

পরিশিষ্টঃ

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি একটি মহলের নগ্ন রাজনীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এই আন্দোলন করেছিল। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ১৭টি আসনে জয়লাভ করে এবং বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন করে। তখন তারা চুপ হয়ে যায়। কারণ আওয়ামী লীগ সত্যিকারভাবে ঐ কমিটিকে আর সহযোগিতা করেনি। এই সত্য প্রকাশ করেছেন খোদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইনের এক স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে জানা যায়, জামায়াতে ইসলামীর পরলোকগত নেতা আব্বাস আলী খান বলেছেন : সাইয়েদ কামরুল আহসান ও আমি একত্রে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলাম (১৯৬২-৬৫)। আমরা উভয়ে একমত ও ধ্যান ধারণার প্রবক্তা ছিলাম। বাংলাদেশ হওয়ার পর কলাবরেটর আইনে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। তখন তিনি আমার আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টে রিট

www.pathagar.com

পিটিশন দায়ের করেন। পিটিশনটি গৃহীত হয়, ফলে কিছুদিন পর আমি মুক্তিলাভ করি। সুতরাং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এই ব্যক্তিকে আবার আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা যাবে কি?

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা কেবলমাত্র একটি পক্ষের দ্বারা সংঘটিত হয় না। হিংসা-প্রতিহিংসার মাধ্যমে এই অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত নিরপেক্ষ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। আমরা বরাবর আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের লেখা রাজনীতি প্রভাবিত পক্ষপাতমূলক বক্তব্যই জানতে পারি। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন তার একটি লেখায় বলেছেন : For over a week before Yahya Khan arrived for the negotiations that preceded the crackdown, men living in the cantonment and their families were denied to access to fresh food, vegetables, fish, meat and milk. The slogan heard of Awamin Leaguers lips we shall starve them to surrender by denying them food and drinks, if this was not act of war, one will need to redefine the term. It is in every sense comparable to the blockade of Britain by Germany and vice versa in the second world war (Bangladesh and Pakistan, the present and the future, a personal statement. (সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা; মেসবাহউদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৩)।

১৯৭২ সালে ৯-১০ ডিসেম্বর সন্তোষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যে সম্মেলন হয় সেখানে মুজিব সরকারকে যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল এই বলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবার কোন এখতিয়ার বাংলাদেশ জনগণ সরকারকে দেয় নাই?

আমাদের দেশের একশ্রেণীর পত্রপত্রিকা (মূলত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত) জামায়াতে ইসলামীকে নগ্নতার চরম পর্যায়ে এগিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ তারা ভুলে যান আমাদের সংবিধান কোনো সময় ধর্মভিত্তিক দলকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করার জন্য হুকুম করেনি।

এই জন্য তারা বারবার ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। অথচ লক্ষণীয় এ সংবিধান চরমভাবে পরিবর্তিত হলো শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারা বাকশাল গঠনের মাধ্যমে। এর জন্য কোন সময় তাদের মুখে শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা কিংবা বিরূপ মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমান আওয়ামী লীগ যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার নাটক করছে তার আর একটি উদাহরণ হলো ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের পর মার্শাল ল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আগের অনেকগুলো আইন বাতিল করা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলো বাতিলের বিরুদ্ধে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কেউই হাইকোর্টে কোনো ধরনের রিট পিটিশন দাখিল করেননি। এগুলো হলো যথাক্রমে :

ক. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করা হয়। অর্ডিন্যান্স নং ৬৩, সাল ১৯৭৫।

খ. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর Second Proclamation Order No-3 of 1976 জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি তুলে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই অর্ডিন্যান্সের বলে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হয়। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ও মুসলিম লীগ রাজনীতি করার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

অথচ লক্ষণীয় এদের অনেক নেতাই সেই সময় দেশে অবস্থান করছিলেন, কেউ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এদের বিচার দাবি করেননি। খান এ. সবুর পাকিস্তানপন্থী ছিলেন কিন্তু তাই বলে দেশপ্রেমিক ছিলেন না এ কথা কেউ বলে না। এমনকি অনেকে সংসদ সদস্যও ছিলেন।

গ. Second Proclamation জারি করে সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ কথিত দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই প্রজ্ঞাপন জারির পর অনেকেই নাগরিকত্ব ফিরে পান।

ঘ. Proclamation Order No-1 of 1977 দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ তুলে দেয়া হয়। এই প্রজ্ঞাপনগুলো এখনো বহাল আছে। অথচ আওয়ামী লীগ আগের টার্মে ক্ষমতায় থাকাকালে কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না মর্মে সংবিধানের অঙ্গীভূত ঘোষণাটি বাতিল করে। পরে কর্নেল ফারুকুর রহমান এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করলে বিচারপতি মোজাম্মেল হক তার পক্ষে রায় প্রদান করেন। যার ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ইচ্ছে করলে এই সমস্ত Proclamation বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু তারা করেননি। আজকে বেশ জোরেশোরে দাবি করেছেন। তার অর্থই হলো নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আর কোনো উপায় ছিলো না। এবার মিডিয়াকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করার ফলাফলও পেয়েছে। আসল কারণ যে রাজনৈতিক সেটা একজন সাধারণ নাগরিকের বুঝতে বাকি থাকে না। ২০০১ সালে বিএনপি এবং জামায়াত ঐক্যজোট হলো, তখন থেকেই শুরু হলো জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদাগার। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামায়াতকে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস শুরু করে। নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ১৭টি আসনে জয়লাভ করলে যুদ্ধাপরাধ বিচার আন্দোলন শেষ হয়ে যায়।

ঙ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অনেক টকশোতে শাহরিয়ার কবীরকে বলতে শুনেছি পাকিস্তান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য কথিত ১৯৫ জনকে নেয়ার সময় কথা দিয়েছিল তারা নিজেদের আইন অনুযায়ী বিচার করবে। কিন্তু বিচার করেনি। মন্তব্য হিসেবে এটাকে একেবারে বেঠিক বলব না। কিন্তু তিনি কি ১৯৭৪ সালে ৯ এপ্রিল ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ১৩ ধারাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন? পড়েননি বলেই মনে হয়। কারণ এই ধারার একেবারে শেষ লাইনে লেখা ছিল।

The state minister for defence and foreign affairs of the government of Pakistan said that his goverment condemned and deeply regretted any crime that may have been committed.

আইনের জগতে Shall আর সাধু'র ব্যবহার নিয়ে বেশ লড়াই চলে। এখন পাকিস্তান সরকার যদি বলে আমরা মনে করছি না কোন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানকে বাধ্য করা যাবে না কথিত ১৯৫ জনের বিচারের জন্য। বলা বাহুল্য, সংসদে এই চুক্তিটি দাখিল করলে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ত। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাচারবশত তা করেনি।

চ. স্বাধীনতা অর্জনের পর সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সেই সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশেষত দালাল আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর সাধারণ নাগরিকরাও এর অপব্যবহার শুরু করে। অনেক নিরপরাধ লোকজন ইচ্ছাকৃতভাবে জেলে যেতে বাধ্য হয়। দেখা যায়, সাধারণ ও তুচ্ছ কারণে একে

www.pathagar.com

অন্যকে দালাল হিসেবে পরিগণিত করে প্রতিহিংসা বশতঃ মামলা মোকদ্দমাতে জড়াতে থাকে। সেই সময় পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছেন কবি আবুল হোসেন তার একটি আত্মজীবনীমূলক রচনায়। কারণ ওখানে শুধুমাত্র ঘটনা নয়, রয়েছে জার্মান সাংবাদিকদের আসল উপলব্ধির কথা। শোনা যাক তৎকালীন সরকারি তথ্য বিভাগের বড় কর্মকর্তা কবি আবুল হোসেনের সেই ভাষ্য :

... মনে হচ্ছিল এ দেশে বোধ হয় দালাল ছাড়া আর কিছু নেই।

একদিন পূর্ব জার্মানির কয়েকজন সাংবাদিক এলেন দেখা করতে। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা দেখছি কোলাবরেটর নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন।'

আমি বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন, এ আমাদের এক বিরাট সমস্যা।'

- আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান করে ফেলেছিলাম।

- তাই নাকি! কী রকম?

- আমরা কিছু পালের গোদাকে ধরে নিয়ে এসে পটাপট সবগুলোকে খতম করে দিলাম। তারপর আর কোনো ধরপাকড় নয়, কারও গায়ে হাত দেইনি আমরা। আমাদের অতো সময় কোথায়? অত জেলখানা, বছরের পর বছর ধরে বিচার আচার, অত খোঁজাখুঁজি। দেশের পুনর্গঠনই ছিল তখন আমাদের সবচেয়ে জরুরি কাজ।'

উল্লেখ্য, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় এই আত্মজীবনীর আসল Spirit বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক, অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, রাজশাহী।

(সংকলিত)

আমাদের গতি সত্যের পথে
কারো বাঁধা আজ মানবে না,
বিজয় আছে সম্মুখে তাই
মুক্তির এ মিছিল থামবে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ঐতিহ্য, ত্যাগ- কুরবানী, গৌরব ও সংগ্রামের ৩ যুগ

-রাশেদুল হাসান রানা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে দেশটি স্বাধীন হয়। আলাদাভাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় এ ভূখন্ডটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা একটি স্বাধীন দেশ, একটি ভৌগলিক মানচিত্র, একটি লাল সবুজের পতাকা লাভ করলেও দেশের মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধে সহযোগীতা প্রদানকারী রাষ্ট্র সহসাই আমাদের সাথে দাদাগিরি শুরু করে। সীমান্ত এলাকা দিয়ে চলে যেতে থাকে আমাদের দামী দামী সম্পদরাজি। প্রতিবাদ করার অপরাধে দেশের প্রথম রাজনৈতিক বন্দি হন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখাদিলো দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব। আর তাইতো প্রখ্যাত গবেষক আবুল মনসুর আহমদ বলেন "বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা"

এ উপমহাদেশের রাজনীতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সক্রিয় ছাত্র রাজনীতির শক্ত অবস্থান, বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন সমূহের রয়েছে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ভূমিকা। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির মাঝে পার্থক্য থাকা একেবারেই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার ধারাবাহিকতায় এখানে যেমন রয়েছে ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহ তেমনি রয়েছে অনেক দলের অঙ্গীভূত ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশের বুকে রয়েছে পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসা ছাত্রসংগঠনসমূহ। তারই পাশাপাশি কাজ করছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে ওঠা, দলীয় লেজুড়বৃত্তিমুক্ত এক আলোকিত ছাত্রসংগঠনের নাম, একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে পথচলা শুরু করে একে একে ৩৭ বছর পেছনে ফেলে এ সংগঠন রচনা করেছে এক গৌরবময় ইতিহাসের। একটি গঠনমূলক, গতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে একটি একক, অনন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে, মানুষ তৈরি করার কারখানা হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশি-বির জনতার মনে, লক্ষ তরুণের হৃদয়ে করে নিয়েছে তার স্থায়ী আসন।

একটি নিরন্তর সংগ্রামরত ছাত্র সংগঠন হিসেবে ৩ যুগ ধরে অব্যাহত ধারায় কাজ করতে গিয়ে শিবির রচনা করেছে গৌরবময় ইতিহাস। যদিও শিবিরের গত ৩ যুগের ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের নানা প্রেক্ষাপটে এই সংগঠনের নানা রকম মূল্যায়নও হতে পারে। পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র হিসেবেও হতে পারে অপর বিবেচনা। একটি অনন্য সংগঠনের তিনযুগের ইতিহাস সত্যি সত্যি সচেতন, নিরপেক্ষ ও যথার্থ বিবেচনার দাবি রাখে। দেশ-জনতার সুবিবেচনার জন্য কিছু বিষয় তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

শিবিরের আত্মপ্রকাশ সময়ের অনিবার্য বাস্তবতা ঃ

কোন প্রেক্ষাপট ছাড়া যেমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা জন্ম নেয়না ঠিক তেমনি কোন প্রয়োজন ছাড়া সংগঠনেরও জন্ম হয় না। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠা ছিলো তৎকালীন সময়ের অনিবার্য বাস্তবতা। আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এ ধরনের একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশকে অনিবার্য করে তোলে। স্বাধীনতা পরবর্তী ৭১-৭৫ এর সাড়ে তিন বছর সময় কাল, এ সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো একদলীয় স্বৈর-সরকার "বাকশাল"। সকল দল মতের টুটি চেপে ধরা হলো। ইসলামের নামে দল নিষিদ্ধ করা হলো। সরকার নিয়ন্ত্রিত ৪টি পত্রিকা রেখে সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেয় হলো। ৩০ হাজার তরুণ প্রাণ দিলো প্রতিবাদ করতে গিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে জীবন দিলো, কাপড়ের অভাবে বাসন্তীরা ছেড়া জাল দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য হল। মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি করল ডাস্টবিনের পঁচা উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে, কালা-কানুনের যাতাকলে পিষ্ট হলো মানুষ, হারালো বাক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। এমনি এক বিভিষীকাময় পরিস্থিতিতে ছাত্রশিবির মানবতার শ্লোগান তুলে ডাক দিলো "পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে আমরা শিবির গড়েছি"।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য ঃ

"আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পূর্ণবিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন"

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষন সহ ছাত্রশিবির রচনা করেছে বিজ্ঞান সম্মত ৫ দফা কর্মসূচী, যার মাধ্যমে তার কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে।

শিবির কেন প্রতিষ্ঠিত হলো?

আল্লাহর এই জমিনে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। চমক লাগানো সাময়িক কোন উদ্দেশ্য হাসিল এর লক্ষ্য নয়।

ছাত্রশিবির স্বতন্ত্র ও বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন?

শিবিরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সিলেবাস, নিয়মিত পাঠচক্র, সামষ্টিক পাঠ, স্টাডি সার্কেল, স্টাডি ক্লাস, নিয়মিত অধ্যয়ন, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা, শারিরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, লাইব্রেরী, এ+ সংবর্ধনা, ক্যারিয়ার গাইড লাইন প্রোগ্রাম, এ+ পাওয়া কি এতোই কঠিন, আকাশ ছোয়ার মন্ত্র শেখার মতো বৈচিত্র্যময় কর্মসূচী। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামী ছাত্রশিবিরের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংগঠন থেকে স্বাতন্ত্রমন্ডিত করেছে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের দুনিয়ায় চলার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা কৌশল হয়তো শিক্ষা দেয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কোরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর মানুষ এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি ছাত্র তীব্র প্রতিযোগিতার মানসিকতা সম্পন্ন একজন দয়ামায়াহীন, দায়িত্ববোধহীন ভোগবাদী মানবে রূপ নেয়, তার ভেতর মানবতা, কল্যাণব্রত, খোদাভীতি ও জবাবদিহীতার জন্ম নেয় না, আর তাই মানবিক গুণগুলো জাগ্রত করার লক্ষ্যে

www.pathagar.com

শিবির যা করে ঃ-

- **সৃষ্টি-স্রষ্টার অধিকার সচেতনঃ**

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক, স্রষ্টার অধিকার ও সৃষ্টির কর্তব্যগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার পূর্নতা লাভ করে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্রষ্টাকে আড়াল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আর সেই কারনেই ছাত্রশিবির একজন শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

- **সমন্বিত সিলেবাসঃ**

শিবিরের সিলেবাস একটি সমন্বিত সিলেবাস, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মানবিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ নেই। অন্যদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেবাস অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত শিক্ষালাভের পাশাপাশি তার নৈতিক ও মানবিক প্রতিভা বিকাশ করতে সক্ষম হয়।

- **স্তর ভিত্তিক সিলেবাসঃ**

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি শ্রেনীর জন্য আলাদা সিলেবাস আছে কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন তাদের নেতা কর্মীদের মান, মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে কোন সিলেবাস রাখেননি। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু ছাত্রশিবির। যারা জনশক্তির স্তর অনুযায়ী সিলেবাস প্রনয়ন করেছে।

- **প্রতিভা লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে শিবিরঃ**

ইসলামী ছাত্রশিবির কেবল প্রতিভা বিকাশ ও লালনের জন্য কাজ করে না বরং শিবির প্রতিভা সন্ধানী একটি অনন্য সংগঠন। সুপ্তপ্রতিভা সন্ধানে শিবির প্রতি বছর তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আয়োজন করে বিভিন্ন কুইজ প্রতিযোগীতা, মেধা যাচাই, ক্যারিয়ার কনফারেন্স, কম্পিউটার মেলা, বিজ্ঞান মেলা, সাধারন জ্ঞানের আসর, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতা, এছাড়াও শিবির আয়োজন করে আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সবাই যখন উদ্বিগ্ন অথচ কোন কর্মসূচী দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, শিবির তখন গ্রহন করেছে কার্যকর উদ্যোগ ও কর্মসূচী। এর রয়েছে সারা দেশে ২০০টিরও বেশি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ ও প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এক ঝাক তরুন মেধাবী শিল্পী তৈরী করে যাচ্ছে প্রতি বছর। মঞ্চ অনুষ্ঠান ছাড়াও এসব গোষ্ঠীর রয়েছে নিয়মিত অডিও-ভিডিও প্রকাশনার বিপুল সম্ভার। আর এ সব ধারন করে আছে ইসলামী, দেশাত্ববোধক, জারি, ভাওয়াইয়া, জারি-সারি, ভাটিয়ালী, কাওয়ালী গান ও আবৃত্তি-নাটক-কৌতুকের সমাহার যা একজন দর্শক শ্রোতাকে নির্মল আনন্দ ও ইসলামী মূল্যবোধের যৌথ স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করে।

- **রিপোর্টিং ঃ**

ছাত্রশিবিরের জনশক্তিদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট লিখতে হয়। ব্যক্তিগত রিপোর্ট এর মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মীকে জ্ঞান ও আমলের দিক দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। যা অন্য কোন ছাত্র সংগঠনে নেই। শিবিরের প্রত্যেক ইউনিট প্রতি মাসে তাদের কাজের রিপোর্ট তৈরি করে থাকে। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে।

www.pathagar.com

▪ সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গনঃ

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বহুমূখী কর্মসূচী রয়েছে শিবিরের। সন্ত্রাস মুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য শিবিরের অত্যন্ত প্রিয় শ্লোগান হচ্ছে "মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় মানুষ হওয়ার পরিবেশ চাই"

▪ দুর্যোগে দুর্ভোগে জাগ্রত শিবিরঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ কবলিত জনপদ। ইতিহাসের ভয়াবহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে আছে এদেশের মানুষ। নিজের জীবন রক্ষার পাশাপাশি অন্যদের সাহায্যে ছুটে যাওয়া এখানকার মানুষের চিরাচরিত নিয়ম। তারই ধারাবাহিকতায় ছাত্রশিবির জাতির এমন ক্রান্তিলগ্নে রেখেছে সাহসী ও উদার ভূমিকা। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামসহ দক্ষিণ অঞ্চলের সাইক্লোন পীড়িত জনতা শিবিরের ত্যাগ ও সাহসিকতার কথা কোনদিন ভুলবেনা। ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০১, ২০০৭, ২০০৯ এ বিভিন্ন দুর্যোগে দুর্ভোগে জীবন বাজি রেখে শিবিরের সহযোগিতা সকলের মনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে, সবাই অভিভূত হয়ে দেখেছে কিভাবে শিবির বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই-খাতা, কলমসহ নগদ অর্থ প্রদান করে তাদের শিক্ষাজীবনকে অব্যাহত রাখা ছিল শিবিরের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী।

শীতার্তদের মাঝে প্রতিবছরই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী পালন করে শিবির। এ ছাড়াও শিবিরের নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, বৃক্ষরোপন অভিযান, স্বাক্ষরতা অভিযানের মত সামাজিক আন্দোলন যা সুন্দর ও নির্মল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

"জাতীয় ইস্যুসমূহে শিবিরের ইতিবাচক ভূমিকা" ঃ

একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যু ও ক্রান্তিলগ্নে এ সংগঠন রেখে এসেছে ইতিবাচক ভূমিকা। ১৯৮১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতাসীন বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ১৯৮২ সালে বন্দুকের মুখে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট এরশাদ। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শিবিরের ভূমিকা ছিল অগ্রণী ও বলিষ্ঠ। নব্বই দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টি.এস.সি, শাহবাগ ও দোয়েল চত্তর কেন্দ্রীক যে বিশাল ছাত্রআন্দোলন গড়ে ওঠে তার অন্যতম সংগঠন শিবির। শিবিরের বহু নেতাকর্মী স্বৈরশাসকের হাতে বন্দী ও নিহত হলেও শিবির ভড়কে যায়নি। শিবিরের বিশাল র‍্যালী, মিছিল, শোভাযাত্রা জনতার মনে আশার সঞ্চার করেছিল।

১৯৯২ সালেও শিবিরকে রাখতে হয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ থেকে বর্তমান অবধি গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে শিবির তাঁর জানবাজ কর্মীদের নিয়ে অনবরত লড়াই সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

১৯৯৯ সালে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে শিবির। শিবির সন্ত্রাসকে একটি জাতীয় ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে সারাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী র‍্যালী, জনমত গঠন, সন্ত্রাস দমন, সন্ত্রাস নির্মূলের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরই প্রথম ২০০৩ সালে সারাদেশ ব্যাপী শোভাযাত্রা করেছে মাদকের বিরুদ্ধে। শিবিরই প্রথম শ্লোগান তুলেছিল-

www.pathagar.com

"যে মুখে মা' সে মুখে মাদককে না"।

এছাড়াও এশিয়ান হাইওয়ের নামে ট্রানজিট, টিপাইমুখ বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, সেনা প্রত্যাহার, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, পল্টন ট্রাজেডী, পিলখানা হত্যাকান্ড সহ দেশ বিরোধী সকল কর্মকান্ডে শিবির দেশের পক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে। জনমত সংগ্রহ, বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে আসছে।

▪ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে শিবির

শিবির আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সবসময়ই নীতিগতভাবে কারো প্রতি শত্রুতা নয় বরং সকলের প্রতি বন্ধুত্বের ব্যাপারে সচেতন। তবে অন্যায় ও অবিচারের প্রশ্নে শিবির আপোষহীন, জালেমের বিরোধীতা ও মজলুমের পক্ষ নেয়া শিবিরের নৈতিক দায়িত্ব।

১৯৭৯ সালে রাশিয়া তার পুতুল সরকার 'বারবাক কারমালের' সহযোগিতায় আফগান মানুষের ওপর হামলা চালালে শিবির ঢাকায় ২০ হাজার তরুণের বিশাল মিছিল করে তার প্রতিবাদ জানায়। এভাবে শিবির কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ইরাক, মিশরসহ যেখানেই অন্যায় হয়েছে তার প্রতিবাদ শিবির করেছে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে।

এছাড়াও শিবির সৃজনশীল প্রকাশনা, বিজ্ঞান সামগ্রী, ছাত্রকল্যাণমুলক কর্মকান্ড, ল্যান্ডিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, ছাত্রসংসদ নির্বাচন, নকল প্রবণতা থেকে মুক্তি, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড, ছাত্রসমস্যার সমাধান, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবীতে সংগ্রাম, শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশে শিবির ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান, নেতৃত্ব আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা, পদের প্রতি লোভহীন কর্মী বাহিনী তৈরী, গঠনমুলক সমালোচনা, জবাবদিহীতা, চেইন অব লিডারশীপ, পরামর্শ পদ্ধতি, লেজুড়বৃত্তি মুক্ত থেকে নিজেদেরকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে নিজেদেরকে আলাদা একটি সংগঠন হিসেবে নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে।

এসব করছে ছাত্রশিবির সমৃদ্ধ বাংলাদের গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ফেলে আসা দিন গুলোতে নানা ঘটনা-রটনা, অপপ্রচার ও অপশক্তির অপকৌশল, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতাকে মাড়িয়ে ছাত্রশিবির আজ এক গর্বিত আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও থেমে নেই বাতিলের হুংকার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বক্তৃতা, বিবৃতি এবং লেখনির মাধ্যমে হয়রানি ও অবদমনের অপচেষ্টা, পলক পড়েনি আজও জালিমের রক্তচক্ষুর। প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে বারুদের নির্মমতা। তবুও পথচলা থেমে নেই এই বিপ্লবী কাফেলার, স্বর্ণালি ও গৌরবোজ্জল ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা থামবে না কোনদিন।

কেননা সকল বিপত্তির মোকাবিলায় আমাদের দৃষ্টি সেই মঞ্জিলের দিকে উচ্চকিত। আমরা সবকিছু বিনিময় করি একটি মাত্র ঠিকানার আশ্বাসে যার নাম 'জান্নাত'।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি আদর্শিক ঠিকানার নাম। যে ঠিকানা জীবনের প্রতিটি স্বপ্ন, সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্র, শহিদী রক্তে রঞ্জিত পথ, ত্যাগ কুরবানী এবং জীবনের শেষ পরিণতিকে স্বচ্ছতায় চিহ্নিত করে। এ পথ যেন তেন পথ নয়। কন্টকাকীর্ণ, কঠিন, মজলুমের আর্ত-চিৎকারের পথ। যে পথ আজ শহীদি রক্তে রঞ্জিত।

www.pathagar.com

তবুও,

মাঝে মধ্যে মনে হয় এ পথ যেন থমকে যাচ্ছে। দুর্দান্ত প্রতাপে চলা এ মিছিল থেমে যায় যায় ভাব, আবারও না থেমে এগিয়ে চলে।

কেনই বা থামবে?

এ মিছিলতো থামতে পারেনা!

থামবেনা কোনদিন।

কেননা এ মিছিলের মঞ্জিল তো অনেক দূর.....।

পাড়ি দিতে হবে রক্ত পিচ্ছিল পথ।

এ পথের যাত্রীরা তো রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী।

তবেই না মিলবে জান্নাত,

জান্নাত যাদের অদম্য বাসনা, তাঁদের রুখতে পারে এ সাধ্য কার?

তাইতো এই কাফেলার বিপ্লবীদের শ্লোগান.....

"আমাদের প্রত্যয় একটাই

আল্লাহর পথে মোরা চলবো।

নিকষ কালিমা ভরা আকাশে

ধ্রুব জ্যোতি তারা হয়ে জ্বলবো।"

> আমাদের কাফেলা
> সম্মুখে ছুটে চলে
> দূর্বার
> মানে নাকো প্রতিরোধ
> বাধার পাহাড় করে
> চুরমার।।

লেখক
কেন্দ্রীয় কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ ও কুরবানী

-শাহ্ মুঃ মিজানুল হক মামুন

বিশ্ব ব্যবস্থা সচল এবং সক্রিয় রাখতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার নবী রাসূলদের কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলগণ মানুষকে ওহী ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউবা চেষ্টা করতে করতে দুনিয়ার জীবন শেষ করে দিয়েছেন। যুগে যুগে মানুষ যখন পরকালকে ভুলে গিয়ে দুনিয়া ভোগে ব্যস্ত ছিল ঠিক তখন নবী রাসূলগন এসে মানুষকে এ অধঃপতন হতে উদ্ধার করতে এবং মুক্তি ও কল্যাণ এর পথে নিয়ে আসতে নিজেদের সকল চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত করেন। আর রেসালত এর দায়িত্বই হল মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসা।

আল্লাহর দেয়া এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি, প্রভাবশালী মহল সহ বিরোধী শক্তি মুখোমুখী হয়েছিলেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর ভিন্নতা, নামের ভিন্নতা বা স্থানের ভিন্নতা থাকলেও বিরোধীতা জুলুম আর অত্যাচার এর ধরন প্রকৃতির মাঝে কিন্তু তেমন ভিন্নতা ছিল না। অন্যদিকে সকল নবী রাসুল এবং তাদের অনুসারীরা একই অপরাধ ও অপরাধী ছিল অর্থাৎ তারা একই কাজ, একই দাওয়াত পেশ করেন একই চরিত্র নিয়ে। কুরআনে তাদের অপরাধের কথা বলা হয়েছে "তাদের কোন অপরাধ ছিলনা তাদের অপরাধ হল তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, যিনি স্বপ্রশংসিত এবং ক্ষমতাধর।

ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আর কাওমে নূহ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের ছেলে পিতার বিরুদ্ধে বাতিল শক্তির সহযোগী হয়েছিল তারপরেও আল্লাহর নবী দাওয়াত এর কাজ অব্যাহত রাখেন, কুরআনে কারীমে এসেছে আমি যখন তাদের দাওয়াত দেই তারা তাদের আঙ্গুলি কানে ঢুকিয়ে দেয়, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দেয় এরপরও দ্বীন প্রচারে সামান্য স্লথ গতি আসেনি প্রিয় নবী হযরত নূহ (আঃ) এর।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার অন্যতম নির্দশন। দ্বীনের বিরুদ্ধবাদী ইয়াহুদী গোষ্ঠী হযরত যাকারিয়াকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল আর আল্লাহর নবী তা থেকে পরিত্রানের জন্য পথ চলা শুরু করলেন। বাতিল শক্তিও তার পিছু ছাড়েনি। তারা নবীকে হত্যা করার জন্য পাগলের মত তাঁর পিছু ছুটলো, নবী উপায় না দেখে গাছের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। নবীর করুন আর্তি গাছের জবান খুলে দিল। গাছ নবীকে আশ্রয় দিল কিন্তু বাতিল শক্তি নবীকে না পেয়ে গাছকে টুকরো টুকরো করে ফেললো। যার প্রেক্ষিতে নবী শহীদ হলেন। শুধু একজনকে নয় এভাবে শতশত নবীকে বাতিল শক্তি দ্বীনের দাওয়াতী কাজের অপরাধে শহীদ করে ফেলে।

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কায়েমের দাওয়াত নিয়ে মিশর উপস্থিত হলেন আর ফেরাউন ও তার দোসররা মূসা (আঃ) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই বরং মূসা (আঃ) কে হত্যা করার জন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নীল নদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আর আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউন ধ্বংশ হয় মূসারা বেঁচে থাকে বছরের পর বছর ধরে দ্বীনের সমাজ কায়েমের জন্য।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জাহেলী সমাজে অধিকার হারা মানুষের মর্যাদা, সম্মান এবং মুক্তির পথ প্রর্দশনের জন্য আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ যখন শুরু করলেন, আবু জেহেলেরা কিন্তু বসে ছিল না। তারা তাদের সকল শক্তি সামর্থ্য, কৌশল প্রয়োগ করে নবীকে এপথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

তারা যখন হীন স্বার্থ হাসিল করতে ব্যর্থ হয় তখন দুনিয়া হতে কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিদায় দেওয়া যায় এ ছিল তাদের টার্গেট। তাদের সকল ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ প্রমান করলেন তিনি যাকে রাখতে চান দুনিয়ার সবাই মিলে তাকে শেষ করতে চাইলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। আর যাকে শেষ করতে চান দুনিয়ার সবাই তাকে রাখতে চাইলেও পারবে না।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা আর দ্বীনি আন্দোলনে দুনিয়ার প্রথম থেকে বাতিল শক্তি যে সব বিরোধীতা করে আসছে তার একটা ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যা কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায়। "তোমরা ঈমান এনেছ বলেই তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ পরীক্ষা করে দেখা হবে না যে তোমরা কারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।" কিন্তু সবচেয়ে অবাক হওয়ার মত বিষয় যেটি তা হল সকল যুগে বিরোধীতার ক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনা ও কর্মপন্থার কোন প্রার্থক্য নেই। তারা সকলে এক ও অভিন্ন। সকলের লক্ষ্য একটি যাতে সমাজে হুকুমাতে এলাহী কায়েম না হয়। রক্ত, বর্ণ, বংশ নামে যাই হোক কাজ, অভ্যাস আর চরিত্রে তারা সবাই সমান।

ইসলাম এর ইতিহাস আল কুরাআন থেকে জানা যায়। নমরুদ ও তার দোসররা ইব্রাহীম (আঃ) কে প্রথমে নসীহত পরে ধমক, হুমকি এরপর বয়কট, সর্বশেষে প্রাণে হত্যা করার কৌশল অবলম্বন করে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

নূহ (আঃ), মূসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রে বাতিল শক্তির তরিকা কিন্তু এটাই ছিল ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরোধীদের পন্থা। তাদের এক খোদাদ্রোহীর থেকে অন্য খোদাদ্রোহীর সময়ের ব্যবধান কিন্তু কম নয়।

বর্তমান বিশ্বে নবী না থাকলেও নবীর যোগ্য উত্তরসূরীরা কুরআন এবং সুন্নাহকে ধারন করে তার ভিত্তিতে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পৃথিবীর দিকে দিকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে চলেছে। দ্বীনের ধারকরা একদিকে যেমন সংগঠিত হচ্ছে ঠিক বিপরীত দিকে বাতিল কিন্তু বসে নেই, তারাও আজ নানাবিধ সম্মেলন আর সংস্থার ছদ্মাবরণে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর উদিয়মান ইসলামী শক্তিকে।

বর্তমান দুনিয়ার সর্বব্যাপী ইসলামী শক্তির এক অনিবার্য বাস্তবতা আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর গ্রামের হাট বাজার সমূহ যাদের ধ্বনি আর দাওয়াতী তৎপরতায় মুখর। তারাও আজ বাতিল শক্তি আর ইবলিশী হামলার শিকার। দ্বীন কায়েমের এ রক্তে রঞ্জিত পথে আমাদের পথ চলাও আজ নবী রাসূলের দেখানো মুক্তির সেই সোনালী রাজপথ ধরে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দ্বীপ্ত শপথে প্রতিষ্ঠিত ৭৭ সালের এ ছোট বৃক্ষটিকে রক্ত, ত্যাগ আর কুরবানীর বিনিময়ে সিক্ত করে আজ মহিরুহে পরিনত করা হয়েছে। আজকের এ বৃহৎ কাফেলাটি এক বিরাট গৌরবোজ্জল অতীতের ফলশ্রুতি মাত্র।

আমাদের এ দ্বীনি কাফেলার পথ চলা যাদের দিয়ে শুরু হয় তাদের দাওয়াতী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ এলাকা ছেড়ে দিয়ে নতুন এলাকায় নতুন ভাবে সাংগঠনিক কাজ শুরু করতে হয়, যা কঠিন কষ্টসাধ্যই শুধু নয় বরং ছিল অকল্পনীয়। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর চেষ্টার ফসল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

তাবুক যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর সাথীরা জিহাদ চলাকালীন পেটে পাথর বেঁধেছিল। তারপরও জিহাদী অভিযান থেকে বিচলিত হয়নি। এ যামানায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ যুব কাফেলাকেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, সে সুন্নাতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হয়।

লেখক
সাবেক জেলা সভাপতি

‘জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত
মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে
উঠে যবে জিন্দেগানী’

-ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

রক্তাক্ত জনপদ ফেনী জেলা

- কফিল উদ্দিন মাহমুদ

শহীদি জনপদ "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা"। জনশক্তির ত্যাগ, নির্যাতন, কারাবরণ, রক্তাক্ত ও ৬ (ছয়) শহীদের শাহাদাতে গড়ে উঠেছে এর গৌরবময় ইতিহাস। জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের আন্দোলন ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ের অনবদ্য কাব্য রচনায় ফেনী জেলার ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে গতিময় ও প্রাণবন্ত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর আনিত মুক্তির সনদ ইসলামকে সূর্যের উদয় ও অস্তের বিস্তৃত সীমানায় সঠিক ও যথার্থভাবে পৌছে দেয়ার জন্যে যুগে যুগে সারা বাংলাদেশের মত ফেনী জেলায় (৯২৮.৩৪ বর্গ কিলোমিটার) ছিল একঝাঁক কাফেলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং অবিরত শ্রম ও ত্যাগের মহিমা। সাগরের ভীষণ উত্তালতা, পাহাড়ের কঠিন দুর্গমতা, সাহারার উষ্ণতা, অরণ্যের ভয়াবহ গহিনতা আমাদের চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। প্রতিটি প্রান্তরে ইসলামের প্রচার প্রসারে অক্লান্ত ঘাম ঝরেছে স্রোতধারার মত করে। এবং জুলুম নির্যাতনের পাহাড়সম প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দাড়িয়েছে এই সংগঠন। ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারী স্বৈরাচারি এরশাদের লেলিয়ে দেয়া জাতীয় ছাত্রসমাজের সশস্ত্র গুন্ডাদের নিষ্ঠুর বুলেটে জীবন দেন আল্লাহর দ্বীনের পতাকাবাহী তরুন তাজা প্রাণ শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর ভাই। ইসলামী আন্দোলনের অব্যাহত অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার হীন মানসে পরিকল্পিত ভাবে হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। এরপর ১৯৯৩ সালের ১২ই জানুয়ারী বাতিলের নির্মম আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন ছাগলনাইয়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান শহীদ কাজী মোশাররফ হোসেন। ১৯৯৫ সালের ৫ই জুন শাহাদাতবরণ করেন সোনাগাজীর শহীদ একরামূল হক খান । ১৯৯৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শাহাদাতবরণ করেন ফুলগাজী উপজেলার পিতামাতার একমাত্র সন্তান শহীদ আলাউদ্দিন। ১৯৯৬ সালের ১৬ মে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ গোলাম জাকারিয়া ভাই। সর্বশেষ ২০১৪ সালের ১০ ডিসেম্বর ফেনীর রাজপথে পুলিশের নির্মম গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন ফুলগাজী উপজেলার শহীদ হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান। তাদের রক্তদানের বিনিময় আজ ফেনী জেলার ইসলামী আন্দোলন একধাপ এগিয়ে ছাত্র জনতার প্রাণের সংগঠনে পরিণত হয়েছে। শহীদেরা সব সময় গহিন অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আলোর মশাল ধরে সামনের দিকে নিয়ে যায়। শাহাদাতের সময় যে উন্মাদনা নিয়ে তারা জীবন উৎসর্গ করেছে অনন্তকাল তারা সে জীবনী শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে। আর তাদের ত্যাগের উন্মাদনা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বাহিনীকে উজ্জীবিত করে কাল থেকে কালান্তর, যুগ থেকে যুগান্তর । আল কোরআন তাদের অনন্ত জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে বলেন- "আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কে মৃত বলো না, প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। তাদের জীবন সর্ম্পকে তোমাদের চেতনাই নেই।" অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যুদ্ধে যাদের রক্ত প্রবাহিত হলো ফেনীর জমিনে, তাদের প্রেরণায় আজ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত। আর প্রতিবাদ করতে করতে আহত, পঙ্গুতবরণ করল আর

www.pathagar.com

যারা বাতিলের নির্মম আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পান করল শাহাদাতের পেয়ালা, তাদের সাহসী পথের কান্ডারী হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন একদল সাহসী তরুণ ও শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত কর্মীবাহিনী। তারা মানবতার মুক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে নিজেদের ঘুম হারাম করে দিয়ে সাহাবা কেরামের আখলাকের আলোকে আগামী প্রজন্মের চরিত্র সংশোধন ও পূণর্গঠনে বিরামহীন কাজ করে চলেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় আজ ফেনী জেলায় ৬টি সাথী শাখা ও ৮টি থানা শাখার অধিনে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে আমাদের অব্যাহত দাওয়াত এবং ভালমানের নেতৃত্ব তৈরীর প্রচেষ্টা। প্রতিটি ওয়ার্ড, ইউনিয়নে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রয়েছে অসংখ্য কর্মী, সাথী, সদস্য ও শুভাকাংখী। ফেনী জেলা ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি রয়েছে তাহলো সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন। ফেনী জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের আন্দোলনের সূচনা থেকে বাতিল শক্তির সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের ফলে হয়তো আজ আমাদের এই সামান্য অবস্থান গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের পথ এখনো অনেক দূরে। শহীদ ভাইদের শাহাদাত এবং আহত পঙ্গু ভাইদের আহাজারি এই আন্দোলনে যেমন চিরকাল থাকবে তেমনি এই মজলুম ভাইদের হৃদয়ের আর্তি পূরণে আমাদের কে থাকতে হবে সদা তৎপর। উপরন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালাও সবসময়ে মজলুমের পক্ষে থাকেন। আমাদের ছয়জন শহীদ ভাইয়ের প্রতি ফোটা রক্তের মধ্যে যে শত শত ফোটা জীবন সঞ্জীবনী রয়েছে তা যেন একটি জাতির অন্ধ চোখে আলোর মত, বধির কর্ণে শ্রবণ শক্তি, হৃদয়ের মধ্যে চেতনার অনুভব। তার প্রমাণ হিসেবে ফেনী জেলার ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী ছাত্রশিবির গনমানুষের আন্দোলন হিসেবে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে বিচারিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনের অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামী এখন এ জনপদের গনমানুষের আন্দোলন। আজ ফেনী জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী শুভাকাংখী পাওয়া যায়। যার ফলে বাতিলের ঘাঁটিতে আঘাত হেনে বিজয় আমাদের নিশ্চিত হবে একদিন ইন্‌শাআল্লাহ। তবে মনে রাখতে হবে এই দায়িত্বপালনে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের জন্যে কোন পথ সহজে নেই। এই পথের প্রতিটি ইঞ্চি জমিন সংঘাতময় । এই জমিনের উপর হাজার বছর ধরে দাপটের সাথে টিকে রয়েছে বস্তুবাদী সভ্যতা । ইসলামের বিরুদ্ধে পাহারা দারি এ সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ফেরআউন, নমরুদের মত এই জামানার শত সহস্র তাগুতিশক্তি সদা-সর্বদা তৎপর রয়েছে। তাদের সকল জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী তাদের নির্মল চরিত্রের উত্তম আর্দশ ও রাসূল (স)-এর সীরাতের পথ ধরে এগিয়ে যাবে অ-নে-ক অ-নে-ক দূরে। বিজয় ছিনিয়ে আনবে ইসলামের, কায়েম হবে ন্যায় ও শান্তির বিধান।

হে আল্লাহ আমাদের পথকে সহজ করে দিন, আমাদের কাজে কর্মে আপনার প্রেরিত ওহীর শক্তি দিন, আমাদের পথ চলায় আপনি অভিভাবক হয়ে থাকুন।

অফিস সম্পাদক
ফেনী জেলা
Email: kafil.uddin75@yahoo.com

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্রশিবিরঃ অপপ্রচার ও নির্যাতনের শিকার

মোঃ ওসমান গনি আরিফ মজুমদার

কয়েকজন মেধাবী ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। লেখা পড়ার পাশাপাশি আল্লাহর সৃষ্টি জগত নিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কেন? কেন, হিংসা-বিদ্বেষ হানাহানি, অনৈতিকতা, সন্ত্রাস ও খুনের উদ্ভব? আমরা তো এক আল্লাহর সৃষ্টি। তারপরও এত বিশৃঙ্খলা কেন? বহু চিন্তার পর তারা এ প্রশ্নের উত্তর পায়। যে কোন কিছুর আবিষ্কারের ক্যাটালগ অনুসরণ না করে আবিষ্কৃত জিনিসটি পরিচালনা করতে গেলে কোন না কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে। হয়তোবা জিনিসটি হবে একবারেই অচল। 'জমিন যার আইন চলবে তাঁর' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা, এই শ্লোগানকে বাস্তবায়ন করার জন্য মন আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রয়োজন সুসংঘবদ্ধ আন্দোলন। এই প্রয়োজনের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৭৭ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নামক সংগঠনটির। সংগঠনটি প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হল তাতে ডানপন্থী ছাড়া ও সুফিয়া কামালসহ আরও কয়েক জন বামপন্থী বুদ্ধিজীবি শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছিল। বছরের চাকা ঘুরতে না ঘুরতে দেশের গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শহর, নগর ও গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। মজবুতি অর্জন করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক কাঠামো, নারায়ে তাকবীরের শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় জনপদ। প্রচলিত সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ছাত্রশিবির। তখনি ইসলাম বিদ্বেষী মহলের জ্বালাতন শুরু হয়। যার কারণে শুভেচ্ছা দেয়া ব্যক্তি সুফিয়া কামাল বলেছেন, এক কোটি শিবিরকে পিষতে তিন দিন সময়ের প্রয়োজন। এমনিভাবেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পাওনা জেল, জুলুম, হুলিয়া, হত্যা, সন্ত্রাস, শুরু হয়ে গেল আন্দোলনের এ গতিকে দমানোর জন্য প্রচার শুরু করল শিবির রগ কাটে, গীরা কাটে, শিবির রাজাকার, যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেনি তারা কি রাজাকার? না কখনো নয়। এটিও গতি দমানোর কৌশল। ৫ম জাতীয় সংসদে জামায়াতের সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষাণা দিয়েছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবির রগ ও গলা কাটার দল নয় বরং কখনো কারো উপর প্রথমে আক্রমণ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা করেছে প্রমাণ দিয়ে বলা যায় তাহলে আমি এই সংসদ থেকে পদত্যাগ করব। কই না তো। কেউ তো সেদিন গলাবাজী ছাড়া প্রমাণ দিতে পারেনি। তার পরও তারা অপপ্রচারে লিপ্ত। ঘটনার আড়ালে নাম দিয়ে বিটিভিতে মিথ্যাচার চালাচ্ছে। একই কায়দায় চলছে দেশের সর্বত্র। আমি এখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ফেনীতে অপপ্রচারঃ

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কাজকে গণ মানুষের নিকট বিকৃত করার লক্ষ্যে গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। গোয়েবলস একজন ব্যক্তি। যিনি বলেছেন, "একটি মিথ্যাকে একশত বার সত্য

www.pathagar.com

বলে প্রচার করলে তা সত্য হয়ে যায়।" এ শিক্ষা নিয়ে ফেনীর ইসলাম বিদ্বেষী মহলও সক্রিয়। '৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ইসলামী ছাত্রশিবির ধলিয়া হাইস্কুল শাখার সভাপতিকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মারত্মক আঘাত করে। পরদিন থানা সভাপতি কালিম উল্ল্যাহ ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আদর্শবাদী কাফেলার সৈনিকদেরকে ডাকাত আখ্যায়িত করে সমাজের কিছু বখাটে লোককে একত্রিত করে এদের উপর হামলা পরিচালনা করে এতে শিবির নেতা কালিম উল্ল্যাহ, গোলাম কিবরিয়া, নজরুল ও কাশেম ভাইসহ পনের জন মারত্মকভাবে আহত হয়। তখনও তারা ক্ষান্ত হয়নি। ডাকাত উপাধি দিয়ে শিবির নেতা রফিক, মিন্টু, মাহফুজ ও বেলায়েত ভাইকে ফেনী থানা পুলিশদের নিকট সোপার্দ করে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কারাবরণ করে পরিশেষে মুক্তি পান। ১৯৯৪ সালে শিবিরের তৎকালীন ছাগলনাইয়া সাথী শাখার সভাপতির একটি ফটো স্টুডিও থেকে সংগ্রহ করে ছাত্রদলের কুমতলববাজরা ফটোটির উপর হাতে লিখে, ফটোষ্ট্যাট করে সভাপতির নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে একটি লিফলেট ছাড়ে। পরবর্তীতে আমাদের শুভাকাংখী কলেজ রোডের ব্যবসায়ী বেলাল ভাই, মাঈন উদ্দিন ও অধ্যাপক মানিক ভাইসহ অন্যান্যদের প্রতিবাদের ফলে তারা ভূল স্বীকার করে। তারা চেয়েছিল শিবির নেতার চরিত্রে কালিমা লেপন করে আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি করা। কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত বানচাল করে দেন। ৯৬ সালে দাগনভূঁঞা কলেজে শিবির ও ছাত্রলীগের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এতে নিরস্ত্র শিবির কর্মীরা অনেকে আহত হলেও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা একটি ভাঙা পাইপগান হাতে দিয়ে শিবির কর্মী শাখাওয়াতকে পুলিশে সোপার্দ করে। সে দীর্ঘ দিন কারাভোগের পর মুক্তি পায়।

> ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কাজকে গণ মানুষের নিকট বিকৃত করার লক্ষ্যে গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। গোয়েবলস একজন ব্যক্তি। যিনি বলেছেন একটি মিথ্যাকে একশত বার সত্য বলে প্রচার করলে তা সত্য হয়ে যায়।

নির্যাতনঃ

শিবির প্রতিষ্ঠার বছর ১৯৭৭ সালে ফেনী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের নিশ্চিত বিজয় ঠেকানোর জন্য ছাত্রলীগ নির্বাচন বানচাল করে। এর প্রতিবাদে শিবির মিছিল বের করলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এতে ফয়েজ আহম্মদ, লুৎফুল্লাহ ও শাখাওয়াত হোসেন ভাই মারাত্মক আহত হন। এর কয়েকদিন পূর্বে ছাগলনাইয়াতে নির্বাচনী পোষ্টার লাগাতে গিয়ে শিবির মনোনীত (টিপু-সফি) পরিষদের জি.এস. প্রার্থী সফি উল্ল্যাহ ভাই ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মক আহত হন। ১৯৭৮ সালে ছাত্রলীগ ঘোষণা করে দিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাউকে ক্যাম্পাসে যেতে দিবে না। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকেরা কি কারো হুমকিকে পরোয়া করে? না কখনো নয়। আমাদের ভাইদের অবাধ বিচরণ দেখে তারা তৎকালীন শহর শিবির সভাপতি

www.pathagar.com

মোফাচ্ছের ভাই ও মহকুমা সভাপতি কেফায়েত ভাইকে উর্পযুপরি কোপাতে থাকে। যাতে মোফাচ্ছের ভাইয়ের আঙ্গুল ফেটে যায় এবং কেফায়েত ভাইয়ের কান কেটে যায়। ১৯৯৩ সালে আমাদের ফেনী পাইলট হাইস্কুলের সভাপতি ইকবাল কবির রনি ও সেক্রেটারী জাহিদুল আলম মুন্না ক্লাস শেষে স্কুল মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীদের নজরে পড়ে। ছাত্রলীগ কর্মীরা সাথে সাথে এগিয়ে এসে উভয় জনকে রাজাকার উপাধি দিয়ে বিষম মারধর করে। মুন্নার বুকে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরও তার ব্যথা আজ পর্যন্ত উপশম হয়নি।

ফেনী আলীয়াঃ

ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা জেলার বৃহৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে দ্বীনের সৈনিক বের হবে এটাই জনগনের প্রত্যাশা। কিন্তু না (প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্বহীন মানসিকতার কারণে লেখাপড়ার মানও পরিবেশ নেই বললেই চলে) যার ফলশ্রুতিতে আলীয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নির্যাতনের শিকার। ১৯৮৯ সালে ছাত্রলীগ ফেনী কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে আলীয়ার ক্যাম্পাসে ঢুকে ধর ধর শিবির ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে বিক্ষিপ্ত ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। এতে আলীয়া মাদ্রাসা সভাপতি শামছুল হুদা কিরণ, এনামুল হক ও আ.ন.ম. আবদুর রহিম (পরে জেলা সেক্রেটারী) জাহাঙ্গীর আলী ভূঁঞা সহ আরও কয়েকজন ভাই মারাত্মক আহত হন। প্রত্যেক বারই পরীক্ষার্থী ভাইয়েরা পরীক্ষার সময় ইসলামী ছাত্রশিবির কে কিছু আর্থিক সহযোগিতা দান করে। ১৯৮৯ সালে এই টাকা কালেকশানের সময় এক পরীক্ষার্থী বির্তক শুরু করলে বাহিরে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে শিবির নেতা ফখরুল ইসলাম জিলানীসহ আরও বেশ কয়েক জনকে মারাত্মক আহত করে। ১৯৯৮ সালে বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মীরা মাগরিবের পর যখন সবাই লজিং ও টিউশানি নিয়ে ব্যস্ত তখনই মাদ্রাসা ছাত্রাবাসের তালা ভেঙ্গে বিছানা-পত্র ও কোরআন হাদীসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ফেনী পলিটেকনিকঃ

১৯৯২ সালে পকেটে শিবিরের ডাইরী রাখার অপরাধে তৎকালী টেকনিকেল সভাপতি আবদুল জলিল ভাইকে হোষ্টেলে নিয়ে বেদম প্রহার করে বেহুশ অবস্থায় জাসদ ছাত্রলীগ কর্মীরা রাস্তার পাশে পেলে যায়। পরে পথচারীরা তাকে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হন। আবার বছরের শেষ দিকে শিবির নেতা জলিল ভাই সহ ২৩ জনকে একটি রুমে অন্তরীন রেখে জাসদ ছাত্রলীগে যোগদানের জন্য শপথ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু তারা এক মিনিটের জন্যও তাদের ঐ সিদ্ধান্ত মানতে রাজি ছিল না। তাই তাদের সকলকে বেধম প্রহার করে মারাত্মক আহত করে। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে জাসদ ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী পলিটেকনিক শাখা শিবিরের তৎকালীন সভাপতি শহীদুল আলমকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ধরে নিয়ে সাহাবুদ্দিন হলে একটি রুমে আটকে রেখে সারাদিন উপর্যুপরি নির্যাতন চালায়। হকিষ্টিক লোহার রডের আঘাতে তার বাম পা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে যায়। দীর্ঘ ২ মাস হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হন। এরপর আবার তাকে আরো দুই বার অপহরণ করে নিয়ে নির্যাতন চালায়।

www.pathagar.com

দাগনভূঁঞাঃ

২১ই আগষ্ট ২০০৯ পবিত্র মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে দাগনভূঞাঁ বাজারে মিছিল চলাকালীন সময়ে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ইট, লাঠি, রড ও চুরি নিয়ে অতর্কিত ভাবে মিছিলে হামলা চালায়, এতে জামায়াতের পৌর আমীর গাজী সালেহ উদ্দিন, শিবিরের সাথী শাখার সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ ও একজন সাথী গুরুতর আহত হলে তাদেরকে ফেনী আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উক্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের বিচারের জন্য থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ মামলা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তিতে কোর্টে মামলা করা হয়।

২০ই মে ২০০৯ দাগনভূঁঞা আমু ভূঞার হাটে একজন কর্মীকে আটকে রেখে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং একজন সাথীকে মারার জন্য খোঁজা খুজি করে ঐ অঞ্চলে ছাত্রশিবিরকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের সন্ত্রসীরা শিবির যাতে কিশোর কণ্ঠ আর বিক্রয় না করে এই মর্মে লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করে।

২২ই জুলাই'০৯ দাগনভূঁঞা বরইয়া বাজারের পূর্ব পার্শ্বে সংগঠনের নিয়মিত কাজ করতে গেলে আমাদের ইউনিয়ন সভাপতিকে হাঁতুড়ি, রড ও লাঠি দিয়ে আহত করে। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিলে উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা হয়।

৮ই জুলাই' ১০, সালে দুপুর ২ টার দিকে দাগনভূঁঞা বাজারে অবস্থিত শিবিরের মেসে হামলা চালিয়ে আমাদের কয়েকজন ভাইকে গুরুতর আহত করে। মেস থেকে নগদ টাকা, কম্পিউটার, টিভি, চেয়ার, টেবিল, কোরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্য সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

পরে পুলিশকে খবর দিয়ে শিবিরের দাগনভূঁঞা থানা দক্ষিনের সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন (বর্তমান জেলা সেক্রেটারী) ও সাথী শাখা সেক্রেটারী শেখ ফরিদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ এদেরকে থানায় নিয়ে বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি ও বিস্ফোরক পাওয়া গেছে বলে "২০০৮ সালের আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস দমন আইনে" মামলা করে তাদেরকে জেলখানায় প্রেরন করে। বর্তমানে তারা জামিনে মুক্ত রয়েছে।

২৭ই এপ্রিল ২০১২, দাগনভূঁঞা উপজেলা 'সিলোনিয়া সাথী শাখায়' সাফুয়া গ্রামে ছাত্রশিবিরের সাথী নুর মোহাম্মদ দাওয়াতী কাজ করতে গেলে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা তাকে ও তার কর্মীদেরকে এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়ে মারাত্নক ভাবে আহত করে। পরে স্থানীয় জনতা তাদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়।

২১ই জুন' ১২ দাগনভূঁঞা উপজেলা ইয়াকুবপুর ইউনিয়নের সাহিত্য সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন সাংগঠনিক কাজ করে ফেরার পথে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা বিনা উস্কানিতে তাঁর উপর হামলা চালিয়ে তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। পরে তাকে দায়িত্বশীলরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

৪ঠা মার্চ' ১৩, কেন্দ্র ঘোষিত হরতাল কর্মসূচীতে বসুরহাট রোডস্থ লাল মসজিদের সামনে রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় কতিপয় দুর্বৃত্ত বাসে আগুন দেয়।

www.pathagar.com

ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত-শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী সহ ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৮/১০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করে।

১৪ই মে'১৩ আতার্তুক স্কুল সভাপতি নুর মোহাম্মদ রকি সাংগঠনিক কাজের জন্য স্কুল গেইটে গেলে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী সোহান, শুভ এর নেতৃত্বে ১০-১৫ জন সন্ত্রাসী তার উপর আক্রমন চালায়। তারা তাকে মারধর এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এ ছাড়া স্কুল অর্থ সম্পাদককে মারধর করার জন্য আটক করে রেখে গালিগালাজ, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং দাওয়াতী উপকরণ ছিনিয়ে নেয়। তারা নিয়মিত কর্মী ও স্কুল দায়িত্বশীলদের স্কুলে আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সাংগঠনিক কাজে বাধা প্রদান করে।

২রা ডিসেম্বর'১৩ ১৮দলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচী পালনকালে দাগুনভূঁঞার সিলোনীয়া বাজারে ইসলামী ছাত্রশিবির একটি মিছিল বের করলে স্থানীয় ছাত্রলীগের সাথে বাক-বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায় । এরপর ৩নং আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত এমপি প্রার্থী আবুল বশর, উপজেলা চেয়ারম্যান দিদারুল কবির রতন,জায়লস্কর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মামুনুর রশীদ মিলন এর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৭০/৮০ জন সন্ত্রাসী এসেই বেপরোয়া গুলি করতে থাকে । এতে জেলা স্কুল সম্পাদক ওমর ফারুক, দাগনভূঞা উপজেলা দক্ষিন শিবির সভাপতি মোঃ বোরহান উদ্দিন, সাথী জহির উদ্দিন, সোহেল, শাহাদাত হোসেন, আবদুল্লাহ আল নোমান এবং মাষ্টার আবুল খায়ের সহ ১২/১৪ জন গুলিবিদ্ধসহ মারাত্মক আহত হয় আরো প্রায় ২৫ জন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শিবিরকর্মী গিয়াস উদ্দিন শাহাদাতের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং পথচারী রিক্সাওয়ালা মফিজুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। পরবর্তীতে সন্ত্রাসীরা আমাদের ৩টি মটর সাইকেল, ৭৯ টি বাই সাইকেল সহ আমাদের শুভাকাংখীদের ৩/৪টি দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় উল্টো ছাত্রশিবির ও জামায়াতের উপর দোষ চাপিয়ে ৯১ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১২০ জনকে আসামী করে পুলিশ মামলা দায়ের করে।

২রা এপ্রিল'১৪ সিলোনিয়া সাথী শাখায় সভাপতি মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন, সেক্রেটারী হেদায়েত উল্লাহ ও অন্যান্য দায়িত্বশীলেরা মাগরিবের নামাজের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে কথা বলতে দাঁড়ায়। এমন সময় ছাত্রলীগের ৮-৯ জন সন্ত্রাসী তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে সাথী শাখার সেক্রেটারী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক সালাউদ্দিন সাগর উভয় জনের মাথা ফাঁটিয়ে দেয় এবং বেদড় প্রহার করে গুরুতর আহত করে। পরে তাদেরকে এলাকার স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ফেনীর আল-কেমী

www.pathagar.com

হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তারা সুস্থ আছেন।

সোনাগাজী ঃ

২৭শে সেপ্টেম্বর সোনাগাজী উপজেলার বক্তার মুন্সিতে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা শিবির অফিসে হামলা করে অফিস ভাংচুর করে এবং শিবির নেতা শাহাদাৎ হোসাইনকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে আঘাত করে, এই ঘটনায় শিবির কর্মী মোতাহের, আতিক সহ মোট আট/ দশজন আহত হন। ১১ই সেপ্টেম্বর, ৮৯ সালে সোনাগাজী হাসপাতাল গেইটে শিবির নেতা ফয়েজ ও এনামুল হক সাইকেল মেরামত করাতে গেলে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলায় দুজনই গুরুতর আহত হয়। একই দিন

ছাত্রদলের সন্ত্রাসী মিজানের নেতৃত্বে সোনাগাজী কলেজে শিবির কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায় এতে শিবিরকর্মী নুরুল আমিন, বেলাল, আবুল বশর গুরুতর আহত হয়, সাধারণ ছাত্ররা তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর ৮৯ইং সোনাগাজী কলেজ থেকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মিছিল সহকারে স্থানীয় শিবির অফিসে হামলা চালিয়ে অফিসের আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং বই পত্র তছনছ করে, উপস্থিত শিবিরকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আবার শিবির অফিসে হামলা করে এবং পুলিশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের তৎকালীন উপজেলা সেক্রেটারী শাহাদাৎ হোসাইনকে গ্রেফতার করে শারীরিক নির্যাতন করে।

৫ই অক্টোবর ১৯৯৩ইং সোনাগাজী কলেজে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা কলেজ ক্যাম্পাসে শিবিরের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক শ্লোগান দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মিছিলে যেতে চাপ সৃষ্টি করলে উপস্থিত শিবিরকর্মীরা তার প্রতিবাদ করে। এরপরে ক্লাস চলাকালে সন্ত্রাসী চাকমা, নাজিম, সোহাগ ও খোকনের নেতৃত্বে রড, হকিস্টিক, কিরিচ সহ ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিবির নেতা কর্মীদের উপর হামলা চালায়, এতে শিবিরের কলেজ সভাপতি নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ মোস্তফা, আরিফ, আবদুল খালেক, মিজানুর রহমান, গাজী মর্তুজাসহ মোট ১৫ জন আহত হয়।

১০ই নভেম্বর ৯৪ইং, সোনাগাজী থানার বক্তার মুন্সিতে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী আলমগীর, মঈনুদ্দিন ও জসিমের নেতৃত্বে শিবির অফিসে হামলা করে আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং কোরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্যকে ডাকবাংলায় এনে প্রকাশ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১১ই জুন ৯৫ইং, শিবির নেতা একরাম হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা ও মিছিল শেষে শিবির কর্মীরা বাড়ী ফেরার পথে সোনাগাজী সোনালী ব্যাংক মোড়ে ছাত্রদলের লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসী সেন্টু, বাহার, চাকমা, হারুন, নাজিম, বিপ্লবের নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলা চালায়। শিবির কর্মীরা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুললে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশের সহায়তায় শিবির কর্মীদের বাড়ী ঘরে হামলা চালায়। পরদিন সকাল ৭টায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা সোনাগাজী থানার ওসি দিদারের নেতৃত্বে শিবির অফিস, সোনাগাজী মাদ্রাসা, আল হেলাল একাডেমী, পাশ্ববর্তী গ্রাম, চরচান্দিয়া, বাখুরিয়া ও মহিশ্ব চরে সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। দাঙ্গা পুলিশ ও ছাত্রদলের যৌথ হামলায় সোনাগাজী মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে শিবির নেতা কাওছার, মোস্তফা, আবদুস ছোবহান, আবদুল কুদ্দুস,

www.pathagar.com

এনামুল হক মহিউদ্দীনসহ প্রায় বিশজন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে শিবির নেতা এনামুল হক ও জামায়াত কর্মী আবদুল কুদ্দুসকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। এই ঘটনায় দীর্ঘদিন সোনাগাজী থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে।

খালেদা জিয়া সরকারের পতনের পর সোনাগাজী থানার ভৈরব চৌধুরী বাজারে শোকরানা মিছিলে ছাত্রদলের কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে শিবিরকর্মী ফজলুল হক, নিশান, জাহিদ, নাছির সহ দশজন আহত

হয়। শিবিরকর্মী ফজলুল হকের মাথায় ৭/৮টি সেলাই দিতে হয়।

৪ঠা এপ্রিল ৮৯ইং, মিরশ্বরাই থেকে সোনাগাজী আসার পথে ছাত্রলীগের হামলায় শিবির নেতা আফতাব উদ্দিন ও আইনুল কবির মারাত্মকভাবে আহত হয়।

২৮ই এপ্রিল'১০, সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়ন সভাপতি মোহাম্মদ ওমর ফারুক সাংগঠনিক কাজ করতে গেলে কয়েকজন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী তাকে ডেকে নিয়ে শিবিরের কার্যক্রম, দায়িত্বশীল ও কর্মীদের নাম জানতে চায় এবং তাকে মারতে উদ্ধত হয়। তারপর তাকে আর কোনদিন অত্র এলাকায় সাংগঠনিক কাজ করতে দেখলে হত্যা করবে বলে হুমকি প্রদান করে।

২৯ই জুন'১০, জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ফেনী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিল হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোনাগাজী উপজেলার প্রত্যেক বাজারে মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়, এ আলোকে মিছিল বের করলে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ভাবে অধিকাংশ মিছিলে হামলা করে। বিশেষ করে সোনাগাজী উপজেলার বক্তামুন্সী বাজারে মিছিল শেষে আমাদের ৩ জন ভাইকে মারধর করে ।

২৯ই এপ্রিল'১০ সোনাগাজী উপজেলা বক্তার মুন্সি মাদ্‌রাসায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে আমাদের মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পূর্ব সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানকে ছাত্রদল নামধারী একদল সন্ত্রাসী মারধর করার চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় লোকজন এসে যাওয়ায় তারা চলে যায়। এলাকার লোকজন তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দেয়।

ছাগলনাইয়াঃ

ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজ

১৯৮৭ সালে ছাগলনাইয়া কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি প্রার্থী (মোমিন- নবী পরিষদ) ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে কলেজ ক্যাম্পাসে মারাত্মক আহত হয়। সন্ত্রাসীরা কলেজ রোডে অবস্থিত শিবির অফিসে হামলা চালিয়ে তছনছ করে ফেলে।

১৯৯৩ সালে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ছাগলনাইয়াতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে কলেজে ভর্তিতে সহায়তা করার সময় শিবির কর্মীদের উপর চড়াও হয়। এতে তারা রফিক ভাইকে একা পেয়ে তার পায়ের রগ কেটে দেয়।

১৯৯৩ সালেও একই ঘটনায় ফেনী যাওয়ার পথে শিবির নেতা নিজাম উদ্দিন (পরে জেলা সেক্রেটারী) জামাল উদ্দিন আফগানী সহ বেশ কয়েকজনকে বাঁশপাড়া গ্রামে নিয়ে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা আঘাত করে মারাত্মক আহত করে।

১৯৯৪ সালে ভর্তিকালীন সময়ে ছাগলনাইয়া কলেজে কথা কাটাকাটিকে পুঁজি করে ছাত্রলীগ

www.pathagar.com

ছাগলনাইয়া বাজারে প্রাক্তন শিবির নেতা আবদুল হালিম এর মাথা ফাটিয়ে দেয়। ফেনী যাওয়ার পথে বাঁশপাড়া রাস্তার মাথায় নামিয়ে শাব্বির ভাইকে আহত করে মুমূর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়।

১৯৯৪ সালে ছাগলনাইয়া কলেজে শিবিরের নবীনবরণকে বানচাল করার জন্য এর পূর্ব দিন ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা শিবির অফিসে হামলা করে, এতে শিবির নেতা হারুন-অর-রশীদ খোকন, আবুল আহছান, শরীয়ত উল্লাহ ও ছলিম উল্লাহ সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। শিবির অফিসের কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য তছনছ করে দেয়।

৫ই মার্চ'১০ ছাগলনাইয়া উপজেলার ঘোপাল ইউনিয়নে বিনা উস্কানিতে আমাদের অফিসে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে কোরআন, হাদিস ও ইসলামি সাহিত্য পুড়ে যায় এবং অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

৩রা মে'১০ ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগর ইউনিয়নের একজন সাথী কিশোর কণ্ঠ নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী তাকে আটক করে মারধর করার চেষ্টা করে এবং জিহাদি বই সহ আটক করা হয়েছে বলে পুলিশকে খবর দেয়। পরে স্থানীয় এক শুভাকাংখীর মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হয়।

১৯ই অক্টোবর'১০ ছাগলনাইয়া পৌরসভার উত্তর যশপুর গ্রামে এতেকাফে অবস্থানরত আমাদের কর্মী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও জামায়াতের সিরাজুল ইসলামের সাথে স্থানীয় একজন আওয়ামীলীগ কর্মীর মাঝে শবে কদরের রাত্রিতে সাঈদী সাহেবের মাহফিলের ক্যাসেট মসজিদে চালানো নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জের ধরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদেরকে মসজিদ থেকে এতেক্বাফ অবস্থায় 'সন্দেহভাজন ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে' গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। পরে তারা আদালতের মাধ্যমে জেলহাজাত থেকে জামিনে মুক্তি পায়।

৪ঠা ডিসেম্বর'১২ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আহুত সকাল-সন্ধা হরতাল চলাকালে ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নে পিকেটিং করার সময় ছাত্রশিবিরের সাথী ওসমান গনি,আবদুল্লাহ আল মামুন,নজরুল ইসলাম সিফাত,আবু বক্কর ও নাঈমকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ১৫/২০জন একত্রিত হয়ে চাপাতি, রামদা, রড দিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় হামলা করে। এতে করে ঐ ৫জন মারাত্বক ভাবে আহত হয় এবং আহত অবস্থায় তাদেরকে পুলিশ সোপর্দ করা হয়। পরে পুলিশ যুবলীগ ও ছাত্রলীগকে দিয়ে রেজুমিয়া ব্রীজ ভাঙ্গার নাটক সাজিয়ে তাদের বিরুদ্ধে '১৯৭৪ সালের ১৫(৩) বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করে। এতে ছাত্রশিবির ছাগলনাইয়া উপজেলা সেক্রেটারীসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৭/৮ জনকে আসামী করা হয়। পরে ছাগলনাইয়া অঞ্চল থেকে পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করে তাকে এ মামলায় আসামী করতে থাকে।

পরশুরাম উপজেলাঃ

১৮ই ফেব্রুয়ারী'১৪ উপজেলা নির্বাচনের প্রচারণার মাইকিং করার সময় আওয়ামী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী হেলাল ও রহিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি গ্রুপ শালধর মাদ্রাসা অর্থসম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম জনি, শাখার সেক্রেটারী আবদুল্লাহ ও শাখার কর্মী মোশারফ হোসেন এর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হয়। পরবর্তিতে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়।

www.pathagar.com

২১ই ফেব্রুয়ারী'১৪ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচারণার সময় শাখা শিবির কর্মী মিজান এবং আবুল কাশেম (অপু) এর উপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী সিরাজ এর নেতৃত্বে (৬-৭) জনের একটি গ্রুপ হামলা চালায় এবং তাদের কাছ থেকে ২টি মোবাইল কেড়ে নেয়।

৮ মার্চ' ১০ পরশুরাম উপজেলা শিবিরের মেসে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। তারা মেসে থাকা আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং মেসে থাকা ২টি সাইকেল নিয়ে যায়।

৯ই অক্টোবর'১০ পরশুরাম উপজেলার চিথলিয়া গ্রামে আমাদের দুই জন সাথী অন্য একজন সাথীর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে তাদেরকে স্থানীয় এক দুস্কৃতিকারী মহিলা শ্লীলতাহীনর মিথ্যা অভিযোগে জিম্মি করে। পরে আমাদের স্থানীয় কয়েকজন ভাই তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা চালায়। এতে আমাদের কয়েকজন ভাই আহত হয়। একজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেলেও পরে তাকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় তারা আমাদের ৬ জন সাথী এবং ১জন কর্মীর নামে নারী নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করে। পরবর্তিতে স্থানীয় সমঝোতার মাধ্যমে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

২৪ই অক্টোবর'১২ সকাল ১১ টায় পরশুরাম উপজেলা উত্তর দায়িত্বশীল বৈঠক চলাকালে প্রায় ২৫/৩০জন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী এসে প্রথমে মসজিদের তালা লাগিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ এসে জেলার সাহিত্য সম্পাদক কফিল উদ্দিনসহ ৩৫জনকে থানায় নিয়ে যায়। প্রায় রাত ১টার দিকে ৩০জন নেতা-কর্মীকে ছেড়ে দিলেও পরে পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ১২জনকে আসামী করে ৫ জন রেখে মামলা দায়ের করে। পরে তাদেরকে কোর্টে সোপর্দ করে কারাগারে প্রেরণ করে।

২৩ই ফেব্রুয়ারী'১৪ মনিপুর মাদ্‌রাসার সামনে আমাদের ভাইস চেয়্যারম্যান পদপ্রার্থীর ব্যানার লাগাতে গেলে সাথী আবদুল আজিজ রুবেল ও অন্যান্যদের ছাত্রলীগ ধাওয়া দেয় এবং পরবর্তিতে কতিপয় ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী তাদের তুলে আনতে গেলে গ্রামের মহিলারা তাদেরকে দা-বটি নিয়ে ধাওয়া করলে সেখান থেকে তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।

উপসংহারঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অপপ্রচার যুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া চিরন্তন ও শ্বাশত। এই যুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলা করে করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইদেরকে অগ্নি পরীক্ষায় নিখাদ হতে হয়। অতীতেও যারা হকের কথা বলেছে তাদের কারো রুটি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, কেউ হয়েছিল আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন আবার কারো ছুটে গিয়েছিলো বন্ধু, কারো বা হিতাকাংখী, কারো উপর আসে মারধর, কাউকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় মরুভূমির তপ্ত বালির উপর ইত্যাদি।

কিন্তু তারপরও থেমে থাকেনি বাতিলের মোকাবেলায় হকের আন্দোলন। কারণ এ আন্দোলনের কর্মীরা জানে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে অতঃপর তারা মারে ও মরে।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত নং-১১১)

লেখক : ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক
ফেনী জেলা

www.pathagar.com

শহীদি কাফেলাঃ
খন্ডচিত্রে যাত্রা শুরুর সেই সময়...

১৯৪৬ সাল, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ একটি ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর ২৫ জন ছাত্রের ১টি সভা হয়, তাতে নাসরুল্লাহ খান আজিজ কে প্রধান করে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বৈঠকে তিনটি নাম প্রস্তাব করা হয়। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল আনজুমানে নওজোয়ান ও জমিয়তে তালাবা। বৈঠকে 'জমিয়তে তালাবা' নামটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর সভাপতি নিযুক্ত হন নাসরুল্লাহ খান আজিজ।

১৯৫৬ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) 'ছাত্র সংঘ' নামে খাজা মাহবুব ইলাহীর নেতৃত্বে সংগঠনটি কাজ শুরু করে। স্বাধীনতার পর ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম প্রিয় ছাত্র জনতা ইসলামী ছাত্রমিশন, দিশারী তরুন সংঘ, ঝিঙে ফুলের আসর, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, Young Muslim Association, স্বদেশ শিল্পি গোষ্ঠী প্রভৃতি নামে কাজ চালিয়ে যায়।

ইতিহাসের এমনই এক বাঁকে ঢাকায় অবস্থানরত ছাত্রদের সাথে মত বিনিময় হয়। ১৯৭৩ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার বাইরে খুলনার বয়রায় এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন-

১. জনাব আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ

২. জনাব আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের।

৩. জনাব মীর কাশেম আলী

৪. জনাব মরহুম মাওলানা সামছুল হক

৫. জনাব মাসুদ আলী

৬. জনাব সরদার আব্দুস সালাম

২ রাত ১ দিনের ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ, বৈঠকে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জন্য কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আলী আহসান মো: মুজাহিদ ভাইকে সভাপতি ও মীর কাশেম আলী ভাইকে সেক্রেটারী মনোনিত করা হয়। সভায় সংবিদান প্রণয়নের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ।

www.pathagar.com

ঐ কমিটির যারা সদস্য ছিলেন-

১. জনাব এ কে এম নাজির আহমদ

২. জনাব আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ

৩. জনাব আ.ন.ম আব্দুজ জাহের

৪. জনাব মীর কাশেম আলী

৫. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান

১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার লক্ষীবাজারে জনাব আ.ন.ম. আব্দুল জাহের এর সভাপতিত্বে ও মীর কাশেম আলীর পরিচালনায় ২২১ জন সাবেক ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত সাধারন ছাত্রদের কাছে পৌছানোর জন্য একটি ছাত্র সংগঠনের আত্মপ্রকাশের দাবী বিবেচিত হয়। ঐ সংগঠনের নাম রাখা হয় ইসলামী ছাত্রশিবির এবং সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব মীর কাশেম আলী ও সেক্রেটারী মনোনীত হন জনাব ড. মু. আব্দুল বারী।

১৯৭৬ সালের ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৬ সালের ঐ বৈঠকে সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রশ্ন আসে সংগঠনের নাম কী হবে? একেকজন একেক প্রস্তাব রাখলেন। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ প্রস্তাব করলেন 'জাতীয় ছাত্রশিবির' নামটি। এভাবে বাংলাদেশ ছাত্রশিবির, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, ইসলামী ছাত্রশক্তি সহ বিভিন্ন নামের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অবশেষে সিদ্দিক জামাল ভাই প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির' নামটি গৃহীত হয়।

শহীদি কাফেলার নাম নির্ধারনের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মীর কাশেম আলী বলেন "কার্যকরী পরিষদের বৈঠক চলছে। আলোচনার বিষয়বস্তু সংগঠনের নাম কী হবে? বিভিন্ন নামের প্রস্তাব আসছে। ইসলামী ছাত্রসমাজ, ইসলামী মজলিস, ইসলামী ছাত্র ফেডারেশন, আরো হরেক রকমের নাম। ভাই সিদ্দিক জামাল প্রস্তাব দিলেন ইসলামী ছাত্রশিবির। অনেকে হেসে উড়িয়ে দিলেন, এ কেমন নাম। শিবির তো হয় সেনাবাহিনী বা এ জাতীয় যুদ্ধরত কোন বাহিনীর জন্য। ছাত্র সংগঠনের নাম কি করে ইসলামী ছাত্রশিবির হয়। তাই প্রাথমিক বাছাইতে বাদ পড়লো 'ইসলামী ছাত্রশিবির'।বাকী নাম নিয়ে শুরু হলো তুমুল আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। কোন ক্রমেই তিনটি নামের ব্যাপারে একমত হওয়া যাচ্ছে না। কারণ কার্যকরী পরিষদ তিনটি নামের প্যানেল পেশ করবে সদস্য সম্মেলনে। সদস্যরাই সম্মিলিত ভাবে এই তিনটি নাম থেকে সংগঠনের নাম চূড়ান্ত করবে। তাই নতুন ভাবে নামের তালিকা প্রনয়ণ করা হলো। শিবিরের নাম দীর্ঘ তালিকার সর্বশেষ নাম হিসাবে লিখা হলো। এভাবে প্রাথমিক বাছাই, দ্বিতীয় বাছাই হতে চূড়ান্ত তালিকায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম স্থান পেল তিন নম্বর-এ। প্রস্তাবিত তালিকা সদস্য সম্মেলনে পেশ করা হলো কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে। তিনটি নামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করার পর সদস্যদের গোপন ব্যালট দেয়া হলো তাদের চূড়ান্ত মতামত দেয়ার জন্য। সদস্যরা তাদের মতামত পেশ করলেন গোপন ব্যালটে। সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদের প্রতিনিধি দল ব্যালটগুলো নিয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গণনা করার জন্য। মসজিদের পবিত্র চত্বরে নাম গণনা করা হলো। গণনায় দেখা গেল সদস্যদের গোপন ব্যালটের রায়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। সংগঠনের নাম ঘোষনা করা হলো 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির'।

আল্লাহ পাক শিবিরের নামটি গ্রহন করলেন আল্লাহর তরুণ সৈনিকদের সংগঠনের জন্য। শিবির আজ গৌরবময় শহীদদের সংগঠন। শিবির আজ ইসলামের বিজয়ী সৈনিকদের গর্বিত সংগঠন।

ইসলামী ছাত্রশিবির আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এ কাফেলার পথচলা এত সহজ ছিল না। যারা এ কাজের সূচনা করেন তারা অনেক ত্যাগের ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। সে সময় পথ চলার জন্য ছিল না অর্থ; ট্রেনের, বাসের অথবা রিক্সার ভাড়ার অভাবে হেঁটে হেঁটে কাজ করতেন দায়িত্বশীলরা। চিঠির মাধ্যমে সংগঠনের দাওয়াত পৌছাতেন। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। যে অর্থ দিয়ে পরিচিতি সহ মৌলিক প্রকাশনা ছাপাতেন এবং বিতরন করতেন।

যাত্রা শুরুর প্রথম ভাগে সংঘটিত দুটি ঘটনা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ ভাইয়ের কলম থেকে উল্লেখ করা হল। যা ভবিষ্যতে আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে-"আন্দোলনের একজন ভাই দেশের বাইরে থেকে আসার কথা। বিমান বন্দরে তাঁকে রিসিভ করতে হবে। তদানিন্তন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বকশিবাজার এলাকায় থাকেন। তার পকেটে মাত্র চার আনা পয়সা। বিমান বন্দরে তার সাথে যারা যাবেন তাদের পকেটেও পয়সা নেই। এ চার আনা পয়সা দিয়ে নাস্তা করলে বিমান বন্দরে যাতায়াত খরচ থাকে না, আবার বিমান বন্দরে গেলে নাস্তা খাওয়া যায় না। খরচ করে ফেললে মেহমানকে নিয়ে আসবে কিভাবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন নাস্তা না খেয়ে বকশিবাজার থেকে হেঁটে বিমান বন্দরে যাবেন। অভূক্ত অবস্থায় তারা হেঁটে হেঁটেই বিমান বন্দরে পৌছলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বিমান আসতে বিলম্ব করল। ফলে অভূক্ত অবস্থায়ই তাদেরকে মেহমানের জন্য অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে মেহমান আসলেন, মেহমান অবশ্য খুবই বিচক্ষন ছিলেন। তিনি উপস্থিত দায়িত্বশীলদের দেখে বুঝতে পারলেন যে, তারা অভূক্ত। অতঃপর তিনি নিজ খরচে তাদেরকে খাওয়ালেন। এ ঘটনা, তীব্র আর্থিক সংকটেও দায়িত্বপালনে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।"

"১৯৬২-৬৬ এর ঘটনা। তখন অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ কেন্দ্রীয় সভাপতি। সংগঠনের সাথী সংখ্যা ছিল ৩ হাজারেরও অধিক। এ সাথীদের সাথী-বয়স ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত ছিল। অনেকেরই মানের উন্নয়ন হচ্ছিল না। আর মানোন্নয়ন না হলে অবনতির দিকে যাবেই। তাই এ সময়ে মানোন্নয়নের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। তিন হাজারেও অধিক সকল সাথীর সাথীপদ বাতিল করা হয়। সকলকে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়, নির্দিষ্ট মানে পৌঁছার জন্য। ঐ সময়ের মধ্যে যারা মানে পৌঁছতে সক্ষম হন তাদেরকেই শুধু সাথী করা হয়। যার সংখ্যা চার শতের অধিক হবেনা। এ পদক্ষেপের ফলে সাথী সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে কয়েক শতকে এসে দাঁড়ায়। পূর্বের তুলনায় কম সংখ্যায় হলেও নতুন সাথীদের মান উন্নত হওয়ার কারণে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়"।

যারা জাহিলিয়াতের আগাছা-পরগাছা কেটে নির্ভেজাল ইসলামী বাগান তৈরী করতে চায়, তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

(সংকলিত)

www.pathagar.com

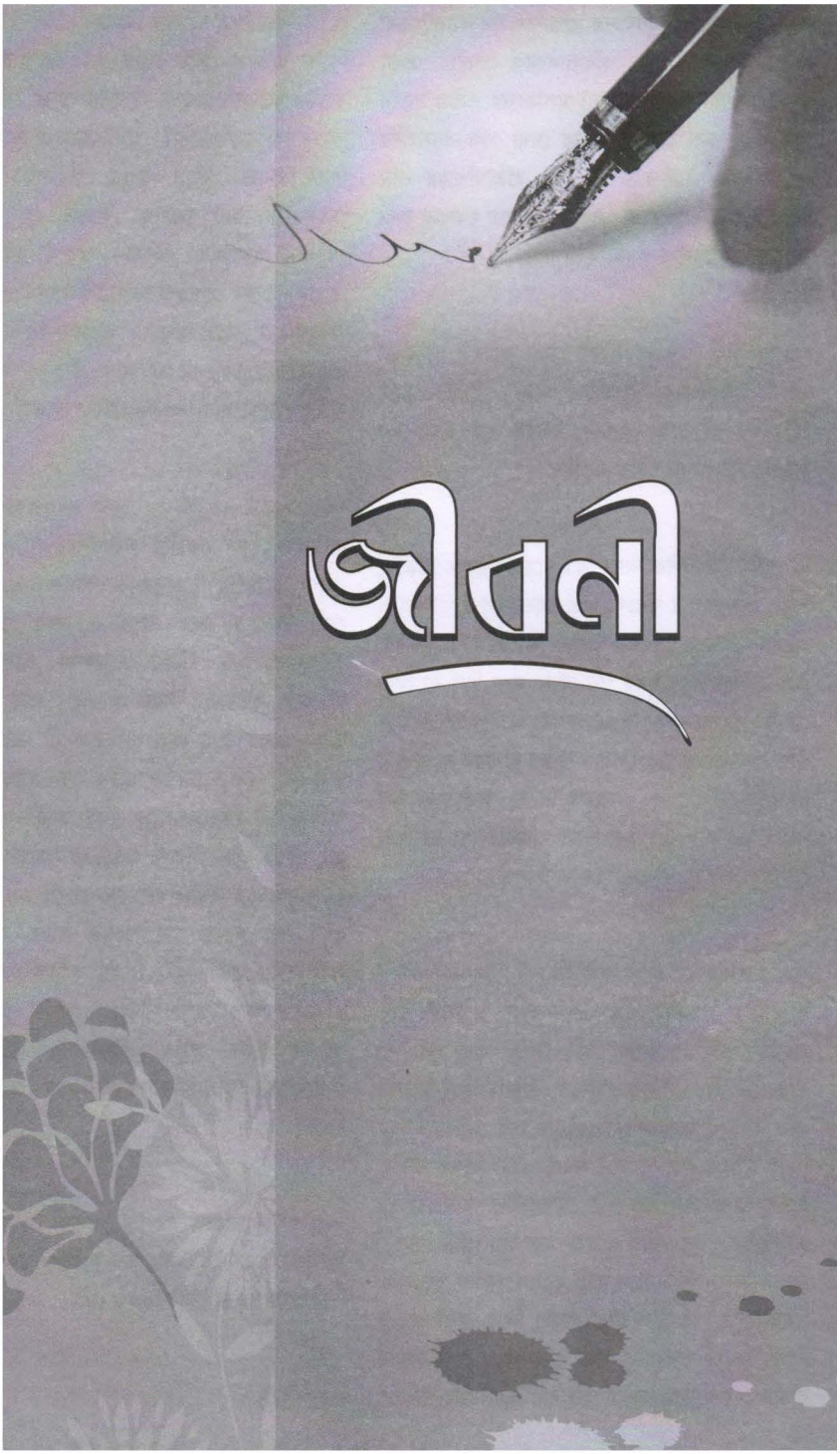

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন

১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাবৃত্তিসহ সম্পন্ন করেন। ১৯৬৪ সালে আমিরাবাদ ফজলুল হক স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম শ্রেনীতে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বি.এস.সি পাশ করেন।১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে এম.এস.সি তে ভর্তি হন। তখন তিনি শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে যুদ্ধকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় এম.এস.সি শেষ করতে পারেন নি। ১৯৭৫ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত শিক্ষা ও গবেষনা ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন সম্পন্ন করেন।

১৯৬৮ সালে বাইশরশি শিবসুন্দরী একাডেমিতে শিক্ষকতা করেন। তখন তিনি রাজেন্দ্র কলেজে বি.এস.সি পড়ছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ (মাস্টার্স করাকালীন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত উদয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালে পিলখানায় অবস্থিত বি.ডি.আর সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কর্মজীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ঃ আব্দুল কাদের মোল্লা

(৩ ভাই ও ৬ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়)

পিতা ঃ মো সানাউল্লাহ মোল্লা

দাদা ঃ আবু মোল্লা

জন্ম ঃ ১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার জরিপের ডঙ্গী গ্রামে।

ঠিকানা ঃ গ্রাম- আমিরাবাদ; ইউ/পি-ভাষানচর; থানা-সদরপুর, জেলা-ফরিদপুর।

পরিবার ঃ দুই ছেলে ও চার মেয়ে।

রাজনৈতিক জীবন

অষ্টম শ্রেনীতে পড়াকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ডিগ্রি ১ম বর্ষে পড়াকালীন সময়ে ছাত্রসংঘে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে শহীদুল্লাহ হল ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী

www.pathagar.com

নিয়োজিত হন। ১৯৮৭ সালে ঢাকা মহানগর জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৯১-১৯৯৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় জামায়াতের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন।

সাংবাদিকতা

১৯৮০ সালে দৈনিক সংগ্রামের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৮১ সালে দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। ১৯৭৯-৮০ সালে তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৮২ ও ১৯৮৪ সালে পরপর দুবার ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন।

জেলজীবন

সংগ্রামী এই মানুষটি জীবনে অনেকবার জেলে ছিলেন। সর্বশেষ ২০১০ সালে জেলে যান। ৩ বছর ৫ মাস জেলে ছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগ মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। ৫ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কর্তৃক পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশ করার পর ১০ ডিসেম্বর রিভিউ আবেদন করার প্রেক্ষিতে ফাঁসির আদেশ স্থগিত করা হয়। ১২ ডিসেম্বর রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

শাহাদাত

২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১০.০১ মিনিটে সরকার ভীত হয়ে তড়িঘড়ি করে বিশ্বের ও স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঐতিহাসিক উক্তি ও নসিহত

"কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের এক ব্যক্তি নয়। আমার আত্মা কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদবে আর কসাই কাদের তখন কিয়ামত পর্যন্ত অট্টহাসি দেবে"।

"এই বিচারকরা বিচারকে কলংকিত করেছে। এরা সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে। একদিন কোরআনের আইন অনুযায়ী আমি এদের বিরুদ্ধে মামলা করব সেদিন এদের হাত পা কথা বলবে" (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

"মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু শাহাদাতের দরজা খোলা রেখেছেন। যতদিন ইসলামী আন্দোলনের পথে শাহাদাতের ঘটনা ঘটবে ততদিন ইসলামী আন্দোলন বেগবান হবে। আল্লাহ যাদেরকে চান, তাদেরকেই শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

www.pathagar.com

আমি যদি মহান আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হই, সেটাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা। সুতরাং মৃত্যুদন্ডের ভয়ে আমি ভীত নই। সম্পূর্ন মিথ্যা ও সাজানো অভিযোগে দুনিয়ার আদালত আমাকে শাস্তি প্রদান করে পরকালের আদালতে আমার ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সার্টিফিকেট দিয়েছে।

(শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

"আমি আজীবন শহীদি মৃত্যু কামনা করেছি। আব্দুল কাদের মোল্লা কোন অপরাধ করেনি। তোমরা নিশ্চিত থাকো তার মাথা উঁচু ছিল, উঁচুই থাকবে। তোমরা কখনও আমার চোখে পানি দেখবে না। ইনশাআল্লাহ...

আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধেই আমাকে হত্যা করা হচ্ছে। শাহাদাতের মৃত্যু সকলের নসীবে হয় না। আল্লাহ তা'আলা যাকে শহীদি মৃত্যু দেন সে সৌভাগ্যবান। আমি শহীদি মৃত্যুর অধিকারী হলে তা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমার প্রতি ফোটা রক্ত ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করবে এবং জালিমের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই। আমি দেশের ভবিষ্যত ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে চিন্তিত।" (১০ ডিসেম্বর ২০১৩)

"আমি আমার জানা মতে কোন অন্যায় করিনি। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিনি, কখনো করব না। দুনিয়ার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। জীবনের মালিক আল্লাহ। কিভাবে আমার মৃত্যু হবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন।"

"আমার শাহাদাতের পর যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা চরম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আমার রক্তকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লাগায়।"

(১২ ডিসেম্বর ২০১৩)

দূর্গম পথের ক্লান্তি
ছিল তবু থামেনি খিজির,
সমর শহীদে থামবেনা তুমি,
তুমি সাহসী শিবির।

www.pathagar.com

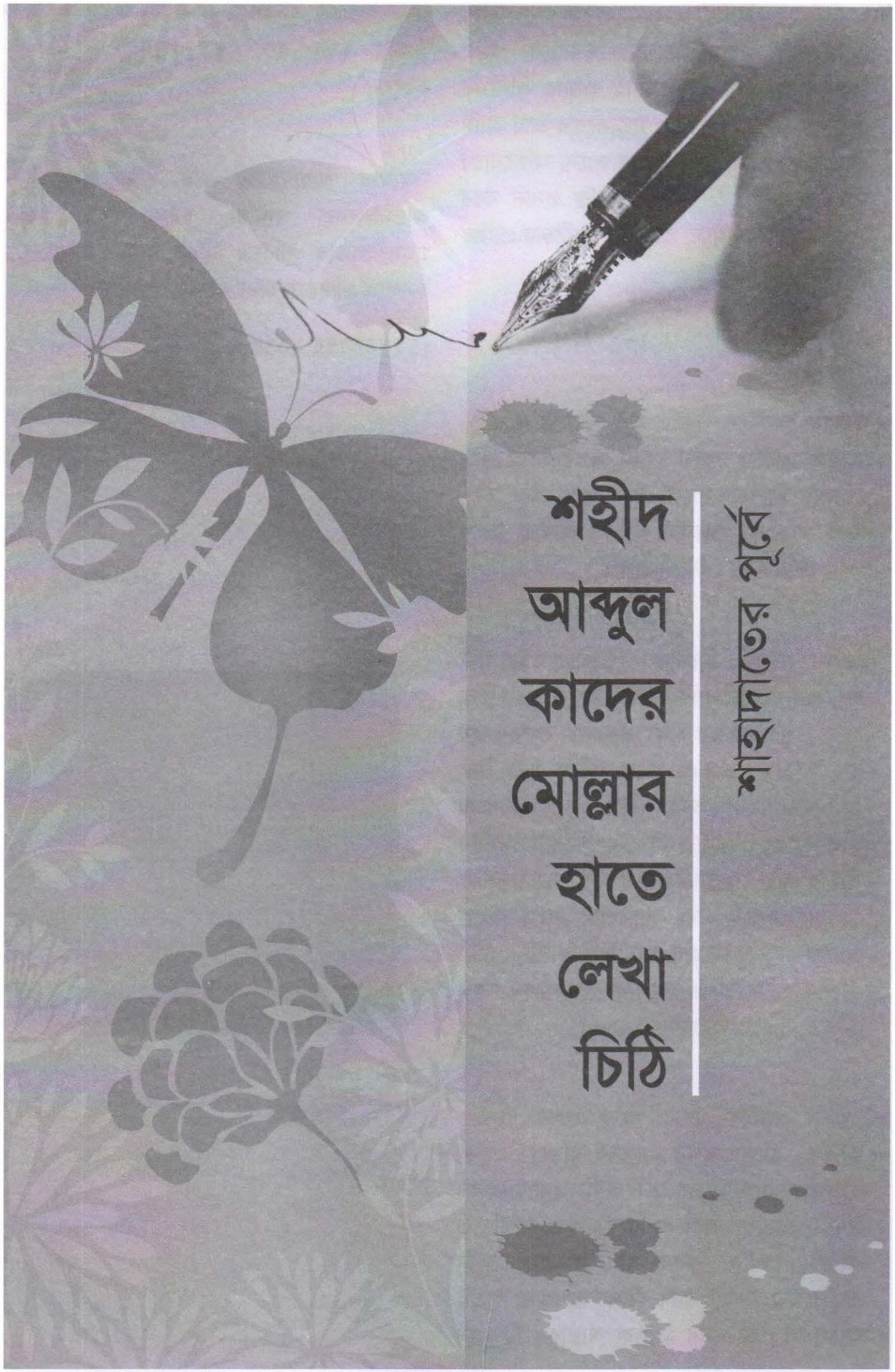

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার হাতে লেখা চিঠি

শাহাদাতের পূর্বে

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির প্রসঙ্গ।

প্রিয়তমা জীবনসাথী মেহেরী,

- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
খবর শুনলাম, রায় প্রকাশিত হওয়ার পর খুব সময়ে ছাত্রলীগ-এর আসামীদের গ্রেফতারের আদেশ পৌঁছানোর আগেই হয়তো সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারে। এতটুকুই লিখছি।

- সরকারের সম্ভবতঃ কোন সময়। তাই কোন সময় তারা এই রায় কার্যকর দ্রুত করে ফেলার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তারা বিভিন্ন বিষয়কেও গ্রহণ করবে না। যদি করত তাহলে তাদের রায়ের কোন পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়ার দৃষ্টিতে কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও আমরা যদি নিজেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইনসাফ-বিরোধী তার সিদ্ধান্ত কার্যকরণে তাহলে ভিন্ন কথা। তবে আল্লাহর ... চিন্তার নিয়মানুযায়ী ...

এসিভিটি-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

না। অনেক নেতাকেও যে গ্রেফতার
করেছে তা শুনছি। [illegible] বঙ্গবন্ধুকে
কবীর (সঃ) এবং মাহবুবুল(?) সেখানে এমনকি
আইনের মাহাত্ম্যও [illegible] মতেও নিষ্ঠু-
রভাবে হত্যা করেছে। [illegible] অবশ্য
ঐ সময় আক্রান্তে যাঁরা [illegible] মত
এর ইসলামী বিপ্লবী দলের [illegible] প্রচার
করেছেন। আমার ক্ষোভ আমরাও
কি করেছি তা কে জানে উত্তর
নেই।

অনেককাল থেকে, অবরুদ্ধ-শক্তির মুক্তির
জন্য এসে আত্মদানী [illegible] [illegible] মাহমুদ
দেন নাই E ইসলামের [illegible] এককালের
চাকরও দিয়েছেন। এবং সর্বত্র [illegible]
জামায়াত শিবিরের, অবশ্য আমাদের [illegible]
দেখিয়েছেন। এত সুস্পষ্ট
যে জামায়াত এবং শিবির [illegible]
এবং বিদ্রোহ দমনের প্রতি বাক্যহারা-
[illegible] সম্পর্কিত। আমি যে ভোরের
থেকেই বসে আছি, আমাদের বিরুদ্ধে
অন্যায় কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে, এবং

www.pathagar.com

~~[illegible]~~
সবাই খুঁজছে তাদের এখনো বহুর। আত্মত্যাগী
তাঁদের এখন ভুলে গেলে চলবে না। কারণ
তাঁরা ত্যাগের কারণে আত্মসম্মানের বিনিময়ে
এদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে।

আমাদের নীতি-নৈতিকতা প্রসঙ্গে কথা বলব। আমাদের সব তরুণদের সামনে ~~[illegible]~~ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ~~[illegible]~~ যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে এবং আমাদের দেশের সেরা সব সম্পদগুলোই সহজভাবে অন্যায় ভাবে সহযোগিতা করছে তার সকল মানুষ নীতি নৈতিকতার আর কোনদিন ~~[illegible]~~ বিচারবুদ্ধি সবই বোধহয় বাংলাদেশের ভুলিয়ে অতীত আবহাওয়া ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করেছে- সেই উন্নতির ~~[illegible]~~ তারা দেশপ্রেমিক বলে বিচারে ~~[illegible]~~ আসামী অর্থাৎ এদেশবাসী দেখে ~~[illegible]~~ তারা কোনো রকমই সমর্থন নয়, তবে একটি আবেদন যে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ যে ~~[illegible]~~ অন্যায়ভাবে মুক্তি- যোদ্ধাদের দেখা হয়েছে, তা কখনো সম্ভব

এসিপ্রিল ভেট

www.pathagar.com

হবেন সেই আশংকায় না। আন্তর্জাতিক
মৈত্রী থাকুক এবং স্বাধীন-সার্বভৌম সম্ভব না।
হবে প্রীতি এবং দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী
মানুষ অবশ্যই বাঁচবে এবং আমার-
মৃত্যু শুধু বাংলাদেশ সরকারের ভারতের কারণে
হবে- ইসলামী আন্দোলনের অবসানের-
নিয়ত মাত্র ইনশা আল্লাহ।

● কালকে সুখ-আর-শান্তি- ১৭ থেকে
২৪ তারিখ- আমার সাক্ষাত। ৯৩ নং
আমাকে পবিত্র কারাগারের সেলে এবং
শহীদের পাশে পাক ঘুমানোর চাইতে
আশা-ও শহীদদের ~~[illegible]~~ জেহাদ-
কারীদের মর্যাদায় অর্থাৎ (জানি, অর্থাৎ
স্বাভাবিক মৃত্যুর চাইতে অন্যায়ের
বিরুদ্ধে আল্লাহর দেয়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার
প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইসলামী প্রতিষ্ঠার জেহাদে
মৃত্যুবরণ কারীদের ~~[illegible]~~ আল্লাহর পাক
অতি উচ্চ মর্যাদার কথা আল্লাহ পাক
উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই
আমাকে ~~[illegible]~~ শাহাদাতের মর্যাদা
অবশ্যই দান করবেন তাই দোয়া করো আমার

www.pathagar.com

এমন মুহূর্তে আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। কারণ বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসাও মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে কাম্য নিয়েছি।

* মন্তব্য: ২০১৬ সালে মিসরের কায়রোয় আমার ভাইকে নারীর সাইরেন কবুল, যা যাকাতের সময় খাটেমাই উদ্দেশ্যে দেখানো দিয়েছিলেন। "ইসলামী খাদিজাহ প্রিন্স করীমের" নামের প্রিন্সেস- তিনি সিলেটের জন্য সুবিধা। প্রথমটির জন্য মুসলমানদের সোসাইটি আমার সাথে যোগ হওয়ার সময়ের জন্য সাদা-ম্রিয়মানতা এ ঘটনা যে এই সমাজের জন্য পারে। আমাদের হাত প্রতিষ্ঠানের জন্য দিয়েছি। এবার আমাদের হাত তাও নিয়েছি আমার এক ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কাজের জন্য জন্য কার্যকর হবে তাহলে প্রতিদিন [illegible]

[illegible]

ভাইরোসিড

রাসূলে করীম (সা:) বারবার- ঘোষিত হ
বারবার শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে
~~[struck]~~ যারা শহীদ হবেন, আল্লাহ তাঁদ
বিনা হিসাবে জান্নাত এবং শাহাদাতের মর্যাদা
দিবেন। আল্লাহর পথে মৃত্যু, মুহাম্মদ (সা:)
এর পথে মৃত্যু। ~~এ~~ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের
অবকাশ রাখে না।

● এখন যদি সিদ্ধান্ত ~~[struck]~~ কার্যকর হও-
য়ার পর ইসলাম কোন আদর্শ হিসাবে
কোন মূল্য নাও দিতে পারে। যদি-
ও ঘৃণ্য যে ইসলাম ইহুদীদের সমর্থিত
এবং জাতীয় ঘোষণায় প্রণয়ন
হবে। ~~[struck]~~ আমার উপলব্ধির
বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ যদি ঘোষণার
শহীদ হতে চাও, ইসলাম আমাদের-
জাতীয় প্রধানতম দেশ থাকে। তাদের
অবশ্যই খবর দেয়া হবে।

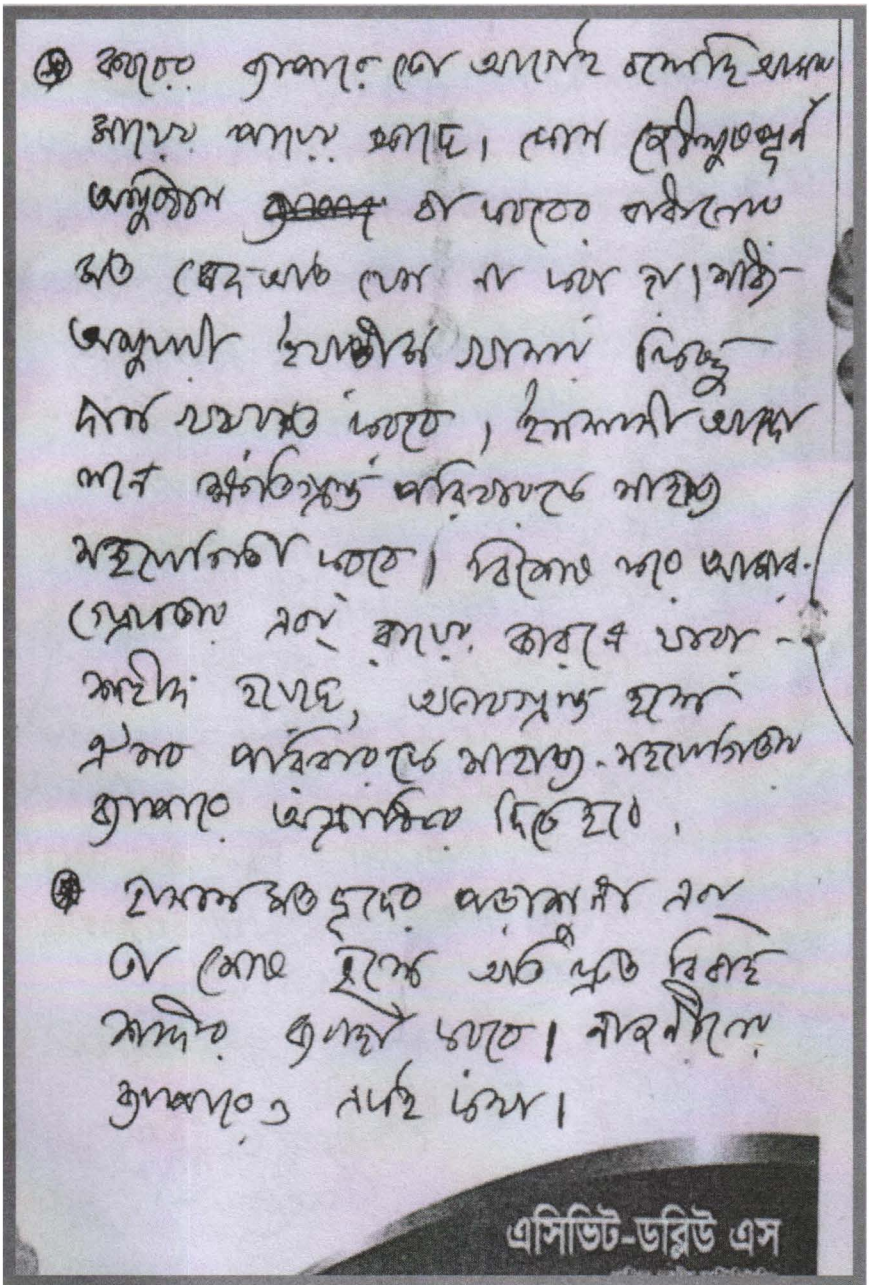

⊛ কাজেই প্রত্যাশা যে আমাদের দেশের মানুষ আমার সোনার বাংলা। যেখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ~~[illegible]~~ এর মাধ্যমে নবীনদের মত ভেদ-ভাব দূর না করা হয়। জাতি-ধর্মের ইতিহাসের মাধ্যমে নিজস্ব দেশ সম্পর্কে জানবে, ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির পরিবেশের মাধ্যমে মহানবীর হবে। বিশেষ করে আমার প্রত্যাশা এবং আমার কাছে যারা শহীদ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে যাদের এমন পরিবেশের মাধ্যমে মহানবীর প্রতি সম্মান দিতে হবে।

⊛ ইসলাম ও ইসলামের ওতপ্রোত এবং যে দেশে ইসলাম এত দ্রুত বিস্তার লাভের প্রচার হয়েছে। নবীনদের প্রচারও করতে হবে।

এসিভিটি-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

* সোনামণি, হে সোনামণি
তোমাদের জন্য দুনিয়াবী সম্পদ রেখে
আমার কষ্ট লাগছে, আল্লাহর
কাছে শুকরিয়া আমার আমলগুলো কবুল
করে দিও। তোমার জন্য বিশেষভাবে
দোয়া করছি যদি ইনশাআল্লাহ কবুল
আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ
স্বীকার করো, আল্লাহ তোমাদের
সাথে তোমার মিলিত হওয়ার
তৌফিক দেন। এখন তুমি ছোট
কাল, যত পার দুনিয়ার সম্পর্কে
জ্ঞান অর্জন করো আল্লাহ আমার
নিয়ে আল্লাহ ও রাসূল
করীম (স:) এর সম্পর্ক দিয়ে আমার
সম্পর্ক সৃষ্টি করে নেও।
ইনশাআল্লাহ জান্নাতে মিলিত
হবো।

তোমাদের প্রিয়
দাদাভাই

[illegible]

www.pathagar.com

একটি ফুটন্ত গোলাপের অকালে ঝরে পড়াঃ কিছু বেদনা-বিধুর স্মৃতি

মোঃ জাহেদ হোসাইন

একদিন পর দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের প্রচারাভিযান প্রায় শেষের দিকে। তবে বাড়ছে টান টান উত্তেজনা। মাগরিবের নামাজ জামায়াতে আদায় করে কুমিল্লা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন শুভাকাংখীসহ কথা বলছিলাম। পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠলো। হাতে নিয়ে দেখি পরিচিত নাম্বার । নাম্বারটা মোবাইলের কল লিষ্টে সেইভ করা আছে। রিসিভ করতেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর । একটু ঘাবড়ে গেলাম। প্রথমে ওপাশ থেকে আসা কথাগুলো অস্পষ্ট মনে হলো । কিন্তু বুঝতে দেরী হলো না। খবরটা শুনার সাথে সাথে কলিজার ভিতরটায় কেউ যেন খামছে ধরলো। মুহুর্তেই মুখটা মলিন হয়ে গেলো। আমার পাশে দাঁড়ানো ভাইটি জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, কি হলো"?

ঃ সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান ভাই মোটর সাইকেল এক্সিডেন্ট করেছেন।

ঃ তো এখন ?

ঃ পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছে। তারাই আমাকে ফোন করেছে।

আমি কাল বিলম্ব না করে ওখানকার দায়িত্বশীলদেরকে খবরটা দিলাম এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললাম। এদিকে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে খবর নিতে লাগলাম দূর্ঘটনা কতটুকু মারাত্মক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার যর্থাথ চিকিৎসা হবে কিনা ইত্যাদি। অবশেষে সিদ্ধান্ত দিলাম ফেনী নিয়ে আসতে। কিছুক্ষনের মধ্যে ভাইকে ফেনীর প্রাইভেট হাসপাতাল কসমোপলিটন হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। সি এন জি থেকে ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহটি হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ঢুকানো হল। দেখলাম ভাইয়ের বাম পায়ের উরুর অংশে মারাত্মক ব্যথা পেয়েছেন। ধারনা করলাম সেটির হাড় ভেঙ্গে গেছে। নাকে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছেন এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। ডাক্তার জানালেন, যেহেতু মাথায় কোন আঘাত পাননি এবং বমি করেননি এমতাবস্থায় আমরা আজকে রাত এখানে পর্যবেক্ষনে রাখতে পারি। আমি সায় দিলাম। এক্স-রে করার পর যখন দেখলাম ভাইয়ের উরুর হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং নাকের নরম হাড় ভেঙ্গে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়েছে,আমি চিন্তা করলাম আজকে রাত এখানে থাকলেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠিয়ে দিবো।

এদিকে উন্নত চিকিৎসা করার জন্য ঢাকা নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করলে ডাক্তার আমাকে জানালেন, "উনার পা অপারেশনের পূর্বে আপাতত আমরা এখানে সাধারন প্লাষ্টার করে দিই। পরে আপনারা যখনই ঢাকায় নিয়ে যান সমস্যা নেই"। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং ক্ষতস্থান

www.pathagar.com

থেকে প্রচুর রক্তক্ষরন হচ্ছে দেখে ডাক্তার বললেন এক ব্যাগ রক্তের ব্যবস্থা করতে। মুহূর্তেই কয়েক ব্যাগ রক্তের ব্যবস্থা করা হলো। আমি ছিলাম অপারেশন থিয়াটারের বাহিরে। কে একজন খবর দিলেন ভাই আপনাকে ডাক্তার খোঁজ করেছেন। দ্রুত অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে দেখি ভাই বমি করেছেন। ডাক্তার গালিব ভাই ও কিছুটা উদ্বিগ্ন। আমাকে বললেন, "ভাই আমার মনে হয় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না"। আমি সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম ভাইকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়ার। তখন রাত প্রায় ১টা। জেলা সেক্রেটারী মোজাম্মেল হোসেন ভাইকে ফোন দিলাম ,ভাই তাড়াতাড়ি কিছু টাকাসহ ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে হাসপাতালের দিকে আসুন। ইতিমধ্যে ঢাকা যাওয়ার জন্য ১টা এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করলাম। ঢাকা পাঠিয়ে দেয়ার কথা শুনে মুস্তাফিজ ভাইয়ের বোন, ভগ্নিপতি ও চাচা সবাই তাকে এক নজর দেখতে আসলো। উনারা কি জানতেন এটাই তাঁর সাথে শেষ দেখা? রাত প্রায় ২টার দিকে এ্যাম্বুলেন্স ছাড়ল ঢাকার উদ্দেশ্যে। সাথে জেলা সেক্রেটারী ছাড়াও মুস্তাফিজ ভাইয়ের বোন, ভগ্নিপতি ছিলেন। কিছুটা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করছিলাম এ

এক নজরে শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান

নাম ঃ মুস্তাফিজুর রহমান
পিতা ঃ মৌলভী আবু তাহের (মৃত)
মাতা ঃ হোসনেয়ারা বেগম
ভাই বোন ঃ ২ ভাই ৩ বোন
ভাই বোনদের মধ্যে অবস্থান ঃ সবার ছোট
স্থায়ী ঠিকানা ঃ বাড়ী-মৌলভী আকতারুজ্জামান সাহেবের বাড়ী
গ্রাম+পোষ্ট অফিস ঃ স্বরাজপুর
থানা ঃ সোনাগাজী
জেলা ঃ ফেনী
সাংগঠনিক মান ঃ সদস্য
সর্বশেষ দায়িত্ব ঃ সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি

পড়া লেখা ঃ সম্মান ২য় বর্ষ ,ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী।
আহত হওয়ার স্থান ঃ শুক্কুরের দোকানের সামনে (সোনাগাজী থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে)
আঘাতের ধরণ ঃ বাম পায়ের উরুর হাড় ভেঙ্গে যায় এবং নাকে প্রচন্ড আঘাত পান।
আহত হওয়ার তারিখ ঃ ২৫/০২/১৪ সন্ধ্যা ৬টা
শাহাদাতের তারিখ ঃ ২৮/০২/১৪ ভোর ৫টা, ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ঢাকা।
কৃতিত্ব ঃ দাখিল পরীক্ষায় গোল্ডেন জি.পি.এ ৫ অর্জন করেছেন।
বিশেষ উক্তি ঃ প্রায় সময় তার আম্মাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন "আম্মা আপনি কি চান না আপনার ২ ছেলের মধ্যে একজন শহীদ হোক, আপনি শহীদের মায়ের মর্যাদা পান"।

www.pathagar.com

ভেবে যে, ভাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠাতে পারলাম। জেলা সাহিত্য সম্পাদক ওসমান গনি আরিফ ভাই ও জেলা স্কুল সম্পাদক ওমর ফারুক ভাই সহ বাসায় ফিরলাম। ভাইয়ের আশু সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করলাম। ফজরের পর যখন মোজাম্মেল ভাইকে ফোন দিলাম তখন তিনি বললেন, "আমরা সবে মাত্র হাসপাতালে ঢুকছি। সকাল ৮টায় আবার খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম উনার মাথার সি.টি স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু কোন সমস্যা ধরা পড়েনি। এ কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

পরদিন ফেনী সদর উপজেলা নির্বাচন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন শহর জামায়াতের সেক্রেটারী আ.ন.ম. আবদুর রহিম ভাই। সকাল ১০ টার দিকে প্রার্থীর সাথে একটা নির্বাচনী জরুরী মিটিং ছিল । ঐ মিটিংয়ে জেলা শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কাজ দেয়া হয়েছিল আমাকে। সারাদিন সে কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আর ফাঁকে ফাঁকে মুস্তাফিজ ভাইর চিকিৎসার খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। এ ভাবে সারাদিন কেটে গেল। পরদিন যথারীতি ভোট গ্রহন আরম্ভ হলো। সকালে বাসা থেকে বের হবার আগেই বিভিন্ন দিক থেকে খবর আসতে লাগলো আমাদের প্রার্থীর এজেন্টদের কোথাও কোথাও কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। কোথাও কোথাও এজেন্টরা ঢুকলেও হুমকি ধামকি দিয়ে আর মার ধর করে তাদেরকে কেন্দ্রে থেকে বের করে দেয়া হচ্ছিল। সাধারন ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে না পারে সে জন্য পূর্বেই সরকার দলীয় ক্যাডাররা অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রের আশপাশে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। চতুর্দিক থেকে খোঁজ খবর নিয়ে যখন দারুল ইসলাম ভবন সংলগ্ন জামায়াতের শহর অফিসে স্থাপিত আবদুর রহীম ভাইয়ের নির্বাচনী অফিসে গেলাম তখন দেখলাম সেখানে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ কে এম শামসুদ্দিন সাহেব সহ জেলা জামায়াতের একাধিক দায়িত্বশীল এবং শহর আমীরসহ শহর জামায়াতের প্রায় সকল দায়িত্বশীল উপস্থিত আছেন । ততক্ষনে সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে ।এ পরিস্থিতিতে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী জেলা বিএনপির সাথে পরামর্শ করে বেলা ১১.৩০ টার দিকে নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেন।

এ দিকে ফাঁকে ফাঁকে মোজাম্মেল ভাইকে ফোন দিয়ে বার বার মুস্তাফিজ ভাইয়ের চিকিৎসার খোজ খবর নিচ্ছি। মোজাম্মেল ভাই জানালেন মুস্তাফিজ ভাইয়ের অবস্থা ভাল আছে এবং মাঝে মাঝে মুস্তাফিজ ভাই তাদের সাথে কথাও বলছেন। বেলা ৩.০০ টার দিকে মোজাম্মেল ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বললেন মুস্তাফিজ ভাই আপনার সাথে কথা বলতে চান। আমি বললাম উনি অসুস্থ কথা বলার দরকার কি? মোজাম্মেল ভাই বললেন আমিও নিষেধ করেছি। কিন্তু উনি বার বার চাচ্ছেন আপনার সাথে কথা বলতে, আমি বললাম ঠিক আছে, উনাকে দিন। মুস্তাফিজ ভাই প্রথমে আমাকে সালাম দিয়ে জানতে চাইলেন আমি কেমন আছি? আমি সালামের উত্তর দিয়ে বললাম, ভাই আমি ভাল আছি। আপনি অসুস্থ তাই আপনাকে আমি ফোন করছিনা। মোজাম্মেল ভাইকে ফোন করে আপনার খোঁজ খবর নিচ্ছি।

www.pathagar.com

এরপর মুস্তাফিজ ভাই যা বললেন তা আজও আমার কানে বাজে ....

ঃ ভাই আমার শাখাটার খোঁজ খবর নিয়েন।

ঃ কি বলেন ভাই, আপনার শাখার খোঁজ খবর সব সময় আমি নিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

ঃ ভাই আমার হেদায়েত ভাইকে (শাখা সেক্রেটারী) একটু ফোন দিয়েন, তার খোঁজ খবর নিয়েন।

ঃ আপনি এতো চিন্তা করবেন না ভাই, আমি সার্বক্ষনিক তাদের খোঁজ খবর রাখছি। আজকে দিনে হেদায়েত ভাইর সাথে অন্তত তিন-চার বার কথা হয়েছে। আপনার সাথে আর বেশী কথা বলবোনা। আপনি আগে সুস্থ হোন তারপর আপনার সাথে সব কথা বলা যাবে। এই বলে আমি ফোন রেখে দিলাম। নিয়তির নির্মম পরিহাস, কে জানতো এটাই আমার ভাইয়ের সাথে আমার শেষ কথা।

সম্ভবত মুস্তাফিজ ভাইয়ের জানা হয়ে গিয়েছিল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তাই তিনি অসুস্থ থেকেও আমার সাথে তার সর্বশেষ কথাগুলো বলে গেলেন ।

নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা থেকে ফেনী এসেছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সভাপতি জনাব রাশেদুল হাসান রানা ভাই। বিকালে উনার সাথে এলাকায় গিয়েছিলাম। সন্ধার পর ফেনী আসলাম। রাত ১০ টার পর শহর জামায়াতের সেক্রেটারী ও নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আ.ন.ম আব্দুর রহীম ভাইয়ের সাথে দেখা হলে উনি আমাদের তার বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেকক্ষন ধরে নির্বাচনে সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ, তাদের পেটুয়া বাহিনী ও পুলিশলীগ দিয়ে সাধারন ভোটারদের হয়রানি, আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভোট ডাকাতির মোকাবেলায় বিএনপির দূর্বলতা ও নমনীয়তা, সার্বিক বিষয়ে সাধারন ভোটারদের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত প্রায় ১২ টা। রাতের খাবার শেষ করে রাশেদুল হাসান রানা ভাইকে বিদায় দিয়ে প্রায় ১টার দিকে যখন বাসায় যাচ্ছি তখনো স্মৃতিতে মুস্তাফিজ ভাইয়ের কথা ভেসে উঠছে। ভাইয়ের কষ্টের বিষয়টা চিন্তা করছি। কারণ ইতিপূর্বে নিজেও একাধিক বার মটর সাইকেল এক্সিডেন্ট করার কারনে এটার কষ্টকর অভিজ্ঞতা আমার মনে আছে।

রাতে ঘুমানোর আগে মোজাম্মেল ভাইকে ফোন দিয়ে আবার খোঁজ নিলাম। মোজাম্মেল ভাই আমাকে জানালেন রাতে মুস্তাফিজ ভাইয়ের প্রচন্ড জ্বর এসেছে। আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাস করলাম

ঃ কি ব্যাপার, জ্বর কেন আসলো? ডাক্তার দেখাননি? ডাক্তার কি বলেছেন?

ঃ ডাক্তার দেখে গিয়েছেন এবং জ্বর কমার ঔষধ দিয়েছেন।

ভোর পাচঁটার দিকে মোজাম্মেল ভাই আবার ফোন দিয়ে জানালেন মুস্তাফিজ ভাইয়ের জ্বর আরও বেড়ে গিয়েছে এবং নিঃশ্বাস ঘন ঘন নিচ্ছেন আর মুস্তাফিজ ভাইকে আইসিইউতে নেয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে মনের মধ্যে একটা তীব্র চাপ অনুভব করলাম। মনে হল ঘাড়ের রগটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটা মানসিক ব্যাকুলতার মধ্যে মোজাম্মেল ভাইর ফোন পাওয়ার জন্য সময় অতিবাহিত করতে লাগলাম। কিছুক্ষন পর মোজাম্মেল ভাই ফোন দিলেন। ফোনে যা জানালেন সে অপ্রত্যাশিত,

www.pathagar.com

অনাকাঙ্খিত ও দুঃখজনক সংবাদ শুনার জন্য আমার কান মোটেও প্রস্তুত ছিলনা। ওপাশ থেকে মোজাম্মেল ভাই ভাঙ্গা গলায় জানালেন,

ঃ জাহেদ ভাই আমাদের মুস্তাফিজ ভাই আর নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি...

ঃ কি বলছেন মোজাম্মেল ভাই, এটা কিভাবে সম্ভব! ঐদিক থেকে মোজাম্মেল ভাই আর কথা বলতে পারছেন না। আমারও নীরবে অশ্রু কপোল গড়িয়ে পড়ার টেবিলে পড়ল। নিজের মনকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে আমার মুস্তাফিজ ভাই আর নেই। তাঁর স্মৃতি গুলো মনে করে কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। কতো সহজ ভাবে ভাইটা আমার সাথে মিশেছিল। দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হলে কতো বকা-ঝকা করেছি। কাজ আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছি। একটা সংকটপূর্ণ ময়দানে তাকে দায়িত্ব দিয়েছি। কিন্তু কখনো এতটুকু নালিশ করেননি । প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে আমাকে একবার করে ফোন দিতেন। কোন দিন ফোন দিতে না পারলে পরদিন আবার ফোন করে অনুযোগের সুরে বলতেন "ভাই আপনি বোধ হয় আমাকে ভুলে গেছেন"। আমি সান্তনা দিতাম। নিজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখাতাম। নিজের কানে শুনা কথা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। প্রতিদিন একবার করে ফোন করে ভাই বলে কে খোঁজ নিবে? একথা গুলো ভাবতে ভাবতে নোনা জলের দরিয়া যেন আমার দু-চোখে আছড়ে পড়লো। আবেগ সংবরণ করে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। কেন্দ্রীয় সংগঠন, এখানকার জামায়াতে ইসলামী ও সাবেক ভাইদের কে খবরটা জানালাম। স্থানীয় সংগঠন ও জেলা জামায়াতের সাথে পরামর্শ করে জানাযার স্থান নির্ধারন করা হল মুস্তাফিজ ভাইদের বাড়ির দরজা। সে দিন ছিল জু'মা বার। আমি, জেলা দপ্তর সম্পাদক কফিল উদ্দিন ভাই ও জেলা সাংস্কৃতিক সম্পাদক জানে আলম ভাই সহ বেলা প্রায় ১১.৩০টার দিকে যখন মুস্তাফিজ ভাইয়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে নামলাম তখন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করলাম। নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাকে দেখেছি তার চোখেই পানি। শোকের বিহবলতায় অনেকটা আনমনা হয়ে যখন মুস্তাফিজ ভাইদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম তখন তার বড় দুলা ভাই বেলায়েত হোসেন ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে যখন বললেন, "ভাই আমার ছোট ভাইকে কোথায় রেখে এসেছেন। আমার ছোট ভাই কই"? বাধঁ ভাঙ্গা জোয়ারের মত চোখের পানি আর আটকাতে পারলাম না। কতক্ষন এভাবে অশ্রু গড়িয়েছে জানিনা। আবার বেলায়েত ভাইয়ের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়েছি। জু'মার নামাযের সময় হচ্ছে। এ দিকে কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা সম্পাদক জনাব মু. মহি উদ্দিন ভাই জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য ঢাকা থেকে ফেনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। জানাযার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বাদ আসর তথা বিকাল ৫টা। মুস্তাফিজ ভাইয়ের মরদেহ ঢাকা থেকে তার বাড়িতে আনা হচ্ছে। মুস্তাফিজ ভাইয়ের ইন্তেকালের খবর শুনে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত শোকাহত সাথীদের তাদের পুরাতন বাড়ীতে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জু'মার আগে ওনারা খাবার গ্রহনের জন্য তাড়া দিলেন। আমি দেখলাম শোকে মুহ্যমান এ ভাইয়েরা খাবার গ্রহন করার জন্য একজনও এগুচ্ছেনা। তখন বুকের কষ্ট বুকে চাপায়ে রেখে আমিই আগে গেলাম এবং বাকী ভাইয়েরা আমাকে অনুসরণ করলেন। খাবার টেবিলে বসেও চোখের পানি আটকানোর বৃথা চেষ্টা করলাম এবং খাচ্ছি এরকম অভিনয় করলাম। খাবারের আনুষ্ঠানি-

www.pathagar.com

কতা শেষ করে যখন জু'মার নামায পড়ার জন্য মুস্তাফিজ ভাইর বাড়ির দরজায় চিরচেনা মসজিদে প্রবেশ করলাম। মুস্তাফিজ ভাই কতদিন এ মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে জু'মার খুৎবাহ পড়েছেন। মুস্তাফিজ ভাই জু'মার দিন যখনি ঐ মসজিদে উপস্থিত হতেন মসজিদের বয়োবৃদ্ধ ইমাম সাহেব খুৎবাহ এবং নামাযের দায়িত্ব মুস্তাফিজ ভাইয়ের উপর ছেড়ে দিতেন। খুৎবাহ শেষে কাতার সোজা করে যখন নামাযের জন্য দাড়ালাম এ্যম্বুলেন্স এর হর্ন শুনে বুঝতে পারলাম মুস্তাফিজ ভাইয়ের মরদেহ বাড়ীতে পৌঁছেছে। নামায শেষ করে ইমাম সাহেব যখন দোয়ার জন্য হাত তুললেন তখন পিনপতন নীরবতার মধ্যে উপস্থিত মুসল্লিদের হু হু করে কান্নার চিৎকার শুনে বুঝতে পারলাম আমার মুস্তাফিজ ভাই দলমত নির্বিশেষে সমাজের এ সাধারন মানুষগুলোর নিকট কত প্রিয়ভাজন ছিলেন। নামায শেষ করে ভগ্ন হৃদয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যখন মুস্তাফিজ ভাইদের ঘরের সামনে গেলাম তখন দেখলাম ঘরের সামনে রাখা মুস্তাফিজ ভাই'র মৃতদেহ ঘিরে মানুষের ভীড়। সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার শব্দে পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠলো। এ করুণ দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম।পকেটে রাখা টিস্যু নিয়ে বার বার চোখ মুছে আবেগের গভীরতা লুকিয়ে জনশক্তিদের বুঝানোর চেষ্টা করছি আমি খুব বেশী আবেগ আপ্লুত হইনি। কিন্তু মুস্তাফিজ ভাইর চেহারাটা একবার দেখার জন্য তার মরদেহের সামনে যেতে পারছিনা । গতকাল ও যার সাথে কথা হয়েছে, ভেবেছি সুস্থ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন । আন্দোলনের কাজে আবারও সদা চঞ্চল ও প্রাণসঞ্চারী ভূমিকা পালন করবেন। সে মুস্তাফিজ ভাইয়ের নিথর দেহের সামনে - যে হাসি মাখা মুখে এক চিলতে হাসি উপহার দিয়ে বলতেন ভাইয়া কেমন আছেন? - আজ কিভাবে আমি স্থির হয়ে দাঁড়াবো।

> তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু"। তিনি আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "শাহাদাতের তামান্না যদি কেউ লালন করেন আর এমতাবস্থায় তিনি বিছানায় শুয়ে ইন্তেকাল করেন তবুও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে"। তিনি আরো বলেন, "মুস্তাফিজুর রহমান ভাই সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করলেও তিনি শহীদ হয়েছেন। কারণ তিনি মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত শাহাদাতের তামান্না বুকে ধারণ করে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আনুগত্যের যে শপথ গ্রহণ করেছেন সে শপথের উপর আমৃত্যু টিকে ছিলেন "।

বেলা যত গড়াচ্ছে মুস্তাফিজ ভাইকে এক নজর দেখার জন্য, তার জানযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আগত লোকের সংখ্যা ততই বাড়ছে। আসরের নামাযের পূর্বেই জানাযার নির্ধারিত স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। আগত মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যের কারনে মুস্তাফিজ ভাইদের বাড়ির সামনের জামে মসজিদে চার দফায় আসর নামায আদায় করতে হয়েছে। সালাতুল আসর আদায়ের পর যথারীতি জানাযা পূর্ব সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশ পরিচালনা

www.pathagar.com

করেছেন জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ফখরুদ্দীন। জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা, জেলা জামায়াতের আমীর এ কে এম নাযেম ওসমানী ও সেক্রেটারী এ কে এম শামছুদ্দীন সহ সাবেক জেলা সভাপতিদের অনেকে। মাইকে আমার নাম ঘোষণা করে মুস্তাফিজ ভাইয়ের জীবনের উপর কিছু বলার জন্য বলা হলো। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন দেখলাম জানাযায় যেন মানুষের ঢল নেমেছে। কয়েক হাজার শোকাহত মানুষের করুণ চাহনির দিকে তাকিয়ে মনে হলো তারা যেন আর্তনাদ করছে, হে আল্লাহ তুমি আমাদের মাঝ থেকে মুস্তাফিজ ভাইকে কেন এত তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলে। শত সহস্র সাথীদের চোখের পানি আর কান্নার গোঙানীর শব্দ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করলো। ভাঙ্গা গলায় কিছু কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এরপর শহর সভাপতি তারেক মাহমুদ, ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা ভাই'র বক্তব্যের পর কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন ভাই বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু"। তিনি আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "শাহাদাতের তামান্না যদি কেউ লালন করেন আর এমতাবস্থায় তিনি বিছানায় শুয়ে ইন্তেকাল করেন তবুও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে"। তিনি আরো বলেন, "মুস্তাফিজুর রহমান ভাই সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করলেও তিনি শহীদ হয়েছেন। কারণ তিনি মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত শাহাদাতের তামান্না বুকে ধারণ করে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আনুগত্যের যে শপথ গ্রহণ করেছেন সে শপথের উপর আমৃত্যু টিকে ছিলেন "। জানাযার নামাযের ইমামতি করেন জেলা জামায়াতের আমীর এ কে এম নাযেম ওসমানী। জানাযা শেষে মুস্তাফিজ ভাইয়ের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁর আব্বার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

যেমন দেখেছি শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান ভাইকে ঃ-

প্রথম দেখা ও পরিচয়ঃ

২০১২ সাল । আমি তখন ফেনী শহর শাখার সেক্রেটারী । সে বছরের মাঝামাঝিতে কোন একদিন সোনাগাজী যাওয়ার পথে ডাকবাংলা নামক স্থানে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গেলে দেখলাম কয়েকজন মাঝারি বয়সের তরুণ একসাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমাকে দেখে একজন এগিয়ে এসে মুচকি হেসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাইয়া কেমন আছেন"? ইতিপূর্বে তাকে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়নি। তবে ধারণা করলাম উনি এখানকার দায়িত্বশীল। সালামের উত্তর দিয়ে পরিচয় জানতে চাইলে বললেন তিনি সোনাগাজী পশ্চিম সাথী শাখার সভাপতি । এরপর আর সেদিন বেশি কথা বলার সুযোগ হয়নি। তারপর আর দীর্ঘ দিন দেখা হয়নি।

মতের কোরবানীর ক্ষেত্রে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনঃ-

২০১৩ সালের ২২শে জানুয়ারী আমার উপর জেলা সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। শপথ গ্রহণের পরেই থানা ও সাথী শাখাগুলোর সেটআপ এর বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সদস্য বৈঠক ডাকা হয়। সদস্য বৈঠকে সোনাগাজী পশ্চিম সাথী শাখার সভাপতি হিসেবে মুস্তাফিজুর রহমান ভাইর নাম পাশ হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি হিসেবে সদস্য বৈঠকে যাকে চিন্তা করা হয়েছিল একটা বিশেষ কারণে উনাকে ওখানে সেটআপ করা যায়নি। এ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে জরুরী সেক্রেটারীয়েট বৈঠক আহবান করলাম। সেক্রেটারীয়েট বৈঠকে পরামর্শ হলো মুস্তাফিজ ভাইকে সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি করার। যথারীতি সাথী শাখার সেটআপ প্রোগ্রামে গিয়ে তাকে আল হেলাল একাডেমীর মসজিদে নিয়ে গিয়ে যখন বিষয়টা খুলে বললাম এবং তাকে নিয়ে আমাদের চিন্তার কথা জানালাম, তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। ছলছল করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করলেন। তার অবস্থা দেখে আমি নিজেও সে দিন অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। সংগঠনের একটি সংকট মুহূর্তে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে মতের কোরবানীর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নিজের মতের উপর সংগঠনের সিদ্ধান্তকে যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সে দিন থেকে তার উপর আমার আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তি অনেক মজবুত হয়ে যায়।

দায়িত্ব পালনে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ঃ

সোনাগাজী সাথী শাখায় দীর্ঘ দিন যাবত আমরা অনেকগুলো সংকট মোকাবেলা করছিলাম। বিশেষ করে ময়দান থেকে যোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিক রিক্রুটমেন্ট না থাকা। ময়দানের বিশাল ভৌগলিক এলাকার তুলনায় মানের জনশক্তি কম থাকা । শাখার আভ্যন্তরীন জান্নাতি পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম থাকা। উপরোক্ত সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা করার পাশাপাশি জেলার যে কোন দাবী এবং চাহিদা পূরণে মুস্তাফিজ ভাই'র ভূমিকা মাঝে মধ্যে আমাকে অভিভূত করতো। যে কোন দায়িত্ব বা কাজ দিতাম তা পালনে অনীহা তো দূরের কথা টু শব্দটি পর্যন্ত করেছেন আমার মনে পড়েনা। মাঝে মাঝে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতাম, আমার এই ভাইটা এত ভাল কেন?

অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঃ-

রাসূল (সাঃ) বলেন "দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি ও অনাসক্ত হও তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে"। অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান ভাই । তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে গর্ব-অহংকারের লেশ মাত্র ছিলনা।

সকল কষ্ট নিজের ভিতর রাখতেন ঃ-

২০১৩ সাল ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে তীব্র আন্দোলনের বছর। কেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়তই হরতাল, অবরোধ, মিছিল আর বিক্ষোভের কর্মসূচী ছিল ধারাবাহিকভাবে। আর এ সমস্ত কর্মসূচী যথার্থভাবে পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মুরুব্বী সংগঠন কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করতেন। একদিকে জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য চাপ অন্যদিকে স্থানীয় মুরুব্বী সংগঠনের সীমাবদ্ধতা আরোপের প্রেক্ষাপটে যে মানসিক কষ্ট পেতেন তার অভিযোগ কখনো করতেন না। সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করে উভয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

একদিন সোনাগাজী সাথী শাখা সফর করে ফেরার মুহূর্তে শাখা সেক্রেটারী হেদায়েত উল্লাহ ভাই আমাকে বললেন ভাইয়ের (মুস্তাফিজ ভাই) শরীরের কি অবস্থা হয়েছে একটু দেখবেন কিনা?

www.pathagar.com

আমি বললাম কেন কি হয়েছে? মুস্তাফিজ ভাইর নিকট প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলাম। তিনি কিছুতেই আমাকে ঘটনা খুলে বললেন না। পরে আমি জানতে পারলাম রাতে বাসায় পুলিশ এসেছিল মুস্তাফিজ ভাইকে গ্রেপ্তার করতে। মুস্তাফিজ ভাই যে বাসায় থাকতেন সেটি ইটের তৈরী টিনশেড ঘর। নিরাপদে সরার জন্য ঐ বাসার পিছনে কোন দরজা ছিলনা। তাই পুলিশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি বাসার ছাদ সংলগ্ন যে বেড়া (দমদমা) ছিল তার ফাঁক দিয়ে বহু কষ্টে পাশের একটি হিন্দু বাসায় আশ্রয় নেন। ঐ বেড়ার ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময় পিঠে এবং বুকে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন। কিন্তু কষ্ট নিজের ভিতর রেখেছেন, কখনো আমাদেরকে জানতে দেননি।

অনুপম সামাজিক গুনাবলী ঃ-

সব ধরনের মানুষের সাথে মুস্তাফিজ ভাই'র সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি রাজনৈতিক মত পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে শত্রু-বন্ধু সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন। এ পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদিস মনে পড়লো, হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ,"হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিকৃষ্ট হল সে ব্যক্তি যার অভদ্র ও অশোভন আচরণ হতে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে। (বুখারী)

দায়িত্ব পালনে পেরেশানী ঃ-

এ গুনটি মুস্তাফিজ ভাইয়ের মাঝে ছিল চোখে পড়ার মতো। কিসে আন্দোলনের উন্নতি হবে, সংগঠনের সমৃদ্ধি আসবে সে চিন্তার বাইরে দুনিয়াবী কোন চিন্তা তার ভিতর দেখা যায়নি। যে দিন সন্ধ্যায় তিনি এক্সিডেন্ট করেছেন সে দিন ও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে তার আম্মা খুব অসুস্থ । শাখার কাজ শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করে আম্মাকে দেখার জন্য বাড়ীতে যাওয়ার পথে সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হন। মাকে তো আর এক নজর দেখতে পারলেন না। এই জনম দুঃখীনি মাকে আজ কে সান্তনা দিবে আমরা জানি না।

মৃত্য যন্ত্রনা ছিলনা ঃ-

আপন মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দয়াময় মালিক তাদের শাহাদাতের আঘাতকে ব্যথাহীন করে দেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, শাহাদাত লাভ কারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল তারা ততটুকুই অনুভব করে। (তিরমিযী)

মুস্তাফিজ ভাই'র ক্ষেত্রে এ হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখেছি। সড়ক দূর্ঘটনার পর তাকে যখন হাসপাতালে আনা হয়,তখনো তার নিত্য দিনের মতোই হাস্যজ্জল চেহারা ছিল। আঘাতের স্থান নির্ধারণের জন্য তাঁর হাত পা বার বার নাড়া চড়া করে দেখা হচ্ছে। এক্স-রে করার জন্য তাকে এপিঠ-ওপিঠ, চিৎ করে কাৎ করে শোয়ানো হচ্ছে তারপরও মনো হলো ওনার কিছুই হয়নি। ব্যথার কোন অনুভূতি তার চেহারায় পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এক্সরের ফিল্মে যখন দেখলাম তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে পরস্পর স্থানচ্যুত হয়ে গেলো, তখন অবাক লাগলো আমার কাছে। এত বড় মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পরও ভাইয়ের ব্যথার অনুভূতি কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। জরুরী বিভাগের

www.pathagar.com

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে যখন তাকে হাসপাতালের বেডে আনা হলো মারাত্মক জখম নিয়েও সবার সাথে কথা বলছেন। রাত তখন প্রায় ১০:৩০ টা। মুস্তাফিজ ভাইর এক্সিডেন্টের খবর শুনে যারা তাকে দেখতে এসেছিলো তারা প্রায় সকলে ততক্ষণে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। আমি জরুরী বিভাগের কাজ শেষ করে বিভিন্ন ডাক্তারের সাথে তার চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করে মুস্তাফিজ ভাই যে বেডে আছেন তার অদুরে চেয়ার টেনে বসলাম। নিজেও একদিকে চিন্তিত অন্যদিকে ক্লান্ত। দেখলাম মুস্তাফিজ ভাই'র চোখ দুটি বন্ধ। ভাবলাম ঘুমাচ্ছেন। নাকে তার প্লাষ্টার করা, ঠোঁট এবং মুখ কিছুটা ফুলে গেছে। সম্ভবত আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইয়া কেমন আছেন? আমি অবাক হলাম। এত কষ্টের মাঝেও ভাই নিত্যদিনের মতই আমার খোঁজ নিচ্ছেন। এ স্মৃতি গুলো মনে পড়লে আজও অশ্রুতে দু'চোখের কোণ ভিজে যায়।

চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান

জানাযা শেষ করে যখন ফেনী আসার উদ্দেশ্য গাড়িতে উঠলাম তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলামনা। চোখের পানি যেন কোন বাধা মানছেনা। নিজেকে কিছুটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করলাম। মুহূর্তেই যেন হারিয়ে গেলাম মুস্তাফিজ ভাইয়ের মাঝে। ভাবলাম আমার এত ভাল দায়িত্বশীলটাকে আল্লাহ কেন এত তাড়াতাড়ি তার কাছে নিয়ে গেল? একটি ফুটন্ত গোলাপ কেন এত তাড়াতাড়ি ঝরে গেল? আসলে বাগানের ঐ ফুলটাকে মালিক বেশি পছন্দ করেন, যার সুগন্ধ একটু বেশি। শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান ভাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের ফুল হিসেবে কবুল করেছেন বিধায় তার মাঝে অনেকগুলো অনুকরণীয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তার জীবনীর উপর স্মৃতি চারণ করে একটা লেখা লিখার জন্য বার বার চেষ্টা করেও যেন শেষ করতে পারছিলাম না। এত অল্প বয়সে মুস্তাফিজ ভাই আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন যেন আজও বিশ্বাস হয় না। মাঝে মধ্যে মনে হয় যেন ভাই আবার ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন, ভাইয়া কেমন আছেন? কিন্তু না, পৃথিবীর অমোঘ নিয়মের কাছে, জীবন মৃত্যুর দূর্গেয় রহস্যের কাছে আমাদের সে আবেগ শুধু অর্থহীন নয় বরং উপহাস তুল্য।তার স্মৃতির উপর লিখতে গিয়ে একাধিকবার চোখের পানিতে কাগজ ভিজিয়েছি। এখনো তার শূন্যতা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। মনে হয় সোনাগাজীর ইসলামী আন্দোলন একজন যোগ্য দায়িত্বশীলকে হারালো। জানিনা কবে এ শূন্যতা পূরণ হবে । মুস্তাফিজ ভাই'র ইন্তেকালের পর অসংখ্যবার তার বৃদ্ধ মাকে দেখতে গিয়েছি। বুঝেছি সন্তানের জন্য কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখের পানি সব শুকিয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিন আমাকে

www.pathagar.com

ফোন করেন। ফোন করেই বলেন, বাবা আমার মানিক (মুস্তাফিজ) কই? এ কথা শুনার পর নিজের আবেগ সংবরণ করতে আজও কষ্ট হয়। উনাকে সান্তনা দেয়ার কোন ভাষা খুঁজে পাইনা। মুস্তাফিজ ভাই'র ২০/২২ বছরের মধ্যে অল্প ক'টা দিন তাকে কাছ থেকে উপলব্দি করার সুযোগ পেয়েছি, তার দায়িত্বশীল থাকার সুবাদে। তাকে যেমন দেখেছি তার পুরোটা এই স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। তার জীবনী থেকে যা লিখতে পেরেছি তার তুলনায় যা লিখতে পারিনি তার পরিমান বেশী। পিতামাতার কাছে যেমন তার সন্তানের দূর্বলতা সাধারণত গোপন থাকেনা তেমনি দায়িত্বশীলের নিকট তার জনশক্তির দূর্বলতা গোপন থাকেনা। কিন্তু মুস্তাফিজ ভাইর ব্যাপারটা ভিন্ন। যে কয়টা দিন তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তার কাছে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি।

সত্যবাদিতা, তাকওয়া, আমানতদারীতা ইত্যাদি ছিল তার চরিত্রের ভূষন। সর্বোপরি সকল মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারা, সকলকে মূল্যায়ণ করতে জানা, মানুষের হক আদায়ের প্রতি সচেতন থাকা, মানুষকে খাইয়ে নিজে তৃপ্তি পাওয়া এগুলো ছিল তার জীবনের অংশ। এতগুলো সদগুণাবলীর পাশাপাশি যে আল্লাহর এই জমিনে তার দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে আল্লাহর জান্নাত তো তার জন্যই অপেক্ষমান। হে আল্লাহ তুমি আমাদের মুস্তাফিজ ভাই'র জীবনের সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু হিসেবে কবুল কর। তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান কর। (আমিন)

পরিবারের অনুভূতি

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
শহীদ মোস্তাফিজুর রহমানের বড় দুলা ভাই

আমার প্রিয় ছোট ভাই (শ্যালক) দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক। সোনাগাজী সাথী শাখার সংগ্রামী সভাপতি শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান। আজ আর দুনিয়াতে নেই। এই কথা যখন মনে পড়ে তখর যেন বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। সকলের অতি আদরের মোস্তাফিজ লেখা পড়ায় যেমন ছিল মনযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে ছিল আরো বেশি ত্যাগী। দুনিয়ার কোন রক্ত চক্ষু তাকে এক মূহুর্তের জন্যেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দান থেকে পিছু হঠাতে পারেনি। সে ছিল সদা হাস্যোজ্জ্বল ও ধৈর্য্যশীল। ২৫ই ফেব্রুয়ারী'১৪ মাগরিবের নামাযের পর প্রোগ্রাম শেষ করে আসার পথে মটর সাইকেল এক্সিডেন্ট করে। এক্সিডেন্ট হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগে আমি হাসপাতালে পৌঁছি। তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে তখন থেকে দুই দিন তার সাথে সার্বক্ষণিক ছিলাম। সে বুঝে ছিল যদিও বেঁচে থাকি পা হারাতে হবে। কিন্তু কোন কষ্ট তার চেহারায় আমি দেখিনি, সে ছিল স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল। হাসপাতালে দেখতে আশা সকলের সাথে সে কথা বলতো। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ সুস্থ মানুষের মত উঠে, বসে তার বোনকে বলতেছে, "আপু কিসের ঘুম যাচ্ছেন, উঠুন নামাজ পড়ুন, আমি ঘুমিয়ে যাচ্ছি"। এই ঘুম যে আর কখনো ভাঙবেনা তার আপু হয়তো বুঝতে পারেনি। আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুস্তাফিজকে শহীদ হিসাবে কবুল করেন এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

লেখক
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ফেনী জেলা

www.pathagar.com

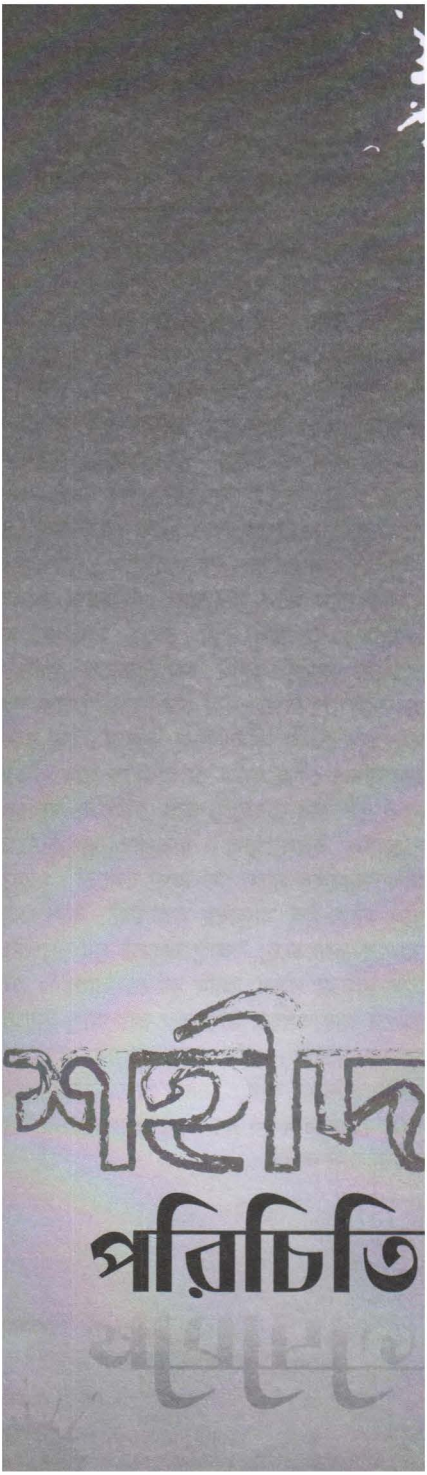

www.pathagar.com

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

পূর্ণনাম	ঃ	আবু জাফর মুহাম্মদ মনসুর (জাফর জাহাঙ্গীর)
পিতা	ঃ	মৃত মুঃ আবুল বাশার
মাতা	ঃ	আনোয়ারা বেগম
ভাই-বোন	ঃ	দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
জন্ম	ঃ	১৯শে জানুয়ারি ১৯৬৩ সাল।
সাংগঠনিক মান	ঃ	সাথী

ঠিকানা ঃ

গ্রাম	ঃ	লক্ষীপুর
পোষ্ট	ঃ	শান্তিরহাট
থানা	ঃ	ছাগলনাইয়া
জিলা	ঃ	ফেনী
দায়িত্ব	ঃ	চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার ক্রীড়া সম্পাদক ও ক্যাম্পাস বিভাগের সহকারী পরিচালক ছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

এসএসসি	ঃ	প্রথম বিভাগ
শাহাদাতকালে	ঃ	চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের যন্ত্র কৌশল বিভাগের চূড়ান্ত পর্বের ছাত্র ছিলেন।
ঘটনা	ঃ	চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা দেখে খোদাদ্রোহী শক্তির চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়, শুরু হয় সন্ত্রাস। ঘটনার দিন সন্ত্রাসীরা বোমাবাজি ও গুলি ছুঁড়ে। এর প্রতিবাদ করলে জাতীয় ছাত্র সমাজের সন্ত্রাসীদের ষ্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকি উল্লাহর সতেজ দেহ।
শাহাদাত	ঃ	১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সাল।
বিশেষ উক্তি	ঃ	"সেলিম জাহাঙ্গীরের মতো যদি জাফর জাহাঙ্গীরও শহীদ হতো"।

www.pathagar.com

পূর্ণনাম	ঃ	কাজী মু. মোশাররফ হোসেন
পিতা	ঃ	মাষ্টার কাজী সামছুল হুদা
মাতা	ঃ	হোসনে আরা বেগম
ভাই-বোন	ঃ	দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে প্রথম
জন্ম	ঃ	১৯শে জানুয়ারি ১৯৬৩ সাল।
সাংগঠনিক মান	ঃ	কর্মী

ঠিকানা ঃ

গ্রাম	ঃ	জয়পুর
পোষ্ট	ঃ	শুভপুর
থানা	ঃ	ছাগলনাইয়া
জিলা	ঃ	ফেনী

শিক্ষা জীবন ঃ

এসএসসি	ঃ	প্রথম বিভাগ, বল্লবপুর হাইস্কুল
এইচএসসি	ঃ	২য় বিভাগ, ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজ
শাহাদাতকালে	ঃ	২য় বর্ষ (সম্মান) গণিত, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।
ঘটনা	ঃ	শিবির নেতা জিয়াউর রহমান কে ছাত্রলীগ হামলা করে গুরুতর আহত করে। এর প্রতিবাদে মিছিল বের করলে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় ছাত্রলীগের ব্রাশফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন।
শাহাদাত	ঃ	১২ই জানুয়ারি, ১৯৯৩ সাল।

www.pathagar.com

শহীদ একরামুল হক খাঁন

পূর্ণনাম	ঃ	মু. একরামুল হক খাঁন
পিতা	ঃ	মৃত সামছুল হক খাঁন
মাতা	ঃ	হালিমা খাতুন
ভাই-বোন	ঃ	২ ভাই ৫ বোনের মধ্যে ৪র্থ
জন্ম	ঃ	১৯৬৮ সাল
সাংগঠনিক মান	ঃ	সাথী
ঠিকানা ঃ		
গ্রাম	ঃ	সফরপুর
পোষ্ট	ঃ	কুদ্দুস মিয়ার হাট
থানা	ঃ	সোনাগাজী
জেলা	ঃ	ফেনী
শিক্ষা জীবন	ঃ	
এসএসসি	ঃ	২য় বিভাগ
এইচএসসি	ঃ	২য় বিভাগ
বি.এ (অর্নাস)	ঃ	২য় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
শাহাদাতকালে	ঃ	এম.এ ফলপ্রার্থী।
ঘটনা	ঃ	সোনাগাজীর সফরপুর মিয়ার বাজারে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা এক নিরীহ ছাত্রকে আটকিয়ে মারধর করে ও চাঁদা দাবী করে। এর প্রতিবাদ করায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা তার উপর চড়াও হয়। সারা শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে সোনাগাজী হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২ দিন অচেতন অবস্থায় থেকে সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মহান মনিবের দরবারে চলে গেছেন শহীদ একরামুল হক খাঁন।
শাহাদাত	ঃ	৫ ই জুন, ১৯৯৫ সাল।

www.pathagar.com

শহীদ মু. আলাউদ্দীন

পূর্ণনাম	ঃ	মু. আলাউদ্দীন
পিতা	ঃ	মোঃ ছাদেক হোসেন
মাতা	ঃ	হোসনে আরা বেগম
ভাই-বোন	ঃ	১ ভাই ৩ বোনের মধ্যে ২য়
জন্ম	ঃ	৩০ জুন ১৯৭০ ইং
সাংগঠনিক মান	ঃ	সদস্য

ঠিকানা ঃ

গ্রাম	ঃ	পশ্চিম ঘনিয়া মোড়া
পোষ্ট	ঃ	ফুলগাজী
থানা	ঃ	ফুলগাজী
জেলা	ঃ	ফেনী
দায়িত্ব	ঃ	ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রশিক্ষন সম্পাদক।

শিক্ষা জীবন ঃ

এসএসসি	ঃ	১ম বিভাগ
এইচএসসি	ঃ	১ম বিভাগ, হাজী মু. মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম।
শাহাদাতকালে	ঃ	ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন বিভাগে ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
ঘটনা	ঃ	বিনা উস্কানিতে ১৫ ই ডিসেম্বর রাতে বিজয় দিবসের উল্লাসে ও শিবির নিধনের পরিকল্পনায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা গুলি করতে থাকে। এতে করে শিবির নেতা আলাউদ্দীন ছাড়াও শওকত হোসেন তালুকদার ও মঞ্জুরুল কবির শাহাদাত বরণ করেন।
শাহাদাত	ঃ	১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

www.pathagar.com

শহীদ মুঃ গোলাম জাকারিয়া

পূর্ণমান	ঃ	মুঃ গোলাম জাকারিয়া
পিতা	ঃ	আবদুল খালেক মোল্লা
ভাই-বোন	ঃ	চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ৫ম
সাংগঠনিক মান	ঃ	সাথী

ঠিকানা ঃ

গ্রাম	ঃ	শ্রীমদ্দি
পোষ্ট	ঃ	চন্দ্রেরহাট
থানা	ঃ	নোয়াখালী সদর
জিলা	ঃ	নোয়াখালী

শিক্ষা জীবন ঃ

এসএসসি	ঃ	প্রথম বিভাগ, ১৯৯৫ইং
শাহাদাতকালে	ঃ	দাগনভুঁইয়া ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত।
ঘটনা	ঃ	রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দাগনভূঁইয়া থানার সাংগঠনিক মেস থেকে বের হন। ঠিক তখনি ওঁৎ পেতে বসে থাকা ছাত্রদলের বোমা নিক্ষেপে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।
শাহাদাত	ঃ	১৬ই মে ৯৬, রাত ১১:৩০ টা।

www.pathagar.com

পূর্ণনাম	ঃ	হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান
পিতা	ঃ	মাওলানা সুলতান আহমাদ
মাতা	ঃ	ছালেহা খানম
ভাই বোন	ঃ	৩ ভাই ১ বোনের মধ্যে ২য়
সাংগঠনিক মান	ঃ	সাথী

ঠিকানাঃ

গ্রাম	ঃ	উত্তর করইয়া
পোস্ট অফিস	ঃ	কালিকাপুর
থানা	ঃ	ফুলগাজী
জেলা	ঃ	ফেনী
সর্বশেষ দায়িত্ব	ঃ	ওয়ার্ড অর্থ সম্পাদক (সাংগঠনিক)
পড়া লেখা	ঃ	আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ফেনী ।
কৃতিত্ব	ঃ	JDC ও দাখিল টেষ্ট পরীক্ষায় GPA 5 অর্জন করেন।
আহত হওয়ার স্থান	ঃ	ফেনী ট্রাংক রোডস্থ খাজুরিয়া রাস্তার মাথা
আঘাতের ধরণ	ঃ	বুকে গুলি
শাহাদাতের তারিখ	ঃ	১০ ডিসেম্বর ২০১৩, রাত ১০ টা ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাত

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

-নূর মোহাম্মদ

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ইং দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতার দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ক্যাপশনে শাহাদাতের খবর। একটি ছবি আমার চেনা জানার মধ্যে মনে হচ্ছে তবুও স্মরণ হচ্ছে না। বার বার মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। খবরের গর্ভে চোখ বুলাতেই স্মৃতির পাতা খুলে গেল। এক বছর আগের কথা। ১৯৮৫ইং সালের এপ্রিল মাস। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির। বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে যোগ দিলাম। স্থান, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। বিভিন্ন হোস্টেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা আর পলিটেকনিকের টিভি কক্ষকে আমাদের শিক্ষা শিবিরের হলরুম করা হয়েছে। খুবই পরিপাটি ও সুসজ্জিত হলরুম। প্রথম দিন দুপুর বেলার খাবার পরিবেশনের ঘোষণা দিলেন, তৎকালীন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ শাখার সভাপতি (পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সভাপতি) মুহতারাম হামিদ হোসাইন আজাদ। তিনি টি.সি'র খাদ্য বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ঘোষণা অনুযায়ী আমরা বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার শিক্ষার্থীরা প্রথম ব্যাচে খাবার সুযোগ নেই। অপর ভাইদের অগ্রাধিকারের মহড়া চলছে। আমাদের ফাঁকা সময়টা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগালেন নোয়াখালী জেলা সভাপতি হিফজুর রহমান ভাই এবং আমাদের প্রাণ প্রিয় শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর। টি.ভি রুমে আমাদের নিয়ে সংগীত, কৌতুক, বক্তব্য ইত্যাদির আয়োজন করলেন। মঞ্চে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ বসেন তাই মঞ্চে না বসে হিফজুর ভাই ও জাহাঙ্গীর ভাই পাশাপাশি দুটি চেয়ার নিয়ে বসলেন মঞ্চেরই ঈষৎ নিচে। আমার সেদিনের সেই অন্তর চক্ষুর চলচিত্র ধারকযন্ত্র আজ পত্রিকার পাতার পাসপোর্ট সাইজের ছবিকে সত্যায়িত করে নেয়। ইনিই জাফর জাহাঙ্গীর যিনি আজ শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে রাব্বুল আলামিনের দরবারে পৌঁছে গেছেন।

আমি ইসলামী ছাত্রশিবির দাগনভূঁঞা থানা সেক্রেটারী। পত্রিকা পড়ে থানা সভাপতি এ.কে.এম আবু ইউসুফ ভাইসহ এলাম জেলা সভাপতি শাহজাহান সিরাজী ভাইয়ের কাছে। সিরাজী ভাই বললেন- খবর সঠিক, ফেনী জেলার আন্দোলনের কর্মীদের এখন অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। আমার প্রবল বাসনা শহীদের কফিন, জানাজা, শহীদের ছাগলনাইয়ার গ্রামের বাড়ি সবই আজ সাক্ষাৎ করবো। কিন্তু না, থানা সভাপতি বললেন শাহাদাতের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে, দাগনভূঁঞাতে কোন সমস্যা হলে কে দেখবে ? বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হল দাগনভূঁঞায়।

বারবার আমার মন আমাকে প্রশ্ন করছিল কেন এই শাহাদাত ? শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর ভাইকে যেমন দেখেছি এমন হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টভাষী ভাল মানুষগুলোকেও খুন করা হয় ? এর কারণ কি ? উত্তর পেয়ে যাই আল-কুরআন খুলে, 'ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। (সূরা আল বুরুজঃ ৮নং আয়াত)

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর শাহাদাতের আকাংখা

www.pathagar.com

মনে প্রবলভাবে পোষণ করতেন। শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীরের দাফন শেষে রুমমেটদের বলেছিলেন, "সব জাহাঙ্গীর শহীদ হয় অথচ আল্লাহ আমি জাফর জাহাঙ্গীরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন না।" শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী পরিবেশের কারণে মা জাফর জাহাঙ্গীরকে শিবির করতে নিষেধ করলে বলতেন, "শাহাদাত বরণ করলে এদেশে ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে।" আল্লাহপাক সত্যিই জাফর জাহাঙ্গীরের কামনাকে কবুল করে নিলেন। মূলত প্রতিটি ঈমানদারেরই শাহাদাত কাম্য হতে হবে। ঈমান গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য পরম করুনাময়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা। শত সহস্র সমস্যার আবর্তে জড়িত এ পৃথিবীতে সহজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিনা হিসাবে জান্নাত অর্জনের নিশ্চয়তা শাহাদাত। তাঁরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। 'যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত এবং নিজেদের পালনকর্তার নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দিত'। (সূরা আলে ইমরান)

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর সত্যিকার মুজাহিদ ও জ্ঞানী ছিলেন তাই শাহাদাতের প্রবল আকাংখা মনে পোষণ করেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও তাঁর শাহাদাতকে কবুল করেছেন। শহীদের কামনা ছিল, "ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে " তাঁর শাহাদাতের কারণে। এ কথাটিতে এক বিরাট তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। ইসলামী বিপ্লবকে শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে শহীদের খুনের নজরানার বদৌলতে অথচ সেই তিনি দুনিয়াকে ভোগ করার জন্যে দুনিয়াতে থাকবেনা। কতো বড় ত্যাগ। এ ত্যাগের পুরষ্কার তো এমন যা দেখে অন্য সকল ঈমানদারগণ লোভাতুর হবেন। দুনিয়ার সর্বস্ব যিনি একমাত্র আখিরাতের কল্যাণে ত্যাগ করতে পারেন। তিনি কত বড় আল্লাহ প্রেমিক, এটা তাঁর শাহাদাতের আকাংখা থেকেই প্রমাণ মেলে। আল্লাহ তার শাহাদাতের বদলায় দ্বীনের বিজয় দান করুন, তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

লেখক
সাবেক জেলা সেক্রেটারী

মাঝে মাঝে
হৃদয় যুদ্ধের জন্যে
হাহাকার
করে উঠে।
মনে হয়
রক্তই সমাধান,
বারুদেই অন্তিম
তৃপ্তি।
-আল মাহমুদ

www.pathagar.com

শহীদ কাজী মোশাররফঃ যাঁর কাছে আমি ঋণী

মোঃ আসাদুজ্জামান

শহীদ মোঃ মোশাররফ হোসেন। এদেশের ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ৫১ তম শহীদ। কোনদিন ভাবিনি জীবন থেকে সে অতীত হয়ে যাবে। তাঁকে নিয়ে ভাবতে হবে, স্মৃতিচারণ করতে হবে। ছাত্রলীগের ঘাতকদের বুলেটে আজ সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলো।

সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকায় যখন মোশাররফের শাহাদাতের খবর পেলাম, বিশ্বাস হয়নি কিছুই। এখনো বিশ্বাস হয়না মোশাররফকে আর ক্যাম্পাসে দেখবনা, মসজিদের নামাজের সারিতে দেখব না, মিছিলে শ্লোগানে মুখরিত হতে দেখব না, আড্ডায় পাবোনা, কিংবা পড়ার টেবিলে গণিতের মারপ্যাঁচ ঘুচাতে। এখন সে জীবনের সবচেয়ে বড় অংক কষে শহীদ আব্দুল মালেক, আব্দুর রহীম, আবদুল আজীজ, শাব্বির, হামিদ, হাফিজ, সেলিম, জাহাঙ্গীর, ফিরোজ মাহমুদ, কিংবা সাইফুল ইসলাম প্রমূখের সাথে জান্নাতের বাগানে সুবাস ছড়াচ্ছে।

মোশাররফ আমাদের মাঝে নেই- ভাবতে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারিনা। একটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই ঝরে গেল। একটি জীবন আমাদের মাঝ থেকে অকালে হারিয়ে গেল, কিন্তু একটি আশা কোন মতেই ব্যর্থ হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে মোশাররফ সর্বদা শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত থাকতো। তাঁর আশা পূরণ হয়েছে, ব্যর্থ হয়নি।

শহীদ মোশাররফের সাথে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। ছোট ভাই সেলিমের মাধ্যমে বছর দু'এক থেকেই পরিচয়। পরিচয়ের পর থেকে খুব দ্রুত আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়েছি। তার মধ্যে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। যে শক্তিতে আমি নিজেই পরাজিত হয়েছিলাম। মাস খানেক পর কলেজে গেলে তাঁর রুমে (৩৪ সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাস চট্টগ্রাম কলেজ) উঠলাম। রুমমেট আহমদ কবির, মিঠু, খালেক কিংবা তৈয়ব যোবায়ের, জসিম ভাই, ইলিয়াছ ভাই এবং মাঝে মাঝে আমি, এই ছিল (আমার জানা মতে) মোশাররফের ঘনিষ্ঠদের তালিকা। এদের মাঝেই তাঁর সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত, কিংবা ক্যাম্পাস, রাজপথ, শ্লোগান, মিছিল তথা পুরো সময়টাই কেটেছে। পুরো হিসাব দেয়া ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। গণিত (সম্মান) ২য় বর্ষের ছাত্র মোশাররফ আমাদের সবার চেয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। সব সময় শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল। বাতিল শক্তির সাথে সামান্যতম বিষয়েও ছিল আপোষহীন। কলেজ ক্যাম্পাস যখন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত তখনও সে আন্দোলনের কাজে মশগুল থাকতো। সে যখন একা থাকতো প্রায় দেখতাম কোন বিষন্নতা যেন তাঁকে ভর করেছে। ঢাকার ছাত্র রাজনীতি, দেশের রাজনীতি, ইসলামী আন্দেলনের রিসেন্ট খবরাখবর কিংবা ইসলামী সমাজ এর সফলতা নিয়ে নানান প্রশ্ন করতো আমাকে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব উত্তর দিতাম। কিছুদিন পর যখন তার সাথে দেখা হতো তার ঈমানী স্পিরিট এবং সাহস আমাকে প্রচন্ড আলোড়িত করতো। আমার নিজস্ব চেতনা মাঝে মাঝে ভোঁতা হবার পর তার সংস্পর্শে যখন যেতাম,

www.pathagar.com

ক্ষুরধার হয়ে উঠত সবকিছু। মোশাররফ আমার জুনিয়র ছিল বলে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতাম। মোশাররফের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা ভার্সিটির প্রতিকূল পরিবেশে আমাকে অসম্ভব সাহস যুগিয়েছে। সেজন্যে আমি তার কাছে ঋণী।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচন্ড সাধ ছিল তাঁর। সে সমাজে স্বচক্ষে দেখে যেতে না পারলেও মোশাররফ সমাজে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বেগবান করেছে। একধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন "যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দিবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ)

মোশাররফ প্রকৃতই আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে। কারো সাথে তার কোন শত্রুতা ছিলো না। তার অপরাধ ছিলো একটিই, আর তা হচ্ছে তারা সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, যিনি সমগ্র রাজ্যের মালিক"। (সূরা আল-বুরুজ)।

কুরআন ও হাদীসের আলোকেই তিনি শহীদ 'যার বিশ্বাসের ভিত্তি ঈমান, যার নিহত হবার কারণ ইসলাম প্রতিরক্ষা, প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং যার নিহত হবার পথ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। শহীদ মোশাররফ তার ব্যতিক্রম নহে। মোশাররফকে নিয়ে যখন লিখছি সে সময়েই (১৪-০১-৯৩) রাজশাহীতে ইসলামী আন্দোলনের আর এক মুজাহিদ মোঃ ইয়াহিয়া ঘাতকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তার অপরাধও ছিল ওই একটি। তিনি ইসলামের কথা বলতেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। মোশাররফের পর শহীদ হলেন মোঃ ইয়াহিয়া। এভাবেই শহীদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে বেগবান আর দ্রুত এগিয়ে আসছে মনযিল।

শহীদ মোশাররফের প্রতি আমার এখন ঈর্ষা হয়। সেই সহজ সরল সাহসী ছেলে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলো। এমনটি ঈর্ষা জেগেছিল আমার সহকর্মী শেখ ফিরোজ মাহমুদ শহীদ হবার পর। শহীদ ফিরোজ মাহমুদের একটি কথা আমাকে এখনো নাড়া দেয়। তিনি বলতেন "বাগানের সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি যেমন পথিক ছিড়ে নেয় পরম আদরে, তেমনি আল্লাহ' পাকও তার সবচেয়ে সুন্দর ও প্রিয় বান্দাকেই পৃথিবী হতে নিয়ে যান নিজের কাছে।" শহীদ ফিরোজ মাহমুদ, ইয়াহিয়া, মোশাররফ কিংবা অন্যরাও ঠিক তেমনিভাবে ওপারের সুন্দর জীবনে চলে গেছেন। তারা মরেও জীবিত হয়ে রইলেন। আল্লাহ নিজেই বলেন, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলো না বরং তাঁরা জীবিত অথচ তোমরা তা অনুভব করতে পারো না। (সূরা আল-বাকারা)।

গত ১২ জানুয়ারী ১৯৯৩ সন্ধ্যায় সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নটা ছিল এই যে, ছাত্রলীগের সশস্ত্র ঘাতকরা তার বাবাকে কবরস্থানে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। লাশ ফিরিয়ে নেবার জন্যে ২০,০০০ টাকা দাবী করে। টাকা নিয়ে মোশাররফ কবরস্থানে গিয়ে দেখে তার বাবার লাশ নেই। আছে একটি পাখির ছানা। শাহাদাতের দিন সকালে এই স্বপ্নটি সে রুমমেটদের বর্ণনা করেছিল। সেই স্বপ্নটি তার জীবনেই সত্য হলো। ঐ দিন বিকেলে কলেজ মাঠে (প্যারেড) সে ফুটবল খেলেছে। খেলা শেষে সবার একই কথা 'আজ সবার চেয়ে মোশাররফ ভালো খেলেছে। কোনো সময় সে এত ভালো ফুটবল খেলতো না। কিন্তু কেন জানি ঐদিন সে সবার চেয়ে ভালো খেলেছে। সবার প্রশংসায় মোশাররফের নাজুক অবস্থা। মাগরিবের নামাজ শেষে পরিশ্রান্ত মোশাররফ এবং অন্যান্যরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে খবর পৌছল আন্দরকিল্লা (চট্টগ্রাম)

www.pathagar.com

থেকে শিবির কর্মী জিয়াকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে চেরাগী পাহাড়ের কাছে রাজা পুকুর লেইনে নিয়ে নির্যাতন করছে। সংবাদ শুনে বসে থাকতে পারেনি অন্যদের মত মোশাররফও। বরাবরই সাহসী ছিল মোশাররফ। অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধে সে থাকত সর্বদা সামনের সারিতে। স্বাভাবিকভাবেই মোশাররফসহ প্রতিবাদ মিছিল অন্যায়ের প্রতিবাদে উজ্জীবিত হয়ে আন্দরকিল্লার দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা আন্দোলনের সহকর্মীদের প্রতি অপর কর্মীদের ভালোবাসা আন্তরিকতা, অন্যায়ের প্রতিবাদে বজ্রকণ্ঠ, তাদের সাহস, শৌর্য, বীর্য, এসব কিছুই সহ্য করতে পারেনি। পথিমধ্যেই অন্ধকার গলি থেকে ব্রাশ ফায়ার করা হয় মিছিলের উপর। বুকে বুলেটবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সবার প্রিয় মোশাররফ। নিজের জীবন দিয়ে সে সাক্ষ্য দিলো হে আল্লাহ! আমি পরিপূর্ণভাবে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তার মুখ থেকে বজ্র আওয়াজ উঠেছে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, বিপ্লব বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব, নবী মোদের শিখিয়ে গেছেন জিহাদ করে বাঁচতে হবে। রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়, ইসলামের শত্রুরা হুশিয়ার সাবধান, এক শহীদের রক্ত থেকে লক্ষ শহীদ জন্ম নেবে।

শহীদের রক্ত দেখে যেমন লক্ষ মোশাররফ জন্ম নিয়েছিলো ঠিক তেমনি মোশাররফের রক্ত থেকেও লক্ষ মোশাররফ জন্ম নেবে। যাঁরা সব শহীদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবে।

মোশাররফের সাথে আমার সর্বশেষ আলাপ হয়েছিল তার মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে টেলিফোনে, কুশলাদি জানার পর সে ফোনে অনুযোগ করেছিলো, আমি তাকে ভুলে গিয়েছি। অনেক কষ্টে তার অভিমান ভাঙানোর পর বলেছিলাম, নববর্ষে তোমার জন্যে উপহার পাঠাচ্ছি। তার কাছে সংগঠনের একটি ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছিলাম। আমার পাঠানো ক্যালেন্ডার নিয়ে বাহক যখন কলেজে ঢুকছিল সে মুহূর্তে অপর গেইট দিয়ে আমার প্রিয় ছোট ভাই মোশাররফের লাশের কফিনও ঢুকছিল জানাযার জন্যে। আমার পাঠানো উপহার মোশাররফের কাছে পৌঁছার খানিক আগেই মোশাররফ নিজেই উপহার হয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলো। আল্লাহ তাঁকে কবুল করো। আমিন।

শহীদ মোশাররফ এর পিতার অনুভূতি

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সামছুল হুদা)

শহীদ মোশাররফ এর পিতা হওয়ায় আমি নিজে গর্বিত। আমার ছেলে মেধাবী ছাত্র ছিলো। কোন এক দিন আমার ছেলে মোশাররফ এর পরীক্ষা চলা অবস্থায় পরীক্ষার হলে তাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম হলের বেশির ভাগ ছাত্র নকল করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম মোশাররফ তুমিও কি নকল করছো। মোশাররফ বললো- আমার মেধা ও যোগ্যতার বলে যা পারি তাই লিখব। নকল করে পাশ করা যায় কিন্তু ভাল রেজাল্ট করা যায় না। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার পর দেখলাম মোশাররফ পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে।

মোশাররফ এর সাথে সর্বশেষ সাক্ষাতঃ আমি একজন স্কুল শিক্ষক তাই বেতনও ছিল কম। পরিবারের খরচ যোগান দেবার পর হাতে আর টাকা থাকতো না। তাই মোশাররফকে নিয়মিত পড়ালেখার খরচ যোগান দিতে পারতাম না। সেও আমার অবস্থা বুঝতো এবং আমার কাছে

www.pathagar.com

টাকা-পয়সা তেমন চাইতো না। একদিন বাড়ী থেকে যাবার সময় টাকা না নিয়ে চলে যায় এবং তার দুই একদিন পর আমার কাছে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে যা লিখল তা হল "বাবা, আমাকে ভুলে গেছেন।"

আমি এবং আমার ছেলে একসাথে মিছিল করতাম, প্রোগ্রামে যেতাম। সবসময় তাকে কুরআন ও হাদীস সর্ম্পকে বলতাম এবং সে আমল করার চেষ্টা করতো।

কর্মীদের প্রতি পরামর্শ ঃ

ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত পালনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

জনশক্তিকে চরিত্রবান হতে হবে। চরিত্র উজ্জল না হলে স্বপ্ন সফল হবে না।

মাঝে মাঝে হৃদয়
যুদ্ধের জন্য
হাহাকার করে উঠে।
মনে হয়
রক্তই সমাধান,
বারুদই অন্তিম তৃপ্তি।

-আল মাহমুদ

www.pathagar.com

শহীদ একরামের সাথে প্রথম পরিচয় এবং শেষ দেখা

-সৈয়দ আবদুল মতিন

তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের ছাত্র। শাহজালাল হলের গেষ্টরুমে পাঠ চক্রের প্রোগ্রাম। পাঠ চক্রের সদস্যদের সাথে একে অপরের পরিচয় হচ্ছে। কার বাড়ী কোথায়, কোন সাবজেক্টে পড়াশুনা। আমিও একরাম ভাইয়ের পরিচয় জানার পর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছাকাছি বসলাম। কারণ দু'জনের বাড়ি একই জেলায় আবার দুজনের বিভাগীয় অফিসও পাশাপাশি। উল্লেখ্য আমি দর্শন বিভাগের ছাত্র আর একরাম ভাই ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। পাঠচক্রের প্রোগ্রাম যথাসময়ে শেষ হওয়ার পর দু'জনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হল। ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক, বিশেষ করে ফেনী জেলার কাজ কর্মের ব্যাপারে।

এরপর থেকেই একরাম ভাইকে ফ্যাকাল্টিতে দেখলেই কাছে ছুটে যেতাম। প্রথম আলাপেই কেমন যেন ভক্ত হয়ে গেলাম। তিনি যদিও আমার এক বৎসরের সিনিয়র ছিলেন তবুও দু'জন বন্ধুর মতো ব্যবহার করতাম। উনি আমিন বাজারে লজিং থাকতেন এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব সেখানেই পালন করতেন। তাই কোন প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে বা ফ্যাকাল্টিতে ক্লাসের ফাঁকে দেখা হত। দেখা হলেই কাছে ছুটে যেতাম। এ বিশাল হৃদয়ের মানুষটার কাছে গেলে অনেক দুঃখের কথা ভুলে যেতাম। মনে বড় শান্তনা পেতাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা দেখে এবং সাহস পেতাম দৃঢ় চিত্তের ব্যক্তিত্ব দেখে। অপূর্ব সাহসী ছিলেন। সদস্য প্রার্থী হয়েছি শুনে কোলাকুলি করলেন। অনার্স পরীক্ষা এবং পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে তিনি সদস্য হতে পারেননি এ জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, এগিয়ে যান তাড়াতাড়ি। সদস্য হয়ে যাওয়া দরকার। পারিবারিক সমস্যার কারণে আমিতো পারলাম না। আমি বললাম কেন কি হলো? সময়তো এখনও আছে। তিনি একটু হেসে বললেন, কই আর সময়? অনার্সের রেজাল্ট হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, কয়দিন পর মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু হবে। তাছাড়া পারিবারিক অনেক সমস্যা। অনার্সের রেজাল্ট এর কথা শুনে কি রেজাল্ট জিজ্ঞাসা করতেই হেসে বললেন, এই দুই ডান্ডা আর কি, সাথে সাথে তার এক বন্ধু (এ মুহূর্তে নামটি স্মরনে আসছে না) বললেন সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছে, আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং রস করে বললেন তখন স্যার স্যার বলে আমরা পেছনে পেছনে হাঁটবো। একরাম ভাই দুষ্টমি করে বললেন, 'আমি বেত নিয়ে তোমাদের পিটাবো' এটা বলেই অট্টহাসি দিয়ে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম দুজন। এভাবে মাঝে মধ্যে দেখা হতো, কথা হতো।

আরেক দিনের ঘটনা, একদিন ফ্যাকাল্টিতে দেখা হল তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এবং আমি উঠছি এমন সময় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন শুনেছি সদস্য হয়েছেন এবং হল সেক্রেটারী। আমি বললাম সেতো অনেক পুরনো কথা। তবে আপনি তো ছাত্রজীবন শেষ করলেন, নাকি ? তিনি একটু হেসে স্বভাব সুলভ দুষ্টমিতে বললেন হ্যাঁ, মাস্টার্স পরীক্ষা তো শেষ করলাম। আমি বললাম, তাতো জানিই। আমি সাংগঠনিক ছাত্র জীবনের কথা বলছি। তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথা জানতাম বলে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললাম, এখন কি করার চিন্তা করছেন?

www.pathagar.com

উত্তরে বললেন, দেখা যাক, আপাতত বাড়িতে আছি। একটা কলেজে ঢুকার চেষ্টা করছি। বললাম, কি ব্যাপার এম. ফিল করবেন না ? তিনি একটু হেসে বললেন, দেখা যাক, রেজাল্ট এর তো অনেক দিন বাকি এ সময়টায় কিছু একটা করি। তিনি বললেন দোয়া করবেন। এটা বলেই হাত মিলালেন, কে জানতো এটাই ছিল একরাম ভাইয়ের সাথে আমার জীবনের শেষ দেখা। যদি জানতাম তাহলে সে দিন তাঁকে ছাড়তাম না, প্রাণ ভরে আরো কথা বলতাম যার কোন শেষ হতো না। এর কয়দিন পরেই আবার দেখা হয়েছে তাঁর সাথে তবে আগের সে একরাম নয়। আল্লাহর একজন অতি সম্মানিত মেহমান হিসেবে নূরানী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক যুবক। তখন আগের মতো কুশল বিনিময় হয়নি তবে হয়েছে আত্মিকভাবে কথোপোকথন। আগের মতো কথা বলতে পারিনি, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছিলো। ৫ই জুন ১৯৯৫ সকাল ১০টায় ফ্যাকাল্টিতে সাথী মোশাররফ ভাই (একরাম ভাইয়ের বিভাগের ছাত্র ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বললেন একরাম ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। সোনাগাজীতে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা হামলা করে আহত করেছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে আছে। ডিপার্টমেন্টের অনেকেই দেখতে যাবে আপনি যাবেন ? কোন একরাম ভাই? আমি জিজ্ঞাসা করতেই মোশাররফ ভাই বলে উঠলেন "আরে সাথী ছিলেন যে, অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছেন, এবার মাস্টার্স পরীক্ষা দিলেন।" আমি আঁতকে উঠে বললাম, কি বলেন ? আমার সাথে মাত্র ৫দিন পূর্বে উনার দেখা হলো। মোশারফ ভাই বললেন আমার সাথেও তো একদিন আগেই দেখা হলো। আমি বললাম দেখা যাক হলে যাই তারপর সিদ্ধান্ত নেবো। হলে ঢুকতেই দু-তিন জন সাথী কর্মী এসে বললো মতিন ভাই, একরাম ভাইকে চিনেন নাকি, সোনাগাজীর? হ্যাঁ, শুনেছি আহত হয়েছেন। একজন বলে উঠল, এই মাত্র ফোন আসলো উনি শাহাদাত বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহ পড়ে দ্রুত রুমে গেলাম, চেয়ারে বসে পড়লাম। পুরো দুনিয়াটা অন্ধকার মনে হলো। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে, কারো সাথে কোন কথা নেই। এক ভাই এসে আমাকে খুঁজছে, আমি চোখ মুছে বের হতেই বললেন মতিন ভাই খবরটা পেয়েছেন? আমি অশ্রু সজল চোখে মাথা নাড়ালাম, তিনি বললেন, "মিছিল হবে, লোকজন খবর দেন" এর পরপরই বিশাল মিছিল বের হলো।

মিছিলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছি সেখানে পূর্ব থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর কিছু জনশক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র এবং তার নিজ এলাকার কয়েকজন লোককে দেখতে পেলাম। সকলের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে উঠলো, আমরা লাশ ঘরে জোর করেই ঢুকে গেলাম। লাশ দেখে কেঁদে উঠলো সকলের মন। পরে যখন হাসপাতালের পাশে বসে আছি। মনে পড়তে লাগলো পুরনো সব স্মৃতির কথা, করিডোরের কথা, ফ্যাকাল্টিতে প্রোগ্রামের কথা বা সিঁড়িতে শেষ দেখার কথা। নিজের অজান্তেই অশ্রুতে বুক ভিজে গেল। এরপর আর একরাম ভাইয়ের চেহারা দেখিনি। দেখার মতো অবস্থাও আমার ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জানাযা এবং সোনাগাজীর জানাযা শেষে শহীদ একরাম ভাইকে চিরদিনের জন্য সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে রেখে আসলাম। এভাবে শহীদ একরামকে রেখে সবাই চট্টগ্রাম রওয়ানা হলাম। কাফেলার সবাই ছিলো শুধু ছিলো না একজন যিনি পৃথিবীকে দু'পায়ে লাথি মেরে মহান প্রভুর দরবারে পৌঁছে গেছেন।

এরপর জেলা সভাপতি হয়ে ফেনী আসার পর যতবার শহীদের বাড়ি গিয়েছি বার বার মনে পড়েছে প্রথম পরিচয় এবং সর্বশেষ দেখার কথা।

www.pathagar.com

খালাম্মা প্রশ্ন করেন, কবে হবে আমার একরামের স্বপ্নের ইসলামী সরকার, খুনীদের বিচার? তখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি আর অতীতের একরাম ভাইকে যেন শাহজালাল হলের গেষ্টরুমে বা আর্টস ফ্যাকাল্টির সিঁড়িতে দেখতে থাকি। সাদা ধবধবে নূরানী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক পবিত্র যুবক, সাথীদের হৃদয় ফাটানো আত্মচিৎকার, যা কোন দিন শেষ হবার নয়, ভোলার নয়, নিজের অজান্তেই দুচোখ ভিজে উঠে।

লেখক
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ফেনী জেলা

‘জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত
মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে
উঠে যবে জিন্দেগানী’

-ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

এখনও যিনি আমার নেতাঃ শহীদ আলাউদ্দিন

মুঃ নূরুজ্জামান

আপোষহীন সংগ্রামে বিজয়ী দুরন্ত সেনাপতির নাম শহীদ আলাউদ্দিন। যার হাসিমাখা ঝলমলে চেহারায় সারাক্ষণ লেগে থাকতো প্রশান্তির অমিয় ধারা, হৃদয়ের গহীন কোণায় উঠতো ভালোবাসার প্রবল জোয়ার। শহীদ আলাউদ্দিন সেই যুবক; যে যুবক কোনদিন মিথ্যার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়নি; যার চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল মনোমুগ্ধকর জুই চামেলীর চেয়েও সুবাসিত, রূপের মাঝেও অপরূপ এক বাড়ন্ত গোলাপ।

বাঁধাহীন মসৃণ একটি শৈশব ছিল যার। শহীদ আলাউদ্দিন একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় স্বভাবগত আদর-যত্নে পরিপূর্ণ রূপে সিক্ত দুঃখের পীড়ন কিংবা যন্ত্রণার তীব্র দহন তার জীবনে ছিল না বললেই চলে।

আলাউদ্দিন ভাইয়ের শৈশবের লালিত্য আর কৈশোরের সোনামাখা দিনগুলো ছিল স্বপ্নের ফুল দিয়ে সাজানো। বেদনার কষাঘাতে সেই ফুলগুলো কখনো মলিন হয়নি। প্রিয়জনের আদর সোহাগ তার স্মৃতিমাখা কৈশোরের দিনগুলো কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পিতামাতার কলিজার ধন আলাউদ্দিন একদিন তাদের সামনেই কবরের কঠিন মাটির নীচে লুকিয়ে থাকবে সেটা কি কেউ ভেবেছিল?

শহীদ আলাউদ্দিন ভাই ছিলেন দাদা-দাদীর কলিজার টুকরা। যে আলাউদ্দিন চোখের আড়াল হলে তাদের ঘুম হারাম হয়ে যেতো, সেই আলাউদ্দিনকে বাড়ীর পাশে গাঢ় অন্ধকার কবরের মাঝে শুইয়ে রেখে কিভাবে ঘুমোতে পারবেন তারা? মামা-মামীর মমতা মিশানো সেই প্রিয় ডাকটি কে শুনবে আজ? পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে এত মানুষ আলাউদ্দিন ভাইকে ভালোবাসতো সেটা না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। এটা আমার কাছেও ছিল রীতিমত হিংসার ব্যাপার। আলাউদ্দিন ভাইয়ের একান্ত আগ্রহ ও আমন্ত্রণে একবার গিয়েছিলাম তাদের বাড়ীতে। সেখানে গিয়েই আমার মনে হয়েছিল এই তরুণ কোন স্বাভাবিক তরুণ নয়। আবাল- বৃদ্ধ-বণিতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ছিল এক কথায় আলাউদ্দিন ভাইয়ের অন্ধভক্ত। এমন একজন প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় ছাত্রনেতাকে ফেনীর জনগণ নিজেদের সম্পদ বলে গর্ব করতে ভালোবাসতো। তিনি যখন তার এলাকায় পরিচিত মুরব্বীদের সাথে দরদভরা হৃদয় নিয়ে কথা বলতেন তখন তার চারপাশে মনে হতো মৌমাছির মতো জটলা করছে শুভাকাংখী ও যুবকেরা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার পিছু নিতো কচি শিশু কিশোরেরা। এক ঝলক শিশুদের সামনে এগিয়ে চলার সময় তাকে মনে হতো হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালার মতো। হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে আলাউদ্দিন ভাই কাছে টানতেন মানুষকে। তার

www.pathagar.com

সুমিষ্ট কণ্ঠের বিনয়ী উচ্চারণ যেন মানুষকে ভুলিয়ে দিত হৃদয়ের সমস্ত যন্ত্রণা। দীর্ঘদিন পরে এলাকায় আলাউদ্দিন ভাইকে কাছে পেয়ে মানুষগুলোকে কেমন যেন পাগল হয়ে উঠতে দেখেছি। অভিমানের সুরে মুরব্বীদেরকে বলতে শুনেছি "বাবা এতদিন পরে এলে"? অথচ সেই সব মুরব্বী কেউ তার রক্তের আত্মীয় না হলেও সকলেই ছিলেন আত্মার আত্মীয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অসংখ্য মানুষকে দেখেছি দু'হাত বাড়িয়ে আবেগের আতিশয্যে আলাউদ্দিন ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ধানক্ষেতের মধ্যে কর্মক্লান্ত উদাসীন কৃষককে স্মিতহাস্যে সালাম দিয়ে "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসা করে চলেছেন একাধারে।

প্রাণখোলা হাসি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার এমন যাদুকরী ক্ষমতা আল্লাহ সবাইকে দেন না। আর যারাই এই সম্মোহনী শক্তির ভাগ্যবান উত্তরাধিকারী তারাই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে। রাতের আঁধার চিরে আলো ঝলমল সূর্যোদয়ের নিশ্চিত হাতছানি শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের ছিলো প্রতিভাদীপ্ত দু'টি চোখের তারায়, যে চোখ দু'টির মাঝে ছিল শত্রুর জন্যেও শান্তির নীরব আহ্বান। নরপিশাচদের নির্মম বুলেট সেই বাদামী চোখ দু'টিকে করে দিল চিরদিনের জন্য স্থির ও শক্তিহীন।

অত্যন্ত সহজ-সরল এই যুবকের মাঝে ব্যক্তিত্বের গাঁথুনি ছিল ভীষণ মজবুত। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার মাঝে তাঁর এই ব্যক্তিত্বের ভীত কখনও কেঁপে ওঠেনি। যেকোন ব্যাপারে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকাটা ভীষণ অপছন্দ করতেন তিনি। অন্যের করুণাপ্রার্থী হওয়াটা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এটা তার কোন অহংকার ছিলনা বরং তার নির্মল চরিত্রের সাথে দুর্লভ গুণটি সঙ্গী-সাথীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কারণ ছিল। নিজে অকাতরে ব্যয় করে মাঝে মাঝে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তার পকেট নিঃশেষ হয়ে গেলেও ভালোবাসা কখনও নিঃশেষ হতোনা। এই প্রাণপ্রিয় শহীদ ভাইয়ের সাথে চার-পাঁচ বছর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি আমি। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে কি-না জানা নেই, যে দিন এক সাথে নাস্তা করে আলাউদ্দিন ভাইয়ের আগে কেউ হোটেলের বিল পরিশোধ করতে পেরেছে। পরম যত্ন এবং সম্মানের সাথে খাওয়াতেন তিনি মেহমানদেরকে। 'হলে' কিংবা 'মেসে' থাকার সময় তাঁর নিজ হাতের রান্না খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে অসংখ্য ভাইয়ের। দোকানে না থাকলে নিজ হাতেই হাল্কা নাস্তা তৈরী করে খাওয়াতেন সংগঠনের ভাইদেরকে। এতে যেকোন ব্যক্তির হৃদয়েই সৃষ্টি হয়ে যেতো প্রাণপ্রিয় সেই আলাউদ্দিন ভাইয়ের জন্যে একটি পৃথক মর্যাদার আসন। চকলেট কিনে নিজ হাতে শিশুদের মুখে দু'চারটি চকলেট কিংবা লজেন্স তুলে দিতেন তিনি। সেজন্য দেখা যেত তার পকেটে দু'চারটি চকলেট কিংবা লজেন্স থাকতো সব সময়।

আল্লাহ তা'য়ালা বাগানের যে গোলাপটিকে সবচেয়ে ভালবাসেন তার সুঘ্রাণও বাড়িয়ে দেন। আলাউদ্দিন ভাইয়ের মতো এমন মার্জিত ও রুচিশীল মানসিকতার খুব কমসংখ্যক যুবককেই দেখেছি আমি। কি পোশাক-পরিচ্ছেদ, কি পড়ার টেবিল, সবখানেই ছিল এই রুচিশীলতার ছাপ। তিনি ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহারের চেষ্টা করতেন সব সময়। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে দায়িত্বশীল বা কর্মীদের জন্যও কিনতেন উপহার সামগ্রী।

www.pathagar.com

শিশুসুলভ সারল্যের সাথে ভাব গাম্ভীর্যের একটা মানানসই সেতুবন্ধন ছিল আলাউদ্দিন ভাইয়ের চরিত্রে। ধীরস্থিরভাবে মেপে মেপে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজবের আড্ডায় আলাউদ্দিন ভাইয়ের উপস্থিতি ঘটলে তার প্রাণচঞ্চল অথচ সাবলীল কথাবার্তায় সকলেই তাদের আলোচনার গতিপথ ঘুরিয়ে ফেলতো। গুরুগম্ভীর কোন আচরণ নয় বরং তার পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় অনেকে লজ্জিত হয়ে যেতো। উচ্চস্বরে কখনও হাসতেন না তিনি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যেভাবে কথাবার্তা বলতেন, তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন সেভাবে কথা বলতে। নম্রভাবে নিজের বক্তব্যকে মানুষের কাছে শিক্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্যে চেষ্টা করতেন তিনি। তার বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ যুক্তির ভাষা জানত। গভীর প্রত্যয়ের সাথে কথা বলতেন তিনি। মহান আল্লাহ তাঁকে বুদ্ধিভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপনার এমন শক্তিশালী মন্ত্র শিখিয়ে ছিলেন, যা দিয়ে জটিল কিংবা অস্পষ্ট যে কোন বিষয়বস্তু সবার সামনে পরিস্কার হয়ে যেতো। বৈঠকে সবাই শুনত তার বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে। তার ক্ষুরধার যুক্তির পরে অনেকেই তাঁদের পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতেন সানন্দে। সেজন্যে দায়িত্বশীলসহ প্রায় সকলেই আলাউদ্দিন ভাইয়ের বক্তব্যের জন্যে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। আবার নিজের বক্তব্যকে কখনই তিনি জিদ কিংবা হঠকারীতার পাথর দিয়ে চাপা দিতেন না। সুন্নাতে রাসূলের মতো পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অবনত মস্তিষ্কে মেনে নিতেন তিনি। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সব সময় চেষ্টা করতেন কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিতে। সাহাবীদের ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবনের বিশাল ঐতিহ্যভান্ডার থেকে তিনি নিজের জন্যে সংগ্রহ করেছিলেন অসংখ্য মূল্যবান সম্পদ। যা ছিল তার উদ্দীপ্ত কর্মবহুল দৈনন্দিন জীবনের পাথেয়।

নেতৃত্বের আজন্ম প্রতিভায় আলাউদ্দিন ভাই ছিলেন ভাস্বর। এই ক্ষণজন্মা যুবকের জন্যে নেতৃত্বের গুণটি ছিল মাথার মুকুটের মত উজ্জ্বল। স্বল্প সময়ের মধ্যে যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্মীরা তার পিছনে সন্দেহমুক্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো। গভীর প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। যে জন্যে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের আসনে আলাউদ্দিন ভাইকে নিয়ে প্রায় সকলে স্বপ্নের জাল বুনতেন। কর্মীদেরকে সংগ্রাম মুখর পিচঢালা রাজপথে রেখে আলাউদ্দিন ভাই এত দ্রুত শহীদি মিছিলের নেতৃত্বে উঠে আসবেন এ কথাটা আজও অনেকের বিশ্বাস হয়না। বিশেষ করে যারা তাকে সংগঠনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর দায়িত্বে ছিলেন তাদের জন্যে এটা মেনে নেওয়াটা আরও কষ্টকর। ইসলামী আন্দোলনের এই তরুণ সিপাহসালার সংগঠনের প্রতি সব সময় ছিলেন পরিপূর্ণ আস্থাশীল। সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে তিনি নিজের অভিভাবক মনে করতেন। তাদের ব্যাপারে যেকোন অযাচিত মন্তব্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি পরিপূর্ণ সজাগ থেকে সাংগঠনিক ব্যাপারে পরামর্শ রাখতেন। বয়সে বড় ও ছোট নির্বিশেষে সংগঠনের যে কোন ভাইকে দূর থেকে দেখতে পেলে দাঁড়িয়ে পড়তেন একান্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে। নিজের আসনে অন্য ভাইকে বসিয়ে ভীষণ তৃপ্তি পেতেন তিনি। সালামের প্রতিযোগিতায় তার অগ্রগামিতাকে কেউ কখনও চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে বলে আমার মনে পড়েনা। অনেকবার চেষ্টা করেছি তাকে হারিয়ে আগে ভাগে সালাম দিয়ে ফেলবো। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে একদিন মেসের দিকে কয়েক কদম অগ্রসর হতেই পিছন

www.pathagar.com

থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো "জামান ভাই, আসসালামু আলাইকুম।" সেদিনও হার মানলাম প্রিয় আলাউদ্দিন ভাইয়ের কাছে।

১৬ই ডিসেম্বর '৯৫ সাল আর ফিরে আসবেনা কোন দিন। অনাগতকাল ধরে মিছিল হবে রাজপথে, শ্লোগান থাকবে, বাড়বে মিছিলকারীর সংখ্যা। কিন্তু এমন প্রশস্ত বাহু মেলে মিছিল আগলে ধরে রাখার মত সিপাহসালার কি আসবে। হয়তো আর কোন দিন ফিরে আসবে না। তাজমহলের রঙ একদিন বিবর্ণ হবেই, ভোরের আকাশের রক্তিম আভাও মিলিয়ে যায় সুর্যোদয়ের সাথে। কিন্তু শহীদ আলাউদ্দিনের চরিত্রের বর্ণ ফ্যাকাশে হবে না কোন দিন। কারণ তিনিতো কেবল সৌন্দর্য্যের মিনার ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন সে মিনারের স্থপতিও বটে, যার ঝিলিকে আলোকিত হতো চতুর্দিক। তার যোগ্য নেতৃত্বে আর ঈমানের বলিষ্ঠতা দেখে মুগ্ধ হতো সবাই। তাকে অনুকরণ-অনুসরণ করতো সকলে, এমন কি আমি নিজেও । কিন্তু আলাউদ্দিন ভাই আজ আর নেই। আছে শত স্মৃতি শত কথা, যা আজও অম্লান দর্পনের মত স্বচ্ছ। তাইতো তিনি শহীদ হয়ে এখনও আমার নেতা।

লেখক,
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

দূর্গম পথের ক্লান্তি
ছিল তবু থামেনি খিজির,
সমর শহীদে থামবেনা তুমি,
তুমি সাহসী শিবির।

www.pathagar.com

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

আ. ন. ম আবদুর রহিম

১৭ই মে ১৯৯৬ ভোর ৫টা, ফজরের নামাজ পড়ে পড়ার টেবিলে বসতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় বাসার দরজায় কড়া নড়ার শব্দ হল। দরজা খুলতেই দেখি মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয় সহকর্মী নাজিম ভাই। কি খবর জিজ্ঞেস করতেই ফ্যাল ফ্যাল করে কেঁদে দিলেন। আমি সান্তনা দিয়ে তাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে বললাম, কি ব্যাপার ? সে বলল দাগনভূঁঞায় আমাদের একজন ভাই শাহাদাত বরণ করেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ গত কালই বিকালে দাগনভূঁঞাতে প্রোগ্রাম করে এসেছি। শাহাদাতের ঘটনার মতো কোন পরিস্থিতি ছিল না। যখন জিজ্ঞেস করলাম কোন ভাইটিকে এভাবে অকালে চলে যেতে হলো- যখন বললো গোলাম জাকারিয়া, আমি নির্বাক, হতভম্ব হয়ে পড়লাম। বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে করণীয় কি তা চিন্তা করলাম এবং প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। বাসা থেকে প্রথম যখন রিক্সায় মেসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হারিয়ে যাচ্ছিলাম জাকারিয়ার মাঝে, তার সাথে অতিবাহিত হওয়া সময়ের মাঝে। তার সাথে কথোপোকথনের সংলাপগুলো মনে হচ্ছিল কানে ঘন্টার মতো বাজছে। মেসে গিয়ে দেখি জেলা সভাপতি জনাব নিজামুদ্দিন ফারুক ভাই বাড়ি থেকে ফিরেনি। মেস থেকে সোজা জামায়াত অফিসে গিয়ে জেলা আমির ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে খবর দিয়ে বৈঠকে বসলাম। বৈঠকে কাজ ঠিক করে আমার দায়িত্ব পড়লো দাগনভূঁঞা গিয়ে লাশের পোষ্টমর্টেম ও জানাযার ব্যবস্থা করা এবং থানায় গিয়ে মামলার বিষয়টা দেখা। আমি মহিপাল পার হতেই জেলা সভাপতির স্বাক্ষাৎ পেলাম, উনি বাড়িতে থেকেই খবর পেয়ে ভোরে দাগনভূঁঞা এসে লাশ পোষ্টমর্টেমের ব্যবস্থা করছেন। আনা হলো ফেনী ট্রাংক রোডের লাশ ঘরে। ইতিমধ্যে চর্তুদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ায় শত শত কর্মী তাদের প্রিয় ভাইটিকে দেখার জন্যে ভিড় শুরু করলো। বেলা ২টায় ট্রাংক রোডে প্রতিবাদ সমাবেশ ও জানাযার প্রস্তুতি চলতে লাগলো। কেন্দ্র থেকে তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া ভাই এলেন। পোষ্টমর্টেম শেষে কফিন নিয়ে আসা হলো ঐতিহাসিক ট্রাংক রোড চত্বরে শুরু হলো জানাযা পূর্ব প্রতিবাদ সমাবেশ। হাজার হাজার জনতার সামনে আমি যখন মাইকে শহীদের বড় ভাই বক্তব্য রাখবেন বলে ঘোষণা দিলাম, তখন জনতার গগন বিদারী স্লোগান ফেনীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিলো। ট্রাংক রোডের জানাযা শেষে দাগনভূঁঞার উদ্দেশ্যে কফিন নিয়ে রওয়ানা হলাম সবাই। যখন দাগনভূঁঞায় পৌছলাম, দেখলাম উত্তাল অগ্নিগর্ভ দাগনভূঁঞাতে হাজার হাজার ছাত্র যুবক জনতা পূর্ব থেকেই প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো। দাগনভূঁঞার প্রতিবাদ সমাবেশে শহীদের কলেজের সম্মানিত প্রিন্সিপাল তার প্রিয় ছাত্রটির এ অকাল মৃত্যুতে যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি বলেছিলেন 'আমি আমার বাগানের সেরা ফুলটিকে হারালাম।

www.pathagar.com

দাগনভূঁঞা ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ হারাল তার সেরা ছাত্রটিকে। এ মৃত্যুর কি কোন জবাব নেই ?" আসলে কোন জবাব নেই। এই দেশ, জাতি এই মৃত্যুর কোন জবাব দিতে পারবে না। দাগনভূঁঞায় জানাযা শেষে শহীদের কফিন নিয়ে যাওয়া হলো তার গ্রামের বাড়ি বসুরহাট। সেখানেও ৩ বার জানাযা শেষে জাকারিয়া ভাইয়ের পারিবারিক গোরস্তানে চিরদিনের জন্যে রেখে এলাম আমার প্রিয় ভাইটিকে। আসার সময় কোন গাড়ি পাচ্ছিলাম না। শহীদের বাড়ি থেকে তার মা, ভাই-বোনদের কান্না হৃদয়টাকে খান খান করে দিচ্ছিলো। দাগনভূঁঞার এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে আমাদের এক কর্মী আমাকে তার মোটর সাইকেল দিয়ে বললেন, রহিম ভাই আপনি আমার গাড়ী নিয়ে যান। আমি দাগনভূঁঞার সাথী শাখা সভাপতি সোহেল ভাইসহ রাত ১১টায় শহীদের বাড়ি থেকে রওয়ানা হলাম। গাড়ী ড্রাইভ করতে পারছিলাম না। বার বার আনমনা হয়ে যাচ্ছিলাম। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বেই তার সাথী শপথ হয়েছিলো। তার সাংগঠনিক সময় কম হওয়ার কারণে সাথী করতে আমরা চাচ্ছিলাম না। এ বিষয়টা দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে সে বলেছিল "রহিম ভাই আমি কথা দিলাম শুধু সময় নয় আমার জীবনটাই সংগঠনের জন্য দিয়ে দিব, তবুও আমাকে সাথী বানান, আমি এগিয়ে যাব।" সত্যিই যে সংগঠনের জন্যে সে জীবনটাই দিয়ে দিবো তা কি তখন কল্পনা করেছিলাম ? সে এগিয়ে গেছে অনেক অনেক দূর অত দূরে আমাদের অনেকেরই হয়তো যাওয়া হবে না। দুষ্কৃতিকারীরা কেড়ে নিয়েছে তার জীবন। ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে একটি পরিবারের স্বপ্ন সাধ।

লেখক
সাবেক সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ফেনী জেলা

মাঝে মাঝে হৃদয়
যুদ্ধের জন্যে
হাহাকার করে উঠে।
মনে হয়
রক্তই সমাধান,
বারুদেই অন্তিম তৃপ্তি।

-আল মাহমুদ

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বার বার নাড়া দেয়

মোঃ সামাউন হাসান

শহীদ হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান। আহ্! আজকে যদি আমার জন্যে এই জায়গাটা হতো তাহলে নিজেকে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে সঁপে দিতে পারতাম। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন না। একটি সাজানো বাগান থেকে প্রস্ফুটিত ফুলগুলোর মধ্য হতে অত্যন্ত যত্নের সাথে সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিকেই ছিড়ে নেয় বাগানের মালিক। সূরা তাওবার ১১১নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।"

মানুষ মরে গেলে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তার আদর্শ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও শিষ্টাচার সবকিছুই তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শিক্ষকমন্ডলী, আত্মীয়-স্বজন, ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গী সাথীদের মনে বারবার নাড়া দেয়। শহীদ হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান কেন জানি আমার মনকে বারবার নাড়া দিচ্ছে।

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। মানুষ যখন অন্যায়, অনাচার, অতি অসত্যে নিমজ্জিত, শয়তান তার অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে পৃথিবীতে শয়তানী শক্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। তখন আল্লাহ মানব জাতীর কল্যাণে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন ও তাদের সাথী হিসেবে প্রেরণ করেছেন দ্বীনের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী মর্দে মুজাহিদ। নবী-রাসূলের পর তাদের উত্তরাধিকারীরা এ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। তারা শয়তানি শক্তি নির্মূলের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। এমনকি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সাক্ষী হয়ে থাকেন।

ফেনীর ইতিহাসে শহীদ হাফেজ আবদুল্লাহ আল সালমান একটি প্রেরণার নাম। যার অসাধারণ মেধা, অতুলনীয় চরিত্র, অনুপম কথামালা আর আল্লাহ ভীরু মানসিকতা আমাদের প্রেরণার উৎস। শহীদ সালমানের সাথে আমার পরিচয় হয় ২০০৯ সালে। সে ফালাহিয়া মাদ্‌রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন ভর্তি হয়। ক্লাশ রোল ছিল ৮৭। আমি তাকে সংগঠনের কর্মী, হাফেজ ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে চিনতাম। ২০১১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ৮ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া ভাইয়ের নিকট সাথী শপথ গ্রহণ করে। সর্বশেষ ফালাহিয়া ক্যাম্পাস জুনিয়র শাখার অর্থ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ২০১১ সালে ৮ম শ্রেণী থেকে JDC পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি অর্জন ও ২০১৩ সালে শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে দাখিল টেষ্ট পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে। শহীদ সালমান কোরআনে হাফেজ ছিল ঠিকই কিন্তু তার বুকভরা আশা ছিলো বড় ডাক্তার হবে। গ্রামে গিয়ে স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

কমপ্লেক্স দিবে। গ্রামের লোকদের সওয়াবের আশায় বিনামূল্যে চিকিৎসা দিবে। কিন্তু প্রভুর প্রেমে পাগল দ্বীনের এ মুজাহিদ ইসলাম বিরোধী অপশক্তি, ইসলামের পতাকাবাহী মুসলিমদের উপর জুলুম, নির্যাতন, অনাচার, মিথ্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুনিয়ার এ ক্ষুদ্র স্বার্থে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে চলে গেলেন অনেক দূরে। দুনিয়ার কথা ভুলে গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিগ্রী পাওয়ার যিনি অধিকারী তিনি কি আর ছোট কোন ডিগ্রী পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন? শিক্ষক মন্ডলী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী সাথীদের রেখেই তিনি মূল ডিগ্রি অর্জন করে জান্নাতের যাত্রীদের তালিকায় নাম লিখে নিলো।

প্রেরণা যোগায় শহীদ সালমান ঃ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা। তারা আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের নিকট থেকে রিজিক পাচ্ছে। (আলে ইমরান - ১৬৯)

২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় দেয়ার পর একদিন সালমান তার আম্মুকে বললেন- "আচ্ছা আম্মু, সাঈদী সাহেব তো অন্যায়, জুলুম করেননি। তারপরও বাতিল শক্তি তাকে ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছে ! আমি যদি শহীদ হই তাহলে তোমার কোন আক্ষেপ থাকবে?" গত শিক্ষা সফরে সালমান তার বন্ধুদেরকে হাসতে হাসতে বলেছিলো "দোস্ত, আগে আমার ছবি তুলে নে, পরে তো আর কান্নাকাটি করেও আমাকে পাবিনা !" গত ঈদে সালমান তার বন্ধুদের বাসায় গিয়ে আন্টিদেরকে বলে আসছিলো যে, "আন্টি এসে তো আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম মাফ করে দিবেন, আর তো বেশি দিন বাঁচবো না, দোয়া করবেন।" আমার কাছে সবচাইতে বেশী আশ্চর্য বিষয় মনে হলো সালমান শহীদ হওয়ার ৫/৬ দিন আগে আমাকে বললো, "ভাইয়া আপনার সাথে কিছু কথা ছিলো। আমি বললাম ঠিক আছে বল। কেন ঠিক বুঝতে পারলামনা সালমান কথার মাঝে বলে উঠলো আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট? আমি বললাম না'তো। কেন ভাইয়া? তখন সালমান বললো না ভাইয়া এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম আর কি, একটু মুচকি হাসি দিলো। কিছুক্ষণ পর সালমান বললো ভাইয়া আমার কোন ভূল থাকলে মাফ করে দিবেন, আর আমার জন্যে দোয়া করবেন যাতে সামনে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারি"। এই বলে সে আমার নিকট থেকে বিদায় নিলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে সালমান মনে হয় জানতো যে তাকে অতিদ্রুত মহান আল্লাহর নিকট হাজিরা দিয়ে জান্নাতের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। সত্যিই আমি হতভাগা। যদি আমি সালমানের মনের সু-সংবাদটি জানতে পারতাম তাহলে আমি তখন দু'হাত জোড় করে তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতাম। আজ শহীদ সালমান নেই ঠিকই; কিন্তু হৃদয়ে লেগে আছে সালমানের সাথে থাকা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতিগুলো।

শাহাদাতের পূর্ব ঘটনা ঃ শহীদ হওয়ার ২দিন আগে সালমান তার আম্মুকে বাসা থেকে বাড়িতে পাঠিয়েছিলো। সালমান আম্মুর সাথে প্রত্যেকবার বাড়ীতে গেলেও এবার যায়নি। কারণ তার সামনে দাখিল পরীক্ষা। ২০১৩ সালের ১০ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা সাহেবের ফাঁসি আজ রাতেই কার্যকর করা হবে। এ ভ্রান্ত রায় বাতিলের দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শহীদ সালমান দাখিল পরীক্ষার্থী, মেধাবী ছাত্র, তখন সে পড়ার টেবিলে ছিলো। কিন্তু খবর শুনার সাথে সাথে সে বাসা থেকে বের হয়ে আসে। এক সেকেন্ডও দেরি করেনি। মিছিলের ২-৩ মিনিট আগে সালমানের আম্মু ফোন করলে সালমান তার আম্মুকে বলে "আমি ভালো আছি। আজ কাদের মোল্লা সাহেবের ফাঁসি দিতে পারে, দোয়া করবেন"। আম্মু থেকে মোবাইলে বিদায় নিয়ে ৩০-৩৫জন ভাই খাজুরিয়াতে মিছিল করার জন্যে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। এক পর্যায় পুলিশের গুলিতে সালমান মাথা ও বুকের বাম পাশ্বে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে পুলিশ চলে যায়। তখন সালমানকে হাসপাতালে নেয়ার জন্যে কোন গাড়িই পাওয়া যাচ্ছেনা। পুরো এলাকা একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে। সকলে মিলে সালমানকে কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দেখি ডাক্তার নেই! ঘড়ির কাটায় তখন ৯.৩০ টা। ডাক্তারকে ফোন করা হলে ডাক্তার ২৫-৩০ মিনিট পর এসে ওটি রুমে যায়। আমরা সকলেই বাহিরে অপেক্ষমান। এমন সময় ডাক্তার ভিতর থেকে এসে আমাদেরকে সালমান ভাইয়ের শাহাদাতের কথা জানান। আমি ডাক্তারের কথা শুনার সাথে সাথে ও.টি রুমে গিয়ে দেখি হাফেজ সালমান বিদায় নেয়ার জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলামনা। চোখ থেকে পানি বেয়ে পড়ছিলো। মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত আকাশ বাতাস আমার কাঁধের উপর। নিজেকে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি অপরাধী মনে হলো। কি জবাব দিবো সালমানের আম্মু-আব্বু ও তার সহপাঠীদেরকে।

তখনো মনে করেছি, মনে হয় ভাই এখনো জীবিত আছেন। ডাক্তারকে ডাকলাম। ডাক্তার বললেন তার জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, উনি নেই। ইন্নালিল্লাহ... নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করলাম। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি প্রিয় ভাই সালমান এর তাকানো চোখের উপর হাত বুলিয়ে চিরদিনের জন্যে বিদায় জানালাম। সত্যিই আমি হতভাগা। সালমানের সাথে ঐদিন আমিও ছিলাম। পুলিশের গুলি আমার পায়ে লেগেছিল কিন্তু ঐ দিন আল্লাহ আমাকে কবুল না করে সালমানকেই কবুল করে নিয়েছিলেন শহীদ হিসেবে।

পরদিন সকাল থেকে শহীদের প্রিয় ক্যাম্পাসে শহীদের সাথীরা জড়ো হতে থাকে আন্দোলনের এই সৈনিককে এক নজর দেখার জন্যে। শহীদের কফিন ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হয় সকাল ১১ টায়। শহীদ সালমানের আম্মু বাড়ী থেকে এসে প্রিয় ছেলেকে পোষ্টমর্টেম না করার দাবি জানিয়ে দরখাস্ত করলেও তা প্রশাসন ও আইন বিভাগ মঞ্জুর করেননি। অবশেষে দুপুর ১.৩০ এর সময় সদর হাসপাতালে নিয়ে পোষ্টমর্টেম করা হয়। শহীদ সালমানকে গোসল দেয়া হচ্ছে আর অপরদিকে শহীদ এর প্রিয় ক্যাম্পাসে হাজার হাজার জনতা একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছে। যখন শহীদের জানাযার জন্যে মাদ্‌রাসা মাঠে নিয়ে আসা হলো, তার শিক্ষক, শুভাকাঙ্খী, সহপাঠী ও আন্দোলনের ভাইসহ সকলের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আমার মন তখন হাহাকার করছিলো, কাউকে কিছু বলতে ও বুঝাতে পারছিলাম না। একি হয়ে গেল!

কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও নোয়াখালী শহর সভাপতি, জেলা আমীর, সাবেক জেলা আমীর, শহর সভাপতি, জেলা সভাপতি, ক্যাম্পাস সভাপতি ও ১৯ দলীয় জোট

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ ও শহীদের বড় ভাইয়ের বক্তব্যের পরে সাবেক জেলা আমীর অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া শহীদের জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। জানাযা শেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তার নিজ এলাকায়। পথিমধ্যে মুন্সিরহাট বাজারে ২য় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ মাগরিবের নামায এর পর তার নিজ গ্রামে ৩য় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে চিরসমাহিত করা হয়।

শহীদ সালমানের পিতা কুয়েত থাকার কারণে ছেলের লাশ দেখার সুযোগ পাননি। তিনি খবর পাওয়ার সাথে সাথে রওয়ানার ব্যবস্থা করলেও আসতে তার ২দিন সময় লেগে যায়। শহীদ সালমানের পিতা দেশে আসলে আমরা তার সাথে দেখা করি। যিয়ারত করার জন্যে কবরের নিকট গেলে শহীদের পিতাই মুনাজাত পরিচালনা করেন। মুনাজাতে শহীদ সালমানের পিতা বলেন, "হে আল্লাহ, বাগানের মালিকের কাছে যে ফুলটি সুন্দর লাগে তা মালিক তুলে নিয়ে যায়। আমার প্রিয় ছেলেকে তুমি দিয়েছো আবার তুমি পছন্দ করে নিয়ে গিয়েছ, দয়া করে তুমি তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে জান্নাত দিও। তার রক্তের বিনিময়ে তুমি ইসলামের বিজয় দিয়ে দাও।" শহীদের পিতা যখন মুনাজাত করছিলেন তখন সকলের চোখ বেয়ে অশ্রু বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। শহীদ সালমান আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার আদর্শ আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে আছে। তার রেখে যাওয়া কাজ ততদিন বন্ধ হবেনা যতদিন না খোদার রাজ কায়েম হবে। হে আল্লাহ আপনি শহীদ সালমানকে জান্নাতুল ফেরদাউস এর মেহমান বানিয়ে নিন এবং তার রেখে যাওয়া কাজ আমাদেরকে আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দিন। আমীন ॥

লেখক,
এইচ.আর.ডি সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ফেনী শহর।

www.pathagar.com

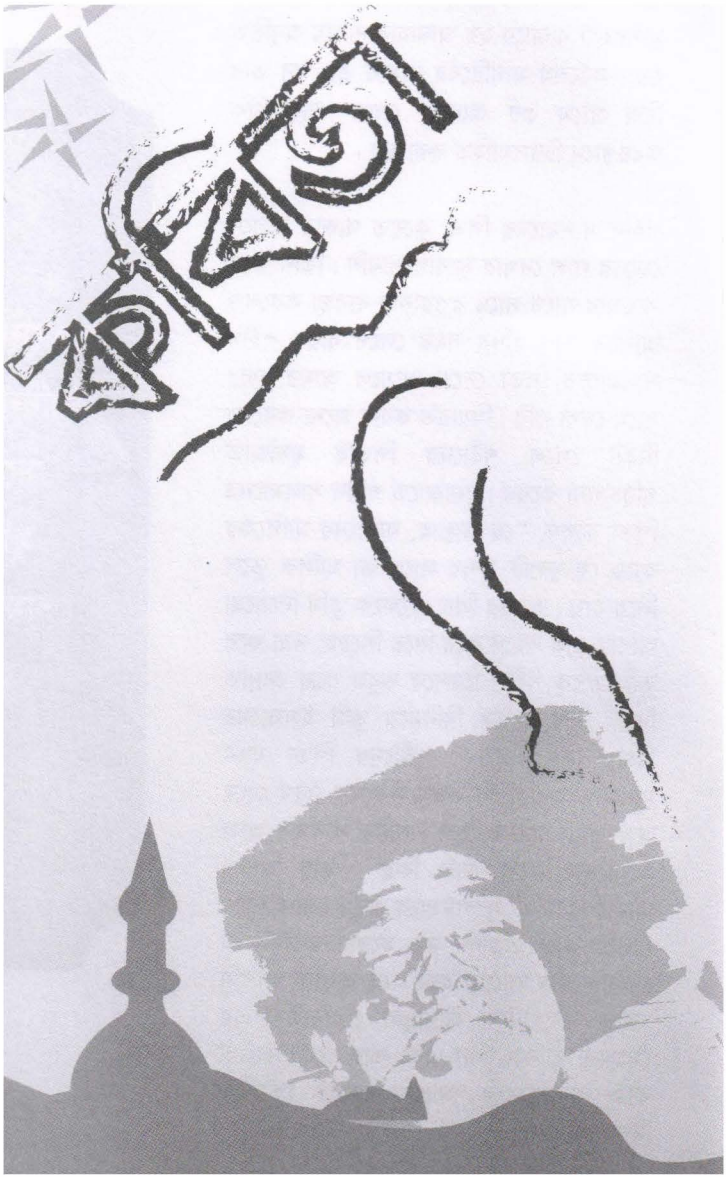

www.pathagar.com

অভিযাত্রিকের প্রার্থনা

ফররুখ আহম্মদ

আমাকে মাতাল কর উচ্ছল তোমার শিরাজিতে
মরু মদিনার বক্ষে যে সুরার সুতীব্র দাহিকা
আরব-আজম ব্যাপি ছড়ায়েছে জীবনের শিখা
মাতাল হয়েছে বিশ্ব যে সুরার তীব্র স্পর্শ নিতে
মাতাল হয়েছে মন যে সুরার মুক্ত সরণীতে
আমাকে মাতাল কর প্রাণ তপ্ত সেই সুরার রসে,
ঝড়ের সংকেত দাও তার অগ্নি উত্তপ্ত পরশে
মুরভূর জ্বালা আনে সুখসুপ্ত শেষ ধরণীতে
জ্বালাও আগ্নেয় স্পর্শে বহ্নি শিখা শিরায় শিরায়।
আমার উধাও গতি মানেনা পাহাড়, যে বন !
আমার দূরন্ত অশ্ব ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দরিয়ায়
ছড়াব তোমার দীপ্তি আর প্রান্তর ছোয়ায় ?
কোন মাঠে, কোন বন শোনেনি ওসমুদ্রস্বনন
সময়ের খর স্রোতে জীবন্ত যে দীপ্ত মহিমায়।

www.pathagar.com

আমার শপথের কথা

আল মাহমুদ

অপেক্ষায় আমি কাল গুনি আজও কেউতো এল না আর
দরজার পাশে সিক্ত শাড়ির নিশান উঁড়ছে কার?
যার যা-ই ছিল সবই তুলে দিল কেবল তুমিই বাকি
তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিখারি কড়াটি নাড়বে নাকি!
খালি হাতে যদি চলে যাই আমি তুমি কি তৃপ্ত হবে?
আমার জীবন কেটে গেল যেন জয় নয় পরাভবে।
জীবনের দ্বার বন্ধ সকলই মৃত্যুর দ্বার খোলা
আমি এগিয়েছি মরণের কাছে আমি তো আপনভোলা।
মৃত্যু আমাকে সরিয়ে দিয়েছে ঠেলেঠুলে চৌদিকে
অথচ আমার শপথের কথা এখনো হয় নি ফিকে।
আমি তো স্বাধীন স্বেচ্ছামৃত্যু আমার ছোঁয় না দেহ
তাকিয়ে রয়েছি, তোমার হাতের ছোঁয়ায় কি সন্দেহ?
ভারী কিছু আর চাপিয়ে না দেহে ছেড়ে দাও পথ, যাই-
মরণের দেশে স্মরণের মতো অপরূপ কিছু নাই
সবার উপর মৃত্যু সত্য এ কথা কে আর মানে
আমি আসিয়াছি, শেষে লোক আমি ভরে দাও জয়গানে।

www.pathagar.com

অজেয় শিবির

মোশারফ হোসেন খান

সাঁইত্রিশ বছর আগে, ভেদ করে প্রগাঢ় তিমির
সহসা স্বপ্নের কূলে ভিড়েছিল প্রদীপ্ত শিবির

তারপর ক্রমাগত চলেছে সম্মুখে, শংকাহীন
এসেছে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, তবুও সে হয়নি বিলীন
উধার পর্বত টপকে করেছে জয় হিমালয়
রক্তনদী আগুনের হলকা মেনেছে পরাজয়।

কালের বিস্ময় মানে ! কী কঠিন শিলাক্ষর কেটে
বিরুদ্ধ বাতাসে গুন টেনে শিবির চলেছে হেটে।
উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে জাগিয়েছে স্বপ্নভাসা তীর ,
তৌহিদী বন্দরে আজ লাখো নাবিকের ভিড়।

রক্তে রক্তে আকাশ হয়েছে লাল, লালের অধিক
শহীদের তাজা খুনে তবুও লিখেছো নাম ঠিক
এ কাফেলা থামতে জানে না, থামবে না কোনদিন
প্রবল প্রশ্বাসে বিশ্বব্যাপি জেগে রব অমলিন।

শিবির তো নয়, দুর্বার ঈগল ! ডানা তার ক্ষিপ্রগতি
চঞ্চু তো নয় ,সুদৃঢ় ইসপাত! ভেসে ওঠে এক জ্যোতি
সঙ্কট সঙ্ক্ষোভে সমান চলিষ্ণু মহা - দূরগামী,
মিথ্যার পাহাড় দলে ওড়ে কারা ? হতবাক আমি !

দুর্গম পথের ক্লান্তি ছিল ,তবু থামেনি খিজির
সমর-শহীদে থামবে না তুমি সাহসী শিবির।

সর্ব্বোচ্চ ত্যাগের দৃপ্ত মহিমায় লাখো আবাবিল
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ভেঙ্গেছো আরুদ্ধ খিল ।
আলোর পথে যাত্রী ! দুই ঝরা ও শিবির
রক্তের কালিতে লেখো ইতিহাস "অজেয় শিবির"।

শিবির-শিবির! অনন্তের তুমি শুভ্রতম পাখি
রক্তসিঁড়ি ভেঙ্গেছো বটে,তবুও বহু পথ বাকি।

www.pathagar.com

দেখেছি মায়ের কান্না

আবু সালেহ মোঃ ইয়াহইয়া

আমি দেখেছি কত মায়ের কান্না, বাবার আহাজারি
ব্যথিত হৃদয়ে মলিন বদনে আকাশ হয়েছে ভারী।
আমি দেখেছি কত মায়ের বুক যে হয়েছে ফাঁকা
সজল নয়নে আকাশ পানে নির্বাক চেয়ে থাকা।
আমি দেখেছি বোনের কপোল ভিজে ঝরছে অশ্রুধারা
ব্যাকুল হয়ে ভাইয়ের খোঁজে ফিরছে সর্বহারা।
আমি দেখেছি কত বাগানের ফুল অকালে ঝরে পড়া
বিকশিত হয়ে সুরভি ছড়ানো হলো না আর সারা।
আমি দেখেছি কত পাখির ছানার ভেঙেছে ডানা
পাখা মেলে তাই বিশ্বটাকে হলো না তার জানা।
আমি দেখেছি ওই যে শত তরুণের নিলাভ চেহারা
লোহার শিকলে পড়েছে বাঁধা যে অজুত স্বপ্নেরা ।
আমি দেখেছি কত ভাই আমার হয়েছে চোখ হারা
হাত-পা হারিয়ে চলছে তবু গৌরবে বুক ভরা।
আমি শুনেছি কত মজলুমানের আকুল ফরিয়াদ
শোষণ নিপীড়নে বিষাদে তার করুণ আর্তনাদ।
আমি শুনেছি বাতাসের বুকে ব্যাথার গুঞ্জরণ।
সত্যের আলো নিভিয়ে দিতে মিথ্যার আস্ফালন।
আমি জেনেছি কভু বিফলে যাবে না এই আয়োজন
নীরবে নিশিথে প্রভুর চরণে অশ্রু বিসর্জন।
আমি জেনেছি লাখো তরুণ আবার করছে নতুন পণ
বিজয় কেতন উড়াবার তরে লড়বে আজীবন।

(২৭ মে ২০১৩, কাশিমপুর কারাগার,পার্ট-২)

www.pathagar.com

অনিবার্য বিপ্লবের ইশ্‌তেহার

আসাদ-বিন হাফিজ

আমি আপনাদের সেই অনিবার্য বিপ্লবের জন্য
প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছি।
যে বিপ্লব সাধিত হলে
মানুষের শরীর থেকে খসে পড়ে শয়তানের লেবাস।
খুনীদের অশান্ত চিত্তে জন্ম নেয় বসরাই গোলাপ।
অর্ধপৃথিবীর দূর্দান্ত শাসক
কেঁপে উঠে ফোরাত কূলের কোন
অনাহারী কুকুরের আহার্য চিন্তায়।
আমি বুকের মধ্যে বিপ্লবের চাষ করতে বলছি।
যে বিপ্লবের চাষ করলে
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হয় জাফরাত বীথি।
যে বিপ্লবের চাষ করলে
নীল নদের আহার্য হয় অবাধ্য ফারাও।
আব্‌রাহার হাতি হয় পাখির খোরাক।
চুরমার হয়ে যায় রোম ও পারস্যের
বিশাল সালতানাতের দাম্ভিক চূড়া
ব্যর্থ হয়ে যায় কারুনের ধন।
আমি আপনাদের আসন্ন সেই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার
উদ্দাত্ত আহবান জানাচ্ছি।
যেখানে অন্ধকার সেখানে বিপ্লব
যেখানে ক্লেদাক্ত পাপ ও পঙ্কিলতার সয়লাব
সেখানেই বিপ্লব
যেখানে নগ্নতা ও বেহায়াপনার যুগল উল্লাস
সেখানেই বিপ্লব
যেখানে মিথ্যার অলীক ফানুস
সেখানেই বিপ্লব
যেখানে শোষণ ও সুদের অক্টোপাশ ক্যান্সার
সেখানেই বিপ্লব
বিপ্লব সকল জুলুম, অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে
বিপ্লব অন্তরের প্রতিটি কুচিন্তা আর কুকর্মের বিরুদ্ধে।
(সংকলিত)

শহীদি কফিন

এ,কে,এম নাজমুল হক

আর কত লাশ চাও খোদা তুমি হে
কত তরুণের প্রাণ,
চাওনা কি তোমার সবুজ মাটিতে
ধ্বনিতে তোমারী গান।
আর কত তরুণ খুনে রাঙিবে
রিক্ত হাতে আর ধ্বংশিব কত
হিংস্র তাগুতের ঘাঁটি
কত মায়ের বুক খালি হবে আর
প্রিয় হারা চোখ কাঁদিবে কত
অশ্রু যে নয়নে নাই।
ছেলে হারা মায়ের কান্না শুনে
কাঁপেনা বাতিলের বুক,
থামেনা তো তাদের খুন পিপাসা
ঘুছেনা মুমিনের দুঃখ।
আর কত বুলেট বিধবে বুকে
সইবে কত অত্যাচার,
আর কত কফিন বহিব প্রভু
হোকনা পুর্ণ বিজয় তোমার।

www.pathagar.com

এত শহীদ রক্ত ঢালে

মতিউর রহমান মল্লিক

এত শহীদ রক্ত ঢালে
তবু কেন তোমার বিবেক কথা বলে না
এত চোখের অশ্রু ঝরে তবু কেন
তোমার পাষাণ হৃদয় গলেনা হায়!
এত জুলুম চতুর্দিকে থাবা ফেলে প্রতিদিন
মজলুমানের লগ্ন করায় শোক বিহ্বল স্বপ্নহীন
এই অসহায় কাল বেলাতে
তবু কেন তোমার ঈমান
দ্বিগুণ জ্বলেনা হায়!
কোন ভয়ানক ঘুমের ঘোরে
তোমার সময় কাটছে আজ
অথচ হায় হাজার দুশমন
আঙিনাতে হাটছে আজ।
শান্তি প্রিয় মানুষ যখন
স্বস্তি হারা শংকাকুল
তখনও কি দৃষ্টি তোমার
অন্ধকারে বদ্ধমূল।
তখনও কি আলোর দিকে
দুঃসাহসে তোমার দৃপ্ত
কদম চলেনা হায়!

জাগরন

মু. ওমর ফারুক

ঘুমন্ত সিংহের দল, চল-চল-চল।
বেজেছে বিউগল, অস্ত্র তুলে চল।
ওঠ জেগে নিদ্রা হতে, ময়দানেতে শহীদ হতে,
তোমরা যদি উঠো জেগে, চল যদি স্রোত বেগে,
সকল শৃগাল ঢুকবে গর্তে, নাইতো হিম্মত ভূ-তে রতে।
নইলে রক্ত ঝরবে, প্রশান্ত ভরবে,
তুবুও মোরা পিছু হটবোনা, খালিদের দল পিছু হটতে পারে না,
হিমালয়ের বাঁধা ওতো রুখতে পারে না
প্রভূ ছাড়া কারো ভালবাসা বুঝে না।

www.pathagar.com

আমরা শিবির

ইউছুফ আবদুল হাসান

আমরা শিবির, সত্য-সেনা ন্যায়ের ঝান্ডা বই,
আসুক বাধা, মৃত্যু-ভীতি, শির নোয়াবার পাত্র নই
শত শহীদ হাত উঁচিয়ে পথ চিনিয়ে নেয় মোদের
এই মিছিলে সবার দিলে শহীদ হবার জজবা ঢের।

আগলিয়ে পথ দাড়ায় মোদের এমন সাহস নেই কারোর
আধার চিওে আনবো মোরাই আনবো ধরায় রঙিন ভোর
আমরা শিবির সত্য-পথিক, হেরার আলোয় পথ চলি
রক্ত গাঙে সাতার কাটি, বাধার পাহাড় যাই দলি।

আমরা শিবির, যাই ফুটিয়ে শুকনো ডালের ফুলকলি
নবীন কিশোর যুবার কানে সত্য কালাম যাই বলি
আল কোরআনের বিধান ছাড়া বুঝি নাই আর কিছু
জগৎ প্রভুর কাছেই কেবল হই প্রণত, রই নিচু
দিনের উপর আসলে আঘাত লাপায় দেহের সব বুঁধির
মজলুমের পাশে দাঁড়াই আমরা তরুণ নিযুত বীর
কালেমা আকা ঝান্ডা হাতে কাফন কাপড় মাথার তাজ,
মিথ্যা বাতিল দেখলে মোদের আঁতকে পালায় আঁধার

আমরা শিবির রই যে অধীর করতে কায়েম খোদার রাজ
শপথ মোদের সত্য-ভিতে গড়বো আবার এই সমাজ।

www.pathagar.com

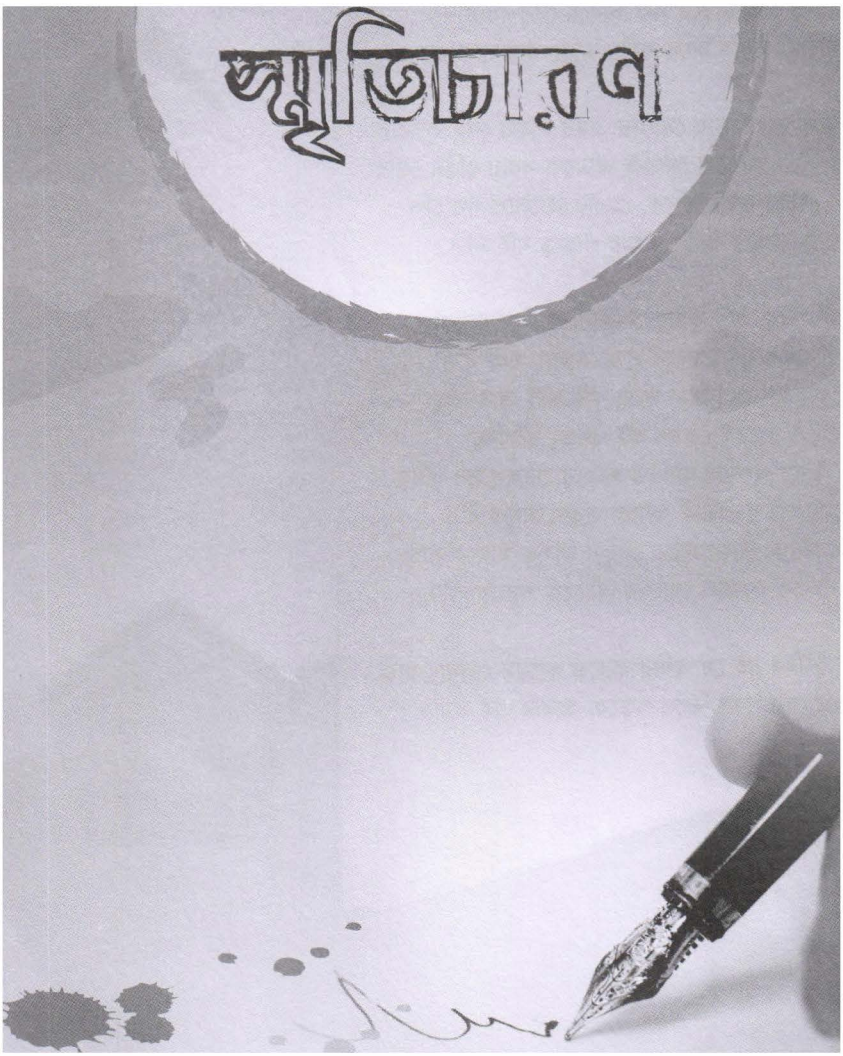

www.pathagar.com

স্মৃতিময় অতীত

মোফাচ্ছেরুল হক খন্দকার

গ্রামের নির্জন পথ। আমরা দু'জন বিপদগ্রস্থ নিরস্ত্র অবস্থায় দ্রুত পথ চলছিলাম, অপরিচিত পথ। ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় পথের তে-মাথায় গিয়ে পৌছলাম। হঠাৎ আওয়াজ উঠলো ডাকাত ! ডাকাত !! ঝোপ জঙ্গল থেকে পঁচিশ/ত্রিশ জন যুবক বর্শা, কোচ, রড, কিরিচ, উঁচিয়ে ছুটে আসছে। আমরা দুটি প্রাণী তিন রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। এতগুলো সশস্ত্র নরপশুর মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব হলেও ভীত সন্ত্রস্ত হলাম না। চোখের পলকে বর্শা ও রড ধারি দু'জন আমাদের সম্মুখ্যে পৌছে গেল। বিদ্যুত গতিতে শাহ আলম ভাইকে পেছনে দিয়ে আমি সামনে দাঁড়ালাম। রড হাতে প্রথম যুবকটি আঘাত হানল আমার মাথার উপর। আমি ডান দিকে হেলে গেলাম। আঘাত পড়ল আমার পাঁজরে। রড শরীরে যাওয়ার পূর্বেই আমি রডটাতে হাত পেঁছিয়ে হেছকা টান মারায় ছেলেটি পেছনে গিয়ে ছিটকে পড়লো। ততক্ষণে দ্বিতীয় যুবকটি আমার বুক লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়ে দিয়েছে। আমি চোখ বন্ধ করে হাতে পাওয়া রডটা পাখার মত ঘুরিয়ে দিতেই বর্শাটা তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে শুণ্যে উড়ে গেলে যুবকটা ভয়ে সরে গেল। এরই মধ্যে পাশের বাড়ির নারী-পুরুষ সবাই বেরিয়ে আসছে। চর্তুদিক থেকে ডাকাত দেখা বা মারার জন্য প্রচুর লোক ছুটে আসছে। আক্রমণকারীরাও আমাদের সম্মুখ্যে পৌছে গেছে। সময় নষ্ট না করে আমরা ছুটলাম পার্শ্বের বাড়ির দিকে। বাড়ির লোকেরা পথ রোধ করে জানতে চাচ্ছে ঘটনা কি? আমরা কারা, ওদের বাঁধা উপেক্ষা করে আমরা ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বলছি 'আমরা শিবির' মুহুর্তের মধ্যে দু'জন দুটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মালিক বাইরে আর আমরা ঘরের ভিতরে, আক্রমণকারীরা ঘর দু'টি ঘিরে ভাংচুর শুরু করে দিল। বাড়ির লোকেরা ঘর রক্ষার জন্য আক্রমণকারীদের বাধা দিচ্ছে ও শান্ত করার চেষ্টা করছে। মালিকদের কেউ কেউ আবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের পরিচয় জেনে নেওয়াতে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, আমরা ডাকাত নয় ছাত্রশিবির এর নেতা আর আক্রমণকারীরা আমাদের বিরোধী। গত কয়েক দিন থেকেই লোকজন জেনেছে যে, শিবির এর সাথে বিরোধীদের গন্ডগোল হচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ক্ষেপে গেল আক্রমণকারীদের উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে আক্রমণকারীরা খানিকটা নেতিয়ে পড়ে। এসময় আবার নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। একজন বৃদ্ধ মহিলা চিৎকার শুরু করলো "এই ঘরের ভিতর আমার বৌ আছে, তোরা তাকে উদ্ধার কর।" সবাই মিলে মিশে এবার আমাদের ঘরের দরজা ভাঙতে উদ্যত হলো। এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি দরজাকে ঠেলে রেখে চিৎকার দিয়ে বলছি, 'ঘরের ভিতর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।' এমন সময় শোনা গেল বৌ এর কণ্ঠ "আম্মাগো আমি বাইরে।" বৌ এর সাথে আরো নতুন লোক এসেছে তারা দৃঢ়তার সাথে সবাইকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিল। বৌ সম্ভবত প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরে আরো লোক ডেকে আনতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। এরই মধ্যে ওই এলাকার চেয়ারম্যানও কাকতালীয়ভাবে সেখানে এসে হাজির হলো। অধিকাংশ নারী-পুরুষ ও এসময় হামলাকারীদের গালাগালি শুরু করেছে।

www.pathagar.com

অবস্থা বেগতিক দেখে হামলা কারীদের অনেকেই সরে পড়েছে। নেতা গোছের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করায় তারা স্বীকার করলেন যে, তারা বিরোধী ছাত্র সংগঠনের লোকজন। আমাদেরকে মুরব্বী বয়সের কিছু লোক বাহিরে আসার আহবান করলে আমরা ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম।

শাহ আলম ভাই কোম্পানীগঞ্জেরই ছেলে এবং মেধাবীছাত্র। ওনার পরিচয় জানতে পেরে সবাই উনাকে আদর যত্ন করতে লাগলো এবং ঘটনার জন্য আফসোস করতে লাগলো। শাহ আলম ভাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনি মোফাচ্ছের ভাই, ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী মহকুমা সভাপতি। আজ সকালেই আমাদের দেখার জন্য ফেনী থেকে এসেছেন। পরিচয় জেনে সবাই আমাদের চারদিকে ভিড় শুরু করল। শতাধিক জনতার পলকহীন দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। ওদের আগ্রহ দেখে আমি কথা বলতে শুরু করলাম। "আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে, গত কিছুদিন থেকে সরকারের উস্কানিকমূলক কথা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সব বিরোধী দল সারা দেশে ছাত্রশিবিরের উপর হামলা চালাচ্ছে। ওরা অফিস ভাংচুর সহ কোরআন হাদীস সবই পার্শ্ববর্তী খালের পানিতে নিক্ষেপ করে। মসজিদের ইমাম সাহেব কোরআন হাদীসের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে জু'মার নামাজে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ওরা ইমাম সাহেবকেও মসজিদ ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিবির কর্মীদের উপর হামলা করছে। প্রশাসন ও হামলাকারীদের সহযোগিতা করায় শিবিরের ছাত্ররা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। গত কলেজ নির্বাচনে আমরা কলেজ প্রাঙ্গনে সভা ডেকেছিলাম। সেই সভা পন্ড করার জন্য মুজিববাদী ছাত্রলীগও একই সময় সভা ডাকে, তারা প্রধান অতিথি রাখে কেন্দ্রীয় নেতা ওবায়দুল কাদের সাহেবকে। তিনি কোম্পানীগঞ্জেরই ছেলে (বর্তমানে মন্ত্রী)। অপরদিকে শিবিরের প্রধান অতিথি ছিলাম আমি। সাধারণ ছাত্ররা প্রত্যাখ্যান করায় ছাত্রলীগের সভা পন্ড হয়ে যায়। শিবিরের বিপুল লোক সমাগমের মাধ্যমে সভা সম্পন্ন হয়। তখন থেকেই ওরা ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নির্বাচনের দিন ওরা তাদের ভরাডুবি অনুমান করতে পেরে ভোট বানচাল করে দেয়। সেদিনও আমি উপস্থিত ছিলাম। একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে সেদিন আমি শিবিরকে বিরত রাখি। সেদিন বিরোধীরা প্রকাশ্যে আমাকে হত্যার হুমকি দেয়। আজ তারা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সুযোগ গ্রহণ করেছে মাত্র।" এত টুকু বলে থামলাম।

এ সময় বাড়ির আঙিনা জনসভায় রূপ নেয়। সবাই নিরব শ্রোতা আর আমি স্বদ্যোগী বক্তা। কথা থেমে যাওয়াতে কয়েকজন বলে উঠলো আজকের ঘটনা বলুন। আবার শুরু করলাম, কোম্পানীগঞ্জের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা। ফেনীতে পৌঁছার পর আমি খবর পাঠাই শাহ আলম ভাইয়ের নিকট। আমি আসছি আপনি থাকবেন। সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তিনি মাদরাসা ক্যাম্পাসে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি এসে ওনাকে নিয়ে আজ সকাল বেলায় থানায় যাই। চিন্তা ছিল থানা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হবে। থানার দারোগা বললেন ওসি সাহেব নোয়াখালী গেছেন। দারোগা সাহেবের সাথে কথা বলতে চাইলাম। উনি ব্যস্ততা দেখিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। এসময় ছাত্রলীগের দু'জন ক্যাডার এসে ওনার সাথে গোপনে কথা বলে চলে গেল। দারোগা সাহেব বললেন কোন রাজনৈতিক আলোচনা করতে তিনি অপারগ। সাথে সাথে একথাও বললেন আপনি ফেনী চলে যান, এখানে আপনি নিরাপদ নন। থানা থেকে বের হয়ে আমরা বাজারের দিকে পথ চললাম। কোম্পানীগঞ্জ থেকে ফেনী যাওয়ার একটি রাস্তা বিধায় অন্যদিকে যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

www.pathagar.com

এসময় লক্ষ্য করলাম কিছু যুবক আমাদের অনুসরণ করছে। আক্রমণ অত্যাসন্ন দেখে বাজারে সংগঠনের শুভাকাংখী কাঠ ব্যবসায়ী মুক্তিযোদ্ধা কালাম ভাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ি। তিনি আমাদেরকে কাঠের দোতলায় রেখে উনি নিচে দোকানে বসে থাকেন। তখন মুরুব্বিরা এসে আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য উনাকে চাপ দিতে থাকে। উনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলে বিরোধীরা দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। নিরুপায় হয়ে উনি গোপনে পেছনের দরজা দিয়ে আমাদেরকে রিক্সায় তুলে দেন। শাহ আলম ভাইকে এই সুযোগে সরে যেতে অনুরোধ করলাম। রিক্সাওয়ালা কিছু অনুমান করতে পেরে বললেন কিছুক্ষণ পূর্বে মাইলখানেক দূরে একদল যুবক কাউকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করতে সে দেখে এসেছে। বুঝতে পারলাম ওরা পথে ব্যারিকেড বসিয়েছে। সামনে আর না এগিয়ে রাস্তার পার্শ্বে শুভাকাংখী হেকিম শহীদ ভাইয়ের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। তিনি আমাকে দেখে আৎকে উঠলেন। সংক্ষেপে কথা হলো। এসময় সাইকেলে চড়া এক লোক এসে আমাদের দেখে গেল। বুঝে নিলাম এখনো ওদের নজরের বাইরে যেতে সক্ষম হইনি।

শহীদ ভাই পরামর্শ দিলেন পূর্ব দিক দিয়ে গ্রামের পথ ধরে চৌধুরী হাটের দিকে রওয়ানা হলাম। আর আপনাদের এলাকায় এসে সরাসরি আক্রান্ত হলাম। ওদের ভাষায় আমরা ডাকাত আর ওরা সাধু। এই বর্ণনা শুনে অনেকে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে শান্ত করলেন। সবাই মিলে আমাদেরকে অনেক দূর পথ এগিয়ে দিলেন যানবাহন শুণ্য গ্রামের পথ। পথের দু'পাশে বিশাল মাঠ। সামনে একটি বাড়ি ব্যতীত আর কোন জনবসতি নেই। কিছুক্ষণ পরই শোরগোল শুনে তাকিয়ে দেখি ওরা আবার দলবদ্ধ ভাবে ধেয়ে আসছে। এবার আল্লাহর অলৌকিক সাহায্য ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই জেনেও সম্মুখে দৌড়ে যাচ্ছি। এর পূর্বে আরো দু'দুবার বিভিন্নভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তখনো আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সাহায্যকারী ছিল না। আমার মৃত্যুর সংবাদও প্রচারিত হয়েছিল। তারপরও আল্লাহর ফয়সালার উপর আমার দৃঢ়তা সবসময়ই অপরিসীম। দৌড়ের উপর সেই বাড়িটির নিকট পৌঁছতে না পৌঁছতেই দু'জন গ্রাম্য গৃহবধূ ঝাঁটা হাতে ঝড়ের বেগে রাস্তায় উঠে এলো। ওরা ঝাঁটা উচিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগল ধাবমানকারী নরপশুদেরকে। বাড়ির ভিতর থেকে একটা রিক্সা বেরিয়ে এল। মহিলা দু'টি বলে উঠল বাবা ! তোমরা রিক্সায় করে চলে যাও। আমরা রিক্সায় উঠতেই বৃদ্ধ লোকটা ঝড়ের গতিতে টান দিল। বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা বাক নেওয়াতে আর কিছুই দেখতে পেলাম না। দুটি মহিলা ওদেরকে কিভাবে ঠেকিয়েছে তা কিছুই জানতে পারিনি। অনেক দূর আসার পর রিক্সাচালক নিজ থেকেই বললেন আমরা শুনেছি, ইসলামী দলের দুটি ছেলেকে পাশের গ্রামের বেদ্বীন ছেলেরা মেরে ফেলেছে। আমরা ঘরে বসে সেই কথা নিয়ে আক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় গোলোযোগের শব্দ শুনা যায়। ঘটনা সেখানে আন্দাজ করতে পেরে মেয়ে-ছেলেরা আবার রাস্তায় বের হয়ে যায়। হাঁফাতে হাঁফাতে কথা বলতে খুব কষ্ট হলেও তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তি এসে ভর করায় বৃদ্ধের কথায় সাড়া দিতে পারলাম না। শাহ আলম ভাইকে চৌধুরীর হাটের পার্শ্বে নামিয়ে সাথী ওয়াহেদ ভাইদের বাড়ি যেতে বলে আমি সেই রিক্সায় দাগনভূঁইয়ার দিকে রওয়ানা হলাম। পথে জোহর ও আছর এক সাথে আদায় করলাম। দাগনভূঁইয়াতে পৌঁছে কয়েকজন কর্মীর সাক্ষাৎ পাই। ওরা আমার খবর জানার চেষ্টা করছিল, মৃত্যুর গুজব ওদের কানেও পৌঁছেছিল। আমাকে দেখে ওদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে, একটু হেসে বললাম আমি ঠিক আছি, আপনারাও সতর্ক থাকতে হবে।

www.pathagar.com

রাতে বাসায় পৌঁছে দেখি আম্মা সেজদায় পড়ে আছেন। বুঝলাম মৃত্যুর গুজব এখানেও পৌঁছে গেছে। স্মৃতির পাতা এতই ঘটনা বহুল যে, সীমিত পরিসরে কোনগুলো লিখবো আর কোনগুলো রাখবো ভেবে নেওয়ার বিরতিও পাচ্ছি না। তবুও ছাত্রশিবির এর জন্মলগ্নের ঘটনার কিছু কিছু আজকের ছাত্র সমাজের জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করছি।

আমাদের স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার আয়োজন করতে থাকে। অধ্যাপক আবুল ফজল ও ডঃ কুদরত ই-খুদা এই আয়োজনকে পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছিল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক থেকে কোরআনের খোদাই করা আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইলমা' সরকার উপড়ে ফেলে দেয়। ইসলাম প্রিয় ছাত্রসমাজের নিকট এসব অসহনীয় হলেও কিছু করার সুযোগ পাচ্ছিল না। সে সময় সরকার বিরোধী জাসদ ছাত্রলীগ মুজিববাদী ছাত্রলীগের সাথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আর শুধু সমাজতন্ত্র নিয়ে অস্ত্র বাজি এবং লাঠালাঠিতে লিপ্ত ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ফেনীর বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফেনী কলেজে মিছিল-মিটিং এর মাধ্যমে শিবিরের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। ১৯৭৮ইং ৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা ক্লাশ শুরু হওয়ার পূর্বেই আমরা প্রচারপত্র বিলি করে দিলাম। বিশাল এক মিছিল বের করলাম। ছাত্রলীগ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো, আমরা বাধা উপেক্ষা করেই মিছিল করলাম। পরদিন থেকে সর্বদলীয়ভাবে ওরা শিবিরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। লাগাতার মারামারি চলতে লাগলো। শিবিরের সাথী লুৎফুল্লাহ, শাখাওয়াত ভাইসহ অনেকে গুরুতর আহত হলো। ওরা আমাদেরকে উৎখাত করার মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। আমরাও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এসময় আমরা উত্তর পাশের হোস্টেলের প্রথম কামরা দখল করে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে নিলাম। ফয়েজ ভাই ও আমি শত প্রতিকূলতার মাঝেও হোস্টেল রাত্রি যাপন শুরু করে দিলাম। নিয়মিত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বিপুল ছেলে আহত হতে লাগল। আমাদের মধ্যে কেফায়েত ভাই, ফয়েজ ভাই, হাসান, মাহমুদ ভাই ও এনাম ভাই সহ আরো অনেকেই আহত হলো। তবুও আমরা মাঠ ছাড়লাম না। ওরা নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমঝোতা বৈঠক এর ব্যবস্থা করলো। কলেজের দোতলায় শিক্ষক মিলনায়তনে অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বৈঠক বসল। শিবিরের প্রতিনিধি হিসাবে আমি বৈঠকে যোগ দিলাম। দীর্ঘ দুই ঘন্টার বিতর্কে আমাদের কথা একটিই ছিল, কলেজের সকল কর্মতৎপরতায় ছাত্রশিবিরের সমান অধিকার থাকতে হবে। আঘাত করলে পাল্টা আঘাত হানা হবে। শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে প্রস্তাব দিলেন, কলেজ আঙ্গিনায় সকল সংগঠনের মিছিল বন্ধ করার জন্য। এই নিরিখে একটি চুক্তিনামা তৈরি করা হয়। এতে কলেজের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের পক্ষে স্বাক্ষর করে জাসদ ছাত্র লীগের নেতা আবদুল হক এবং শিবিরের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর করি। এরপর মারামারি বন্ধ হওয়ায় আমরা প্রচুর সাংগঠনিক কাজ করার সুযোগ পেলাম। অপরদিকে ফেনী পলিটেকনিক্যাল সহ অন্যান্য কলেজগুলোতে মারামারি ছড়িয়ে পড়ে। পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে মুজিব বাদী ছাত্রলীগ আমাদের সাথে সংঘর্ষে এসে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের চোরাগুপ্তা হামলায় সাথী নুরুল্লাহ ভাই গুরুতর আহত হয়েছিল (বর্তমানে ঢাকায় ব্যবসা করছেন)। পলিটেকনিক্যালে শিবির কামরুল ভাইয়ের নেতৃত্বে স্মরণযোগ্য বিজয় লাভ করে (তিনি বর্তমানে ফেনীতে কর্মরত আছেন)। সংসদের বাকি পদগুলো জাসদ ছাত্রলীগ লাভ করে। সেটা ছিল আমাদের প্রথম নির্বাচন।

www.pathagar.com

আমাদের সেই বিজয়ে জেলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালে ফেনী কলেজ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। শুরু হয়ে যায় মিটিং মিছিল। পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলগুলো আমাদের মিছিলে হামলা করে। সেই সংঘর্ষে কেফায়েত ভাই ও আমি গুরুতর আহত হই। আমার ডান হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। এই সংঘর্ষের ফলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আমাদের সমর্থন বেড়ে যায়। আহত অবস্থায় আমরা ভোটারদের বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করি। আমাদের প্যানেলে ভিপি ছিলেন টিপু ভাই (বর্তমানে সৌদি আরবে আছেন), জি.এস. ছিলেন সাফি ভাই (বর্তমানে ব্যবসায় আছেন), এ.জি.এস ছিলাম আমি। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আমাদের সাথে জোট বাঁধার এবং পদ ভাগাভাগির প্রস্তাব দেয়। আমরা তা প্রত্যাখ্যান করায় তারা সরকারী দল হিসাবে ক্ষেপে যায়। প্যানেল পরিচিতি সভায় আমাদের বক্তৃতা সাধারণ ছাত্রদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে বিরোধীদের বক্তৃতা এলোমেলো হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের পরিচয়টুকুও তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের দিন ১২টার পূর্বেই আমাদের বিজয় সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অন্যান্যদের সাথে আঁতাত করে ব্যালট ছিনতাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচন বানচাল করে দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ফেনী সরকারী কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এরপর দেওয়া হলো ছাগলনাইয়া কলেজের নির্বাচন। সেখানেও একই ঘটনার অবতারণা হলো। ভোট গণনার সময় ভোট বানচাল করে দেয়া হল। হামলাকারীদের প্রতিহত করতে গিয়ে ভি.পি. প্রার্থী মহিউদ্দিন খন্দকার ভাই ও আমি আহত হই। সোনাগাজী কলেজের বিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়ায় তারা নির্বাচনে আসতে সাহস পায়নি। তারা গন্ডগোলের অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচন থেকে বিরত থাকে।

১৯৭৯-৮০ সালে আমার উপর জেলা সভাপতির দায়িত্ব বর্তায়। ঐ সময় সারাদেশে জিয়া সরকার শিবিরকে উৎখাতের জন্য চরম আঘাত হানা শুরু করে। সরকারী দলের সাথে জোট বেধে বাকি বিরোধী দলগুলোও সর্বত্র আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরপর ৮২ সালে এরশাদ সরকারের সামরিক শাসন রাজনৈতিক গতিধারায় চরম আঘাত হানে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যা কিছু স্মরণ হলো তার কিছু অংশ মাত্র লিখলাম। বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বাদ পড়ে যায় তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আজ এখানেই শেষ করলাম।

লেখক
সাবেক শহর সভাপতি

এ মিছিল রুখতে পারে সাধ্য কার?
এ কাফেলা আল্লাহ ছাড়া বাধ্য কার?

www.pathagar.com

স্মৃতি কথা

এ এস এম আলা উদ্দিন

বাংলাদেশের ইতিহাসের পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ফেনী একটি আলোচিত জেলা । ফেনী নদী বিধৌত ফেনী জেলার রয়েছে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিন পূর্বাংশে এর অবস্থান । এ জেলার সাথে রয়েছে তিনটি জেলার এবং রয়েছে প্রতিবেশী দেশের সীমান্তও। আদিকাল থেকেই এ জেলার মানুষ বন্ধু সূলভ এবং অতিথিপরায়ন। এ ছাড়াও তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি, ভূমিকা সবই কেমন জানি একটু ভিন্ন ধরনের। আন্দোলন সংগ্রাম, জ্ঞানীগুণি, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ ছাড়াও জাতীয় জীবনে যারা আলোচিত তাদের অনেকের জন্ম ও বেড়ে উঠার সাথে জড়িত এ জেলার মাটি ও মানুষ। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় এ জেলায় ইসলামী আন্দোলনের পথে কিছু সময় এবং কয়েকটি বছর কাটিয়েছি। যা আমার ব্যক্তি জীবনে প্রেরণা হয়ে আজও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সালের জুলাই থেকে ১৯৯২ সাল পযর্ন্ত সময়টি ইসলামী আন্দোলনের কাজে এ জেলাতেই কাটিয়েছি। ফেনী জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া ছিল আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমি ছিলাম লক্ষীপুর জেলা সভাপতি। অসুস্থতার কারণে বাড়ীতে ছিলাম। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসে রাত ৪টায় তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল শ্রদ্ধেয় আ.ন.ম শামছুল ইসলাম ভাই জানালেন, এখন থেকে ফেনী জেলাতে দায়িত্বপালন করতে হবে । যোগ্যতার বিচারে আমি এ পদের উপযুক্ত না হলেও শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে ফেনীর উত্তপ্ত ময়দানে সে দিন কাজ শুরু করেছিলাম । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ফেনী একটি আলোচিত জেলা হলেও তৎকালীন সময়ে ফেনীতে ছিল ছাত্রলীগের এবং ছাত্রসমাজের ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু এ জেলার সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, কর্মী ভাইদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, খুলুসিয়াত এবং সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যে ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁঞা, এবং সোনাগাজীতে সাধারণ ছাত্রদের প্রানের সংগঠনে পরিনত হয় আমাদের এ সংগঠনটি। পাশাপাশি ছাত্রলীগের একচ্ছত্র দাপটও কমে আসে। অপর দিকে ফেনীর আলোচিত জয়নাল হাজারীও অনেকটা সহাবস্থান মেনে নিতে বাধ্য হয় । এভাবে আল্লাহপাকের একান্ত মেহের বানীতে জেলার প্রায় প্রতিটি ঘরে পৌছে যায় তৌহিদের জ্যোতি। আর এর পেছনে যে দুটি ভাই সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছিলেন আল্লাহপাকও তাদের কে মর্যাদার সাথে নিজ দরবারে ডেকে নিয়েছেন। তারা হলেন শহীদ কাজী মোশাররফ হোসেন ও শহীদ একরামুল হক খাঁন।

এ ছাড়াও ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ এবং ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজের ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে আমাদের সংগঠন। মিজানপাড়া, কুমিল্লা বাসস্ট্যান্ড, একাডেমী এলাকা, পুরাতন পুলিশ কোয়াটারে ঘরে ঘরে আমাদের নিবেদিত প্রাণ কর্মী ভাইয়েরা সংগঠনকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে আনতে সক্ষম হন। কোন পেশী শক্তির দ্বারা নয় বরং দাওয়াত ও আদর্শের সঠিক প্রচারের মাধ্যমে। আর এ কাজে আমদের সবচেয়ে বেশী

www.pathagar.com

প্রেরণা দিয়েছেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত জনাব মকবুল আহমাদ। জুলুম-নির্যাতন, হামলা-মামলা আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। যারা এ দ্বীনি আন্দোলনের জন্য যত বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছেন আল্লাহ পাক তাদের ততবেশী সম্মানিত করেছেন।

পরিশেষে শহীদদের জন্য আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনাকরি এবং দ্বীনের পথের সকল পর্যায়ের কর্মীর জন্য দোয়া করি তারা যেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে ধৈর্য্য ও দূরদর্শিতার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন । আমীন।

লেখক
সাবেক জেলা সভাপতি
ও সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য

জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত
মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে
হেসে উঠে যবে
জিন্দেগানী।

-ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

দুঃসহ স্মৃতি:- দিদারুল আলম মজুমদার

উনিশ শত পঁচানব্বই সালের শুরুর দিকে ছাগলনাইয়া থানা সভাপতি থেকে ছাগলনাইয়া সাথী শাখার সভাপতি হওয়ার পর পরই ঈদুল ফিতর এসে গেল। পরিকল্পনা চলছে ঈদ পূণর্মিলনী করার। ইউনুস ভাই ফেনী-১ আসনে প্রার্থী হতেন বিধায় উনাকে প্রধান অতিথি করে জি এম হাট বাজারে বড় আকারে ঈদ পূণর্মিলনী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে আমাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। দাওয়াতী কাজে মাইকিং করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। হঠাৎ খবর এলো ছাত্র ও যুবদল আমাদের প্রোগ্রাম করতে দেবে না।

জরুরী ভিত্তিতে আবার বৈঠকে বসলাম। যাবতীয় প্রস্তুতির জন্য ছাগলনাইয়া কলেজ সভাপতি আজিম ভাইকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরদিন দুপুরে অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমিসহ আরো কয়েকজন জি এম হাট গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের গ্রুপকে যে স্পটে রাখল সে স্পট কিছুক্ষনের মধ্যে ছাত্র ও যুবদল এর ক্যাডারদের কন্ট্রোলে চলে গেল। আমরা মঞ্চে গিয়ে দেখি সেখানেও তখনকার সোনার ছেলেরা উপস্থিত হয়ে চেয়ার ভাঙ্গা শুরু করেছে। আমাদের স্থানীয় সংগঠন প্রোগ্রাম স্থগিত ঘোষনা করেন। এরপরও তারা আমাকে টার্গেট করেছে মেরে ফেলার জন্যে। আমার সাথে যারা গিয়েছিল তারাও কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। এই সুযোগে তারা প্রথমে আমার মাথা ইট মেরে ফাটিয়ে দেয়। আমি হুশ হারিয়ে ফেলি। এরপর আমাকে তারা ঘেরাও করে। আমার হুশ আসার পর ঘেরাও অবস্থা দেখে আমি উপস্থিত বাজারে বিক্রয়যোগ্য লাকড়ির স্তুপ থেকে একটি লাকড়ি নিয়ে এলোপাতাড়ি মারা শুরু করলে তারা আমাকে বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে দেয়। আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ইস্কান্দার সাহেবের ফার্মেসীতে গিয়ে ঢুকে পড়ি। পরে সন্ত্রাসীরা সেখানে এসেও আমাকে খুঁজতে লাগলো। ডাক্তার সাহেব বললেন সে চলে গেছে, এখানে নেই। পিছনে বসে একথা আমি শুনতে পেলাম। সন্ত্রাসীদেরকে বিদায় দিয়ে ডাক্তার সাহেব এসে আমাকে বললেন আপনার এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। একথা শুনে পূর্ব দিক দিয়ে এক বাড়ীতে চলে যাই। আমার চিকিৎসাও দরকার। ইতিমধ্যে দেখি আমার মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সালাতুল মাগরিব এর আজান হয়ে গেল। একজন ভাই আমাকে নিয়ে যায় আরও পূর্ব দিকে ফয়েজ ভাইদের বাড়ীতে। আজানের পর কিছু পথ হেটে ও কিছু পথ রিক্সাযোগে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ছাগলনাইয়াতে। সেখানে ডাক্তার মুজিব সাহেব অনেক চেষ্টা করেও কোন ভাবে আমার মাথা সেলাই করতে পারেননি। তাই উনি ফেনীতে রেফার করলেন। ফেনীতে ডাক্তার শাহ আলম ভাই অনেক চেষ্টা করে আমার মাথার সামনের অংশে চারটি সেলাই ও পেছনে তিনটি সেলাই দিয়ে ঔষধ পত্র দিলেন। প্রায় পনের দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যাই। ঐ দিন ইউনুস ভাই প্রধান অতিথি হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য ঢাকা থেকে ফেনীতে পৌঁছে এ ঘটনা শুনার পরও তিনি যেকোন মূল্যে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন বলে উনার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। তখন ওনার সাথে থাকা সকলেই এতে বাধ সাধেন। পরিশেষে পরবর্তী জু'মাবারে ইউনুস ভাই জি এম হাট বাজার জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জু'মার মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে অত্র ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কঠিন বক্তব্য রাখেন। এমনি এক সাহসী ভুমিকার ফলে সকলে ইউনুস ভাইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন " এমন সাহসী নেতাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন।

লেখকঃ সাবেক কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

ফেলে আসা দিনগুলো

এ এ এফ এম আয়াজ

শহীদি কাফেলার অগ্রযাত্রায় যারা আমাদের চাইতে বহুগুণ কঠিন ময়দানে সাহসী ভূমিকা রাখছেন তাদের সাথে শরীক থাকতেই আমার এই লিখা ।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যখন ফেনী জেলার সভাপতি হই, তখন হাজারির মত দস্যু রাজার রাজত্ব আর আওয়ামী সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার ফেনীর প্রতিটি জনপদ। সারা দেশে চলছে সরকার বিরোধী আন্দোলন। এ অবস্থায় আমার মত ছোট খাট দুর্বল মানুষটি আগন্তুক হয়ে জেলা সভাপতি হিসাবে সংগঠন ও বিরোধী দলের আন্দোলনে সঠিকভাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া ছিল খুবই কঠিন। নতুন জেলার সহকর্মী, রাস্তাঘাট, শহর সবই ছিল অপরিচিত। চেনা জানা আপনজন বলতে কে আছে? ভয়, শঙ্কা, নিজের প্রতি আস্থাহীনতায় প্রচন্ড অসহায় লাগছিল । কিভাবে আঞ্জাম দিব এ কঠিন জিম্মাদারি। শহীদ ভাইদের রক্তস্নাত এ কাফেলার অগ্রযাত্রায় আমার ভূমিকা কি হবে এ সব ভাবনার মধ্য দিয়েই শুরু হল পথ চলা। মহান আল্লাহর সাহায্যে এই কঠিন কাজ গুলো অনেক সহজেই হয়ে গেল ।

অচেনা, অপরিচিত আপনজন নয় তারা সবাই অল্পদিনেই অনেক অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক হয়ে গেলো। সকলের আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান আর আন্তরিক শুভ কামনায় অনুভূত হলো আপন আর নিকট জনে ভরপুর এক জান্নাতি পরিবেশ। ভিন্ন এলাকা হতে আসা মানুষটিকে দ্বীনের জন্য কতই না ভালবাসা আর আন্তরিকতা দিয়ে সবাই পূর্ণ করলেন মনের সব শুণ্যতা । ভ্রাতৃত্ব আর দরদপূর্ণ সম্পর্ক আমাদেরকে সত্যের পথে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে শক্তি যোগায়। এ সম্পর্ক যত গভীর ও শক্ত হবে ততই আমরা শক্তিশালী হবো ।

আজ একটি অনুভূতি ও স্মৃতির কথা দিয়ে শেষ করবো-

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে চার দলীয় জোটের বিজয়ের পর সংগঠন গোছানো ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনে মুহতারাম আল্লামা সাঈদী সাহেবকে মেহমান করে একটি বড় প্রোগ্রাম করার পরিকল্পনা নেয়া হয় । সে আলোকে আমি মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবকে দাওয়াত দেয়ার জন্য ফোন করি। বিশাল ব্যক্তিত্ব, আকাশচুম্বী জনপ্রিয় মানুষটিকে ফোনে দাওয়াত দিতে গিয়ে মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম । আমি ফোন করে তাকে বললাম মুহতারাম চট্টগ্রাম এর মাহফিল শেষে যাবার পথে আপনাকে মেহমান করে শিবিরের পক্ষ হতে একটি মাহফিল করবো । তিনি খুব সহজেই রাজি হয়ে বললেন "ঠিক আছে আমি সময় দিব।" কোন প্রটোকল কিংবা সেক্রেটারির নিকট পাঠাননি । অগ্রিম বুকিং মানিও দিতে হয়নি । সরাসরি গিয়ে দাওয়াত না দিয়ে ফোনে কেন দাওয়াত দিলাম তাও ধরলেন না । আমার মত পূর্ব ঘনিষ্ঠতা ছাড়া একজন সাধারন ব্যক্তির দাওয়াত নিলেন আবার যথা সময়ে আসলেনও। এ প্রোগ্রাম উপলক্ষে পুরো জেলায় আমরা বেশ ভাল টাকা কালেকশান

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হই। মাহফিল শেষে মুহতারাম জেলা আমীরকে বললাম মেহমানের খরচের টাকা কত দিব? তিনি বললেন তোমাদের তো কালেকশান ভাল হয়েছে, মাওলানা সাঈদী সাহেবের নির্বাচনে অনেক টাকা খরচ হয়েছে তাই বাড়িয়ে দাও । আমরা মাত্র ৭,০০০/- টাকা দিলাম । সেদিন অনুভব করলাম মাওলানা সাঈদী সাহেব শিবির কে কত ভালবাসেন । টাকা তার নিকট কোন বিষয় ছিল না, দ্বীনের কথা বলতে পারা ছিল মূল। আজ সে মহান মানুষটি শাহাদাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন ভাবতে মন ভেঙ্গে যায় ।

সর্বশেষ মুহতারাম আল্লামা সাঈদী সাহেবের সাথে দেখা হয় সৌদি আরবের জিজান ও খামিচ সফরে। সেদিন তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন সমুদ্রের পানিতে ঢেউয়ের অনেক শক্তি কিন্তু এক বালতি বা এক কোশ পানি যদি আলাদা করা হয় তখন তার কোন শক্তি থাকে না। সংগঠন ছাড়া আমি সাঈদী জিরো। দোয়া করবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন সংগঠনের সাথে থাকতে পারি । আজ আল্লামা সাঈদী, মুহতারাম নিজামি সাহেব সহ অনেকেই ফাঁসির অপেক্ষায় । আর আবদুল কাদের মোল্লা ভাই শহীদ হয়ে চলে গেলেন । এখন আমাদের বেঁচে থাকা গৌণ হয়ে গেছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে শপথ নিতে হবে তাদের যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব শাহাদাতের বদলা নেয়ার।

লেখক
সাবেক জেলা সভাপতি

জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত
মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে
হেসে উঠে যবে
জিন্দেগানী।

-ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

সাবেক জেলা সভাপতিদের স্মৃতিচারণ মূলক

সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

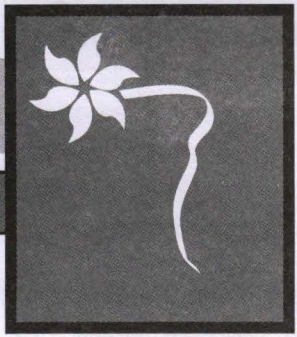

নামঃ মুহাম্মদ আইয়ুব আলী হায়দার

সেশন ঃ ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ জুন

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে সংগঠনে এসেছেন ?

উত্তর ঃ ১৯৭৭ সালের শুরুতে জনাব ফখরুল ইসলাম ভাইয়ের (সাবেক কলেজ সভাপতি) দাওয়াতের মাধ্যমে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হই।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অণুপ্রাণিত করবে।

উত্তর ঃ

(১) ১৯৮৭ সালে আমি জেলা সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বপালন করি। ছাগলনাইয়া কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সাবেক জেলা সেক্রেটারী কামরুল আহসানের উপর। নির্বাচনের দিন সকাল ১০টায় শুরু হয় সংঘর্ষ । ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, জাসদ, বাসদ ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রসমাজ ও ছাত্রইউনিয়ন বনাম ছাত্রশিবির। সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে কামরুল ভাই মানসিক চাপে যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এমন কি কামরুল ভাইয়ের কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মী বাহিনী দিক নির্দেশনার অভাবে শুধু এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। এরপর আমি কলেজের সামনে বটতলায় ৮/১০ জন দায়িত্বশীলকে ডেকে সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রায় বেলা ২:৩০ টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে । আল্লাহর অশেষ সাহায্য এবং কর্মী বাহিনীর সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করে ময়দানে টিকে থাকায় আমরা বিজয় লাভ করি।

(২) ১৯৮৯ সালের শুরুতে নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে ফালাহিয়া মাদরাসার হলে আমি শপথ গ্রহন করি। প্রোগাম চলছে কেন্দ্রীয় মেহমানের উপস্থিতিতে । এ সময় সংবাদ পেলাম দাগনভূঁঞা কলেজ সভাপতিকে হত্যা করা হয়েছে। তখন অন্যান্য সদস্যরাসহ পরামর্শ করে জেলা সেক্রেটারীসহ ৩ জনকে ময়দানে পাঠালাম। প্রোগাম সংক্ষেপ করে আমি ও শহর সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক ভাই সহ দাগনভূঁঞা আসলাম। ময়দানে কর্মী বাহিনী প্রস্তুত ছিল । শুরু হল প্রতিবাদ মিছিল । বিক্ষুব্ধ কর্মীদের হাতে নানা ধরনের ফেস্টুন। জনতা হাজারীর স্টিয়ারিং কমিটির হোতাদের বিরুদ্ধে শিবিরের প্রতিবাদ দেখছিল এবং উৎসাহ জুগিয়েছিল। সেদিন আমরা দাগনভুঁঞা কে কেবল সন্ত্রাস মুক্ত করিনি প্রায় ৭/৮ দিন আমরা প্রতিদিন সকাল বিকাল মিছিল করে দাগনভূঁঞাকে চিরতরে সন্ত্রাস মুক্ত করি।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অযথা আবেগতাড়িত কোন সিদ্ধান্ত নয়। যে সিদ্ধান্তের কারণে জানমালের ক্ষতি হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত হতে বিরত থাকা উচিৎ। জনশক্তির বিচক্ষনতা, দূরদৃষ্টি এবং ময়দানের দাবীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ, ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তর ঃ শুধুমাত্র সৎ, দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি করলে চলবে না। তার সাথে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন জনশক্তিকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে হবে। সুদ, ঘুষ, দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়তে জনশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তর ঃ নৈতিকমান বৃদ্ধি, জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো, আল্লাহর সাথে সর্ম্পক বৃদ্ধিসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি করে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে জনশক্তিকে তৈরি করা।

**‘দূর্গম পথের ক্লান্তি ছিল
তবু থামেনি খিজির,
সমর শহীদে থামবেনা তুমি,
তুমি সাহসী শিবির।’**

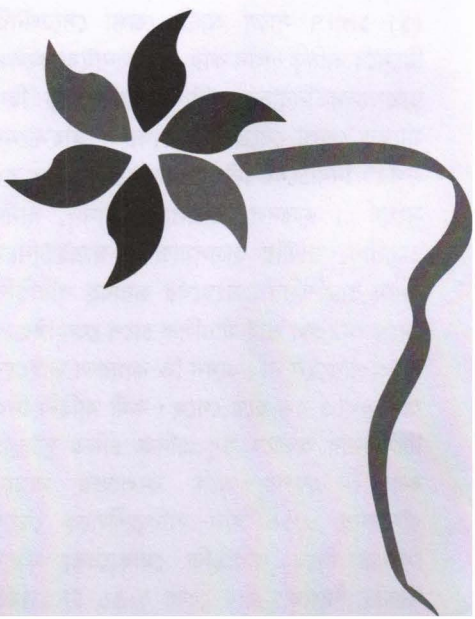

নামঃ মাওলানা মাহমুদুল হক

সেশন ঃ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ইং

প্রশ্নঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

আমি কোন রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিনি। তবে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাপ চাচারা অংশগ্রহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তিতে পরিবারের সদস্যগণ আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৯৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে দেশ যখন অরাজকতায় ভরে যায় তখন তারা আবার রাজনীতি বিমুখ হয়ে যান। ১৯৭৭ সালে শিবির প্রতিষ্ঠার পর আমার ছোট কাকা কামাল উদ্দিন ও নুরুল হক শিবিরে যোগ দেন। নুরুল হক কাকা শিবিরের সোনাগাজী পাইলট হাই স্কুলের সভাপতি ছিলেন। আমার আত্মীয় আবদুল কাদের ছিলেন থানা সভাপতি। এরা প্রত্যেকে স্কুলের ছাত্র হওয়ার পরও প্রতিদিন জামায়াতে নামাজ পড়েন, কুরআন হাদীস পড়েন, নানা ইসলামী বই পুস্তক পড়েন, প্রচুর কুরআনের আয়াত ও হাদীস অনর্গল মুখস্থ বলে অন্যদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। এসব দেখে দেখে আমি আস্তে আস্তে শিবিরের সাথে জড়িয়ে যাই। তবে ফরম পূরণ করে সমর্থক হইনি। ১৯৮২ সালের শুরুতে সংগঠনের একটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে মরহুম মাষ্টার আবদুল কাদের আমাকে কর্মী ঘোষণা দেন। ১৯৮৪ সালে সাথী প্রার্থী, ১৯৮৫ সালে সাথী, ১৯৮৬ সালে সদস্য প্রার্থী, ১৯৮৭ সালে সদস্য হিসেবে শপথ নিই। উভয় শপথ উপজেলা, আবার সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক, ২ বছর জেলা সেক্রেটারী এবং সর্বশেষ ২ বছর জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ২৮ জানুয়ারী ১৯৯৫ তে শিবির থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন, যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মত আমার সাংগঠনিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা আছে। কোন ঘটনা কাকে অনুপ্রাণিত করে তা বলা মুশকিল। তবে একটি ঘটনা হলো মফস্বলে যেখানেই দায়িত্ব পালন করেছি সেখানে বিরোধী পক্ষের অন্যায় জুলুম ও নির্যাতনের মুখেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছি। ফলে যারা মারামারি লাগায় তারা নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। আজ এত বছর পরও বিরোধী সংগঠনের ঐসব বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা যথেষ্ট সম্মান করে।

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা হলো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বাংলা অনার্সে ভর্তি হওয়ার পর কুমিল্লার দায়িত্বশীলগণ বিভাগ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিলেন।

www.pathagar.com

তাদের কথায় কর্ণপাত না করায় ঘটনাটি কেন্দ্রীয় সভাপতি পর্যন্ত গড়ায়। কেন্দ্রীয় সভাপতি বললেন বাংলা বিভাগে যারা এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে তারা হয় মেয়েদের প্রেমে পড়েছে না হয় নাস্তিকদের খপ্পরে পড়ে নিজেরা হারিয়ে গিয়েছে। তাই আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেহেতু টিকেছেন সে বিভাগে চলে যান। সেদিন আমি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি ভিক্টোরিয়া কলেজে আমাদের ব্যাচ থেকে ইনশাআল্লাহ নাস্তিকদের বিদায় ঘন্টা বাজবে। সেবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের ব্যাচের ৩৩ জনের মধ্যে আমরা ২৮ ভোট পেয়েছি। শিবিরের বর্তমান প্রজন্মকে আমি পরামর্শ দেবো তারা যেন মেধা বিকাশের পাশাপাশি উন্নত দা'য়ী (আল্লাহ পথে দাওয়াত দানকারী) চরিত্র গ্রহণ করেন।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

বর্তমান পরিস্থিতি বলতে আমরা কি বুঝাই বা কি বুঝি আগে সেটা ঠিক করতে হবে। ইসলাম কায়েমের আন্দোলনে বিরোধীতা, তথ্য সন্ত্রাস, জুলুম, নির্যাতন, ঘর বাড়ি ছাড়া করা, নির্বাসনে বা জেলে পাঠানো এবং শহীদ করে দেয়া চিরন্তন সাথী। এগুলো কোন নতুন বিষয় নয়। এগুলো মোকাবিলার জন্য ছবর, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, জ্ঞানের বর্মের সাজে বাতিলের তথ্য সন্ত্রাসকে যৌক্তিকভাবে মোকাবিলা করা, অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে মোকাবিলা, চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি, মুয়ামালাত ও আমানতদারীতায় জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতা আমাদের মাঝে সদা সক্রিয় থাকতে হবে। আমাদের আমল আখলাকের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উপযোগিতা হাসিল করতে হবে। নিজেরা জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যাবে না। ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদের যেসব মূলনীতি কুরআন হাদীসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা চর্চা করতে হবে, ভালভাবে বুঝতে হবে। তা বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির এ যুগে হেকমতের সাথে কাজে লাগাতে হবে। নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে হঠকারী কোন কাজে জড়ানো যাবে না। মনে রাখতে হবে মানুষকে আস্থায় নেয়া ছাড়া কোন টেকসই বিপ্লব সম্ভব নয়। বাতিলের শক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা, ইসলামী আন্দোলনের দুশমনদের চিহ্নিত করে তাদের মোকাবিলায় দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া এবং জনশক্তিকে সেভাবে গড়ে তোলা দরকার। তবে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার, তাহলো রাসূল (সা.) এর আন্দোলনের সাথে আমাদের আন্দোলনের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। রাসূলের আন্দোলনের কেউ বিরোধীতা করলে তারা নিশ্চিত কাফের হয়ে যেত। রাসূলের সংগঠন ছিল আল জামায়াত। আমাদের সংগঠনের নাম আল জামায়াত নয়। তাই নামধারী মুসলমানদের কেউ আমাদের বিরোধীতা করলে তাকে কাফের, মুরতাদ মনে করা যাবে না। তাদের দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে এ রকম হচ্ছে মনে করে তাদেরকে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিয়ে বুঝানোর অব্যাহত চেষ্টা করে যেতে হবে। সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে যাওয়া বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার কোন পথ নয়। কোন জনশক্তি যাতে কোন অবস্থায় সশস্ত্র না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া দরকার। আন্তর্জাতিক কুচক্রি মহল ও তাদের এ দেশীয় কুশীলবরা চায় আমরা যেন সশস্ত্র হয়ে পড়ি। তাদের ষড়যন্ত্রের গর্তে পা দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া, মানবকল্যাণমূলক কাজে আরো বেশী ভূমিকা নেয়া এবং বাতিল শক্তির ভাঙ্গনমুখর কাজের মোকাবিলায় গঠনমুখী কাজ দিয়ে তাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে। সর্বোপরি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ যেন ইসলামী আন্দোলনের কদমকে মজবুত করে দেন। নিজেদের মাঝে কর্মবিমুখ, দুনিয়াবাজ জনশক্তি যেন তৈরি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের সাংগঠনিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। লক্কর ঝক্কর গাড়ি নিয়ে যেমন দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করা যায়না তেমনি বিশৃঙ্খল লাখো জনশক্তি দিয়ে বাতিলের মোকাবিলা দূরে থাক নিজেরাও টিকে থাকা যাবে না।

প্রশ্নঃ "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি" এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ শিবিরের ভিশন ঠিক আছে। তবে তা বাস্তবায়নই আসল চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি, এ ভিশন বাস্তবায়নে সকল জনশক্তির উন্নত ক্যারিয়ার গঠন এবং একটা উন্নত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল বিভাগের জন্য পরিকল্পিত জনশক্তি গড়ে তোলা জরুরী। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ তবে অসম্ভব নয়। তবে দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, আমাদের জনশক্তির বেশীর ভাগই আর্টস্ ফ্যাকাল্টির। অতিমাত্রায় রাজনীতি চর্চার চাইতে পরিকল্পিত কাজ আরো বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। তবে যোগ্যতার বিকাশ সাধনের সাথে সাথে পরিকল্পিতভাবে অন্তরে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টির ব্যবস্থা না নিলে সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের পরিণতি হবে শূণ্য। আমি আশা করি শিবির এ ব্যাপারে আরো বেশী নজর দেবে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

পূর্বের প্রশ্নগুলোর জবাবে অনেকগুলো পরামর্শ এসে গিয়েছে। নতুন করে আর কোন পরামর্শ নেই। তবে দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি একটি পরামর্শ হলো নিজেরা সিরাতুল মুস্তাকিমে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা আর সকল জনশক্তিকে আমানত মনে করে ভবিষ্যতের অনিবার্য ইসলামী বিপ্লবের জন্য যথাযথভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়া। বর্তমানে কেউ কেউ সংগঠনের ট্রেনিং ও পদ পদবীকে শুধু দুনিয়া কামাই এর হাতিয়ারে পরিণত করতে চাচ্ছে। তাই ছাত্রজীবন শেষে কিভাবে দ্বীন কায়েমে ভূমিকা রাখবে সেটা ছাত্রজীবন থেকে প্ল্যান পরিকল্পনা নিয়ে আগানো দরকার। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

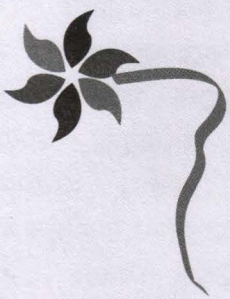

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার

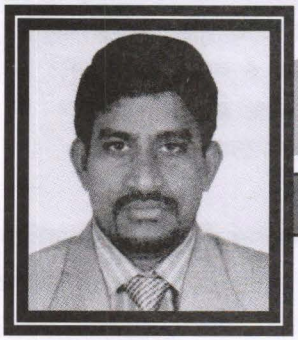

নামঃ ইবরাহীম বাহারী

সেশন ঃ ১৯৯৫ সাল

প্রশ্নঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তরঃ ১৯৮৪ সাল। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। একজন ভাই আমাকে সর্বপ্রথম এই কাফেলায় আহ্বান জানান। কিশোর বয়সে তাঁর সাহচর্যে আমি সমর্থক ফরম পূরণ করি। পরে বুঝতে পেরেছি আমি তাঁর বন্ধু টার্গেটে ছিলাম। জয়নাল আবেদীন নামের ঐ ভাই বর্তমানে মতিগঞ্জে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত আছেন। এরপরই আমি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হই। এর থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যারা আমাকে সামনের দিকে টেনে এনেছেন তাঁদের কয়েকজনের কথা না বললেই নয়, তাদের মধ্যে রয়েছেন জনাব মোস্তফা আনোয়ারী, মাস্টার আব্দুল কাদের (মরহুম), মাওলানা কালিম উল্লাহ, মাওলানা মাহমুদুল হক, মাস্টার আলা উদ্দীন (মরহুম), এ কে এম শাহজাহান সিরাজী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা (মরহুম)। এদের প্রত্যেকেই বহুবার আমার বাড়ীতে গিয়েছেন। আমি তখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র, সাথী হওয়ার প্রাক্কালে ফজরের নামাজের সময় আমার লজিং বাড়ীতে গিয়ে কালিম ভাই জাগিয়ে তুলতেন। দাখিল পরিক্ষার সময়ে মাহমুদ ভাই নিজে আমাকে বীজগণিত ও ইংরেজী পড়িয়েছেন। জনাব মাস্টার আইয়ুব (যিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক), জনাব মাস্টার আব্দুল ওয়াহেদ (যিনি একটি সিনিয়র মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক) আমার আব্বার কাছে সংগঠনকে পজিটিভভাবে উপস্থাপন করতেন। তাঁদের ভূমিকার কারণে এক পর্যায়ে আমার আব্বা প্রচন্ড বিরোধীতা থেকে সংগঠনের পক্ষে ফিরে আসেন।

প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

www.pathagar.com

উত্তরঃ আমি তখন কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের আলোকে রক্তাক্ত জনপদ বইটির ২য় খন্ড প্রকাশের জন্য তথ্য সংগ্রহ, শহীদ মিউজিয়ামের জন্য সামগ্রী সংগ্রহ (যেটির প্রস্তাবকও আমি ছিলাম। ঐ সময় পর্যন্ত সংগৃহীত সামগ্রী নিয়ে এই মিউজিনিয়ামটি উদ্বোধন করা হয়) এবং শহীদদের উপরে ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী করার জন্য তখন পর্যন্ত যতজন শহীদ ছিল তাদের বাড়ী ও স্মৃতি বিজড়িত এলাকা সমূহ সফর করছিলাম। সময়টি ছিল ১৯৯৮ -২০০২ সাল। এই কাজ করতে গিয়ে এমন অসংখ্য ঘটনার সম্মুখীন হই, যার প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় এবং অনুকরনীয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শহীদের অন্যতম শওকত হোসেন তালুকদার ভাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় কাজ সৃষ্টির জন্য নিরীহ দিনমজুরের বেশে এক দরিদ্র বিধবা মহিলাকে মা ডেকে তার সাথে থাকতেন। তাঁর একটি গরু ছিল, গরুটি যেখানে থাকত সে ঘরের একপাশে তিনিও থাকতেন। ঐ বিধবার সাথে সাক্ষাতের পর যখন জানলেন আমরা শওকতের বন্ধু, বুক চাপড়িয়ে চিৎকার করে কান্না শুরু করেন। শওকত ভাইকে ওরা প্রথমে গুলি করে, অত:পর ছুরি দিয়ে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাস থেকে টেনে-হিঁচড়ে ঐ আবাসিক এলাকায় নিয়ে যায়। ওরা জলন্ত চুলোয় তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দেয়, এরকম নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করে। শত শত মানুষ আমাদের সামনে এসে সেদিনের নারকীয় তান্ডবের বর্ণনা দেন। যাদের অনেকেই ক্যাম্পাসে আমাদের ভাইদের সহযোগিতা করেছিলেন ঐ দিন। শওকত ভাইয়ের ঐ মায়ের চিৎকার, কান্নার আওয়াজ শুনে এটা বুঝার সুযোগ ছিলনা যে, তিনি তার নিজের মা নন। তার ব্যবহার্য জিনিস হতে একটি জায়নামাজ ও একটি জগ আমরা আনতে চেয়েছিলাম। বললেন এই জগ দিয়ে অজু করে এই জায়নামাজে শওকত নামাজ পড়ত। এ গুলো আমি দিতে পারিনা। এগুলো নিয়েই আমি বেঁচে আছি। অনেক বুঝিয়ে আমরা শুধু জগটি আনতে পেরেছি।

ঝিনাইদহের জীবন্ত শহীদ আলীম ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর বাড়ীতে গেলাম। আমাদের আগমনের কথা জেনে তিনি এগিয়ে আসলেন হুইল চেয়ারে। তাঁর Backbone- এ পুলিশের ছোড়া গুলি লেগেছিল। কোমর থেকে নিচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখে তাঁর সে কি আনন্দ উচ্ছাস!

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর শরীরে উপর যে নিজের নিয়ন্ত্রন নেই! আমাদের সামনেই তিনি ঐ চেয়ারে বসে মলত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি বুঝলেন না। আমাদের সামনেই একটি মোরগ ঠোকর দিয়ে তার একটি নখ উঠিয়ে ফেলল, কিন্তু তিনি উহ্ আহ্ করলেন না। তাঁকে সবসময় পরিবারের লোকজন আগলিয়ে রাখেন। এখনো তিনি ঐভাবেই আছেন। কিন্তু দম বন্ধ হয়ে আসা অভাবের সংসারে মৃতের মতই বেঁচে আছেন তিনি। যেন একজন জীবন্ত শহীদ।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তরঃ সর্ব প্রথম এই concept clear থাকতে হবে যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ চিরকাল। তার পর হক ও বাতিল কে চিহ্নিত করা একান্ত জরুরী। আধুনিক জাহিলিয়াতের সর্বগ্রাসী ভয়াল ছোবল সম্পর্কে; বহুজাতীক আগ্রাসী, অপশক্তির নগ্ন হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তরুণ সমাজকে সচেতন করাই বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে ছাত্রশিবিরকে দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করতে হবে। এটাকে শিবির কর্মীদের জীবনের মিশন-ভিশন হিসেবে গ্রহন করতে হবে। ব্যক্তি জীবন আদর্শিক না হলে আদর্শিক সমাজ গঠন করা সুদূর পরাহত। নৈতিকতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তি থেকে সমাজকে আমূল পরিবর্তনের যে স্বপ্ন আমরা দেখি তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে কোন প্রকার সহিংস উদ্দীপনা কিংবা উগ্রতা প্রদর্শন না করেও সত্যিকার শহীদের মর্যাদা লাভ করা যায়। বিপ্লবের সীসাঢালা নীরব প্রাচীর বিনির্মাণ করতে হবে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে। তাই শিবিরকে তার কর্মীবাহিনীর মাঝে শাহাদাতের তামান্না, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, দৃঢ়তা, ঈমানী জযবা, নেক আমল ইত্যাদি positive গুনাবলী তৈরী করতে হবে ।

প্রশ্নঃ "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি" এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে এ ব্যাপারে একটি সঠিক ধারণা তৈরী করতে হবে। দেশগড়ার ধারণাপত্র এবং বহুজাতিক আগ্রাসন মোকাবেলার কৌশলপত্র এই দুটোর সমন্বয়ে সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরকি তৈরী করা যেতে পারে। নিজের জীবনে ইসলামকে ধারণ করে সকলক্ষেত্রে দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী ছাড়া সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া কখনো সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ ক. সর্বপ্রথম পরামর্শ হলো অধ্যাবসায়ী হওয়া, Study করা, গবেষণা করা, জানা, জানতে চেষ্টা করা, দেখা, দেখতে চেষ্টা করা, সফর/ভ্রমণ করা। খ. ব্যক্তি, দল ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নৈতিক দৃঢ়তা অর্জন, সহীহ নিয়ত, আমলের সৌন্দর্যে নিজেকে সুষমামন্ডিত করা। গ. সর্বশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক ইবলিসি হামলার আগাম মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল ধারণা/clear Concept রাখার চেষ্টা করা। প্রযুক্তির Positive ব্যবহার নিশ্চিৎ করা। ঘ. হুট করেই কোন বিষয়ে চুড়ান্ত আশংকা কিংবা সফলতা অথবা বিফলতার চিন্তা না করে ধীরে ধীরে বুঝার চেষ্টা করা। বর্তমানে এটিই জনশক্তি ও আমদের বড় রোগ। ঙ. নফল ইবাদাত, মুরাকাবা-মুশাহিদা, ইস্তিগফার সফলতা আদায়ে ও আগামীর স্বপ্ন পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চ. চুড়ান্ত কথা হলো কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝা, সীরাতকে নিজের জীবনে implement করা, শহীদি জযবা রাখা এবং জান্নাতের ভিশন নিজের জীবনে লালন করে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ খোঁজা।

“উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে জাগিয়েছে স্বপ্ন ভাসা তীর, তাওহীদি বন্দরে আজ লাখো নাবিকের ভীড়।”

www.pathagar.com

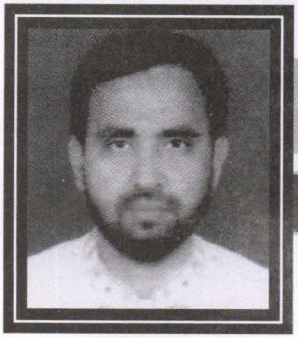

নাম ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহীম

সেশনঃ জুলাই'২০০২-ডিসেম্বর'২০০৩

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর ঃ পারিবারিক ভাবে সংগঠনমূখী ছিলাম। ৬ষ্ট শ্রেনীতে পড়াকালীন সংগঠনের দাওয়াতী অভিযানে সমর্থক হই। ১৯৯০ সালে কর্মী হয়েছি। এক্ষেত্রে তৎকালীন উপজেলা সেক্রেটারী নূরুল ইসলাম ভাই, মিজান ভাই ও দেলোয়ার ভাই টার্গেট করে সহযোগিতা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে?

উত্তরঃ ১. ১৯৯৬ সালের ঘটনা। আমি তখনো সংগঠনের কর্মী।বিএনপি ক্ষমতায়। তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল পুরো সোনাগাজীতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। উপজেলা সংগঠন তৎকালীন ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিনের সভাপতি যথাক্রমে মর্তুজা ভাই ও শাহ আলম ভূঞা ভাইকে মেহমান করে ঈদ পূনর্মিলনী কর্মসূচী ঘোষনা করে । ছাত্রদল ঈদ পূনর্মিলনী করতে না দেয়ার প্রকাশ্য ঘোষনা দিয়ে পাল্টা কর্মসূচী তথা কর্মী সম্মেলনের মাইকিং করে। আমি সেদিন লক্ষ্য করলাম বিকাল ৩টার প্রোগ্রামে সকাল ৭টায় আমাদের সকল ভাই উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। একজন সমর্থকও সেদিন বাড়িতে বসে ছিল না। আমাদের ভাইদের সাহসী উপস্থিতি দেখে ছাত্রদল প্রশাসনের মাধ্যমে ১৪৪ ধারা জারী করায় এবং তারা আমাদের উপর হামলা করার কোন সাহস পায়নি।

২. ১৯৯৮ সালে উপজেলা সভাপতি হওয়ার পর জোন শাখাগুলো সেট-আপ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ি। বিশেষ দু'টি জোনে সভাপতি করার মত উপযুক্ত কোন কর্মী পাচ্ছিলাম না। অবশেষে সকলের দৃষ্টিতে দুর্বল ২জন ভাইকে জোনের সভাপতি করি। পরে তাদের একজন সাথী হয়েছিলেন। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখেছি উপজেলার অন্য জোনগুলোর যোগ্য দায়িত্বশীলদের চেয়ে এই দু'জন ভাই অনেক ভাল কাজ করেছেন। কর্মী বৃদ্ধি, এয়ানত আদায়, এককালীন ও বিশেষ কালেকশান রিপোর্ট পেশ সবদিকেই তারা ছিলেন অন্যদের চেয়ে এগিয়ে । এটা আমার জীবনে বিরাট শিক্ষনীয় বিষয় ছিল, যা পরবর্তীতে জেলা সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপালনে এবং এখনো যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমাকে প্রভাবিত করে, কোন ব্যক্তির যোগ্যতার চেয়ে তার আন্তরিকতা ও খুলুসিয়াত অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

উত্তর ঃ বর্তমান পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের স্থায়ী ভৌগলিক অবস্থান দুটি বিষয়ই সামনে রাখতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের স্থায়ী গুনাবলী আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, বিশেষ করে সুরা ফোরকানের শেষ রুকুতে বেশ কয়েকটি গুনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেসব গুণাবলী অর্জন করা এবং প্রতিপক্ষের কৌশল মোকাবেলায় সাহসিকতার পাশাপাশি আরো বেশি ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

এ ভিশন বাস্তবায়ন করতে করনীয় মাত্র একটি। নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন। এক সময় শুধু ক্যারিয়ার 'সেক্রিফাইজ' এর কথা বলা হত। এখন ক্যারিয়ার বিল্ডআপ এর কথা বলা হয় এবং সে সুযোগ এখন অনেক বেশী। এজন্য শিবিরের ভাইদের পার্ট টাইম কোন কাজে সময় না দিয়ে অধ্যয়নে বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

জনশক্তি দায়িত্বশীলদের নিকট আমানত। জনশক্তির পার্থিব যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি নৈতিক ও আত্মিকমান বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক দায়িত্ব মনে করা দরকার।

'এ মিছিল রুখতে পারে সাধ্য কার?
এ কাফেলা আল্লাহ ছাড়া বাধ্য কার?'

www.pathagar.com

নামঃ মোহাম্মদ ইলিয়াস

সেশনঃ ২০০৪ইং

প্রশ্নঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তরঃ আমি ১৯৯০ইং সালে সপ্তম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় সংগঠনে এসেছি। সংগঠনের তৎকালীন ছাগলনাইয়া উপজেলার অফিস সম্পাদক জনাব ফরিদ ভাইয়ের মাধ্যমে পূর্বদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারন সভায় দাওয়াত পেয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হই। সভায় ফরিদ ভাই, সাইফুল ভাই ও ইউসুফ ভাই সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। এরপর সমর্থক করার উদ্দেশ্যে সকলকে একটা একটা ফরম দিয়ে জনাব ফরিদ ভাই বলেন পূরন করার জন্য। আমি ও সকলের সাথে ফরম পূরণ করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

উত্তরঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দীর্ঘ (১৪) চৌদ্দ বছর সময় কাটানোর সুযোগ মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই সময়ের মাঝে অনেক ঘটনা আছে যা লিখতে বসলে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখব বা বলব তা ঠিক করা মুশকিল। তারপরও ২টা ঘটনা বলছি যা বর্তমান জনশক্তিদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রথমত: মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে কাজ করলে গায়েবী সাহায্য আসে তার প্রমাণ পেলাম ১৯৯৯ইং সালের ১৯ ডিসেম্বর। রমজান মাস, জেলার শিক্ষাশিবির চলছিল ফালাহিয়া মাদ্রাসার ৩য় তলার উত্তর পার্শ্বের হল রুমে। প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফেনীর কৃতিসন্তান (পরে কেন্দ্রীয় সভাপতি) জনাব মজিবুর রহমান মঞ্জু। মেহমান বক্তব্য শুরু করার একটু পরে তার মোবাইল ফোনে রিং বেজে উঠল। তিনি রিসিভ করে পড়লেন, ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন। জেলা সভাপতি শাহ্ মিজানুল হক মামুন ভাইকে আস্তে আস্তে কি যেন বলে তিনি চট্টগ্রাম চলে গেলেন। জরুরী সদস্য বৈঠক ডাকা হল, জানতে পারলাম চ.বিতে জোড়া শহীদের ঘটনা (শহীদ রহিম উদ্দিন ও শহীদ মাহমুদুল হাসান)। শহীদ মাহমুদুল হাসানের লাশ নিজ জন্মস্থান লক্ষ্মীপুরে দাফন করার জন্য নেয়া হবে। পথিমধ্যে ফেনীর মহিপালে জানাজা হবে এবং তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল (পরে কেন্দ্রীয় সভাপতি) জনাব এহ্সানুল মাহবুব যোবায়ের বক্তব্য রাখবেন। শিক্ষাশিবির মুলতবি করে আমরা সকলেই মহিপাল অবস্থান নিলাম। ডায়না হোটেলের উপরে ছাত্রলীগের গুন্ডারা অবস্থান নিয়েছে অস্ত্র-সস্ত্রসহ। তাদের টার্গেট আমাদেরকে জানাজার নামাজ পড়তে এবং অবস্থান করতে দেবেনা।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে ইফতারের সময় হয়েছে। আমি ও মেজবাহ উদ্দিন ফারুক ভাই ফালাহিয়া মাদ্রাসায় ইফতারের জন্য তৈরী শুধুমাত্র বুট-মুরি বস্তায় করে টেম্পুযোগে মহিপাল জিরো পয়েন্টে নিয়ে রাখি। একটু পরে ছাত্রলীগের গুন্ডারা বলাবলি শুরু করল বস্তা করে যে অস্ত্র শিবির এনেছে এখানে আর এক মুহূর্ত দাড়ানো যাবেনা। ইফতারের পর দেখি তারা একজনও নেই।

দ্বিতীয়তঃ ২০০৪ইং সালের নভেম্বর মাসে সদস্য বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল ফেনী জেলার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল করার। প্রধান মেহমান হিসাবে চিন্তা করা হয়েছে বিশ্ব বরেন্য আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের কথা। জেলা সভাপতি হিসাবে দাওয়াত দেয়ার দ্বায়িত্ব আমাকেই দেয়া হল। আমি ঢাকা গিয়ে নিজে অনেকবার চেষ্টা করেও দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হলাম। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব সেলিম উদ্দিন ভাইয়ের সহযোগিতা নিয়ে ও পারলাম না। পরে এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে বিদায়ী সভাপতি জনাব মঞ্জু ভাইয়ের কাছে গেলে তিনি বললেন, "একজনকে দিয়ে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার, আশা করি সফল হবে।" আমি তাড়াহুড়া করে প্রশ্ন করলাম মঞ্জু ভাইকে, তিনি কে? তখন মঞ্জু ভাই যার কথা বললেন তিনি আর কেউ নন বর্তমান বাংলাদেশের এই দূঃসময়ে যিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৎকালীন নায়েবে আমীর মজলুম জননেতা জনাব মকবুল আহমাদ। কথা অনুযায়ী আমি মগবাজার কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়ে স্যারকে (জনাব মকবুল আহমাদ) সব বললে তিনি মুসকি হেসে টিএনটি ফোন থেকে ফোন দিলেন। অপর প্রান্ত থেকে সালামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অনেক কথার পর স্যার জানতে চাইলেন ১৭ নভেম্বর চট্রগ্রাম মহানগরীর লালদীঘি ময়দানে সীরাত মাহফিল শেষ করে রাতে চট্রগ্রাম থাকবেন না ঢাকায় চলে আসবেন? শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাঈদী সাহেব বললেন, চট্রগ্রাম থেকে পরদিন খুব ভোরে ঢাকার উদ্দেশ্য রওয়ানা করবেন। তখন স্যার বললেন যে, আসার পথে ফেনীতে একটু দোয়া দিয়ে আসা যায় না? তখনই অপর প্রান্ত হতে ঘোষনা আসে "জি-আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ।" মেহমান ঠিক হল, সীরাত মাহফিলও হল কিন্তু অভিভূত হলাম এবং শিখলাম নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য কেমন হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভুমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

উত্তরঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কারো অজানা নয়। এই অবস্থায় দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষই চায় সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে বুদ্ধিভিত্তিক, সময়োপযোগি কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রশ্নঃ 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রমিক নাগরিক তৈরি' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতা হচ্ছে আমার দক্ষতাই আমাকে স্থান করে দেবে। কথা সত্য, কারণ যুব সমাজ দেশের জন্য অবশ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারছেনা। অথচ যুবকেরা ইচ্ছা করলে কর্মের উত্তাপে নিরাশা, হতাশা আর বেকারত্বের বরফ গলাতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব, দক্ষ, দেশপ্রমিক ও নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিকের ।

www.pathagar.com

আর এ মহান কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তাদের এই উদ্দ্যোগ সফল হোক এটাই আমাদের প্রত্যেকের কামনা করা উচিত।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দ্বায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এদেশে ছাত্রসমাজের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার একটি নিবেদিত কাফেলা। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে শিবির আজ ৩৭ বছরের ১ জন যুবকের অবস্থানে। এই ক্ষেত্রে জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের প্রতি পরামর্শ হলঃ-

☐ ছাত্রদের সফল ছাত্রজীবন পরিচালনা ও চরিত্র গঠনে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

☐ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মৌলিক অধিকার আদায় এবং সংরক্ষণে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

☐ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদেরকে আরো বেশী সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে চারিত্রিক গুনাবলীর মাধ্যমে শিবিরকে ছাত্রসমাজের একমাত্র সংগঠনে পরিনত করার চেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

☐ সর্বোপরি ক্যারিয়ার অর্জনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি কোরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের পরিমাণ আরো বাড়ানো দরকার।

"উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে
জাগিয়েছে
স্বপ্ন ভাসা তীর,
তাওহীদি বন্দরে আজ
লাখো নাবিকের
ভিড়।"

www.pathagar.com

মোঃ মিজানুর রহমান

২০০৬ ফেব্রুঃ-২০০৭ইং

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর ঃ আমি ছাগলনাইয়া থানার ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্‌রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে সংগঠনের দাওয়াত পাই দশম শ্রেণির ফাস্ট বয় আমার সিনিয়র ভাই দিদারুল আলম মজুমদার ভাইয়ের মাধ্যমে। চরিত্রবান ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার খুব সুনাম ছিল। আমিও আমার ক্লাসের ফাস্ট বয় ছিলাম। দিদার ভাই আমার সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রায় সময় আমি দিদার ভাই থেকে পড়ালেখা বুঝে নিতাম। একদিন বিকালে ক্লাস ছুটি হওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি নামাজের পরে থাকবে তোমার সাথে কিছু কথা আছে। নামাজের পরে দিদার ভাই আমাকে নিয়ে মসজিদের পার্শ্বে একটি ক্লাশে বসেন। তিনি প্রথমে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজ খবর নেন, পরে মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কি এবং ইসলামী আন্দোলন করা কি এই সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস দিয়ে বিভিন্নভাবে বুঝান। তারপর তিনি আমাকে একটি ফরম দিলেন, আমি সেই ফরমটি পূরণ করলাম। এভাবে আমি ১৯৮৯ সালে সংগঠনে এসেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

উত্তর ঃ ঘটনা-১ : আমি ছিলাম বাম রাজনৈতিক ধারার বংশের সন্তান। যদিও আমার পরিবারের কেউ সক্রিয় রাজনীতি করতোনা, তবুও ১৯৮৯ সালে সংগঠনে আসার পরেও আমাকে কর্মী করতে দায়িত্বশীলদের কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু সাথী করতে আর কষ্ট করা লাগেনি।

১৯৯২ সালের একটি ঘটনাঃ ঈদের দিন বিকাল ৩টায় দিদার ভাই আমার গ্রামের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হয়ে আমার জেঠাতো ভাইকে বললেন, আমি মিজান ভাইয়ের কাছে এসেছি একটু দেখা করতে, কষ্ট করে ডেকে দিবেন? তিনি আমাকে গিয়ে বললেন, একজন মেহমান এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে, বাড়ীর দরজায় আছেন। আমি ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ীর দরজায় এসে দিদার ভাইকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ তখন যোগাযোগ অবস্থা একদিকে ভালো ছিলনা, অন্যদিকে ঈদের দিন আরো সময়টা হলো ৩টা। দিদার ভাইয়ের বাড়ী থেকে আমার বাড়ীর দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। কিভাবে এতো দূরত্বে ঈদের দিন মা-বাবা, বন্ধু মহল, বিশ্রাম সব রেখে একজন কর্মীর বাড়ীতে উপস্থিত শুধু একটি কাজ, ঈদের একদিন পর অগ্রসর কর্মীদের শিক্ষা শিবির।

www.pathagar.com

সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ঈদের আনন্দকে ত্যাগ করে প্রত্যেক কর্মীর বাড়ীতে বাড়ীতে হাজির হন। তখন আমি দিদার ভাইকে দেখে অবাক চিত্তে শুধু মুখ দিয়ে এটুকুই বলেছিলাম- দিদার ভাই আপনি! ঘরে চলেন। কিন্তু তিনি হাসি দিয়ে বলেছিলেন, না যাব না মিজান ভাই। একদিন পর আপনাদের শিক্ষা শিবিরতো, তাই আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বের হয়েছি। আরো কয়েকজন ভাইয়ের সাথে দেখা করতে হবে। সময় কম ঘরে যাওয়া যাবে না। আর জোর করলাম না, সালাম দিয়ে বিদায় করে ঘরে চলে আসলাম। এ থেকেই আমার সংগঠনের মান উন্নয়ন ও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রেরণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল, যা কখনো ভুলার মতো নয়।

ঘটনা-২ : ২০০৫ সাল, আমি তখন জেলা সেক্রেটারী আর সাবেক জেলা সভাপতি আবদুর রহিম ভাই আমরা দু'জন এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারিনি। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে একজন দায়িত্বশীল ভাই আমাদের ফরম পূরণের তারিখ ঘোষণা করা হলে জানানোর কথা কিন্তু তিনি জানাননি, আর আমরাও যোগাযোগ করিনি। উভয় দিক থেকে সমস্যা হওয়ায় ফরমপূরণ করা হল না। তখন কি করা যায়, অফিস সহকারী আমাকে পরামর্শ দিলেন এখন একটি পথ আছে, তা হলো; একটি আবেদন ফরম পূরণ করে অধ্যক্ষের সত্যায়িত ও সুপারিশ নিয়ে সরাসরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে আপনার কোন পরিচিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকলে তার মাধ্যমে বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসলে আমরা আপনাদের ফরম পূরণ করতে পারবো। তখন খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন চৌদ্দগ্রাম বাড়ী আমাদের এক দায়িত্বশীল ভাই আছেন প্রক্টর, নাম- মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন। তার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাহাবুদ্দীন ভাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি আমার সাংগঠনিক পরিচয় জেনে এতো বেশী সম্মান দেখালেন যে, যা কখনো ভুলার মতো নয়। তিনি আমাদের সমস্যা জেনে বললেন, জেলা দায়িত্বশীল ফেনী থেকে গাজীপুর এ কাজের জন্য এসেছেন, আপনি বসুন। আমি দেখি কি করা যায়। তখন আমি বললাম, তাহলে Waiting Room এ বসি। তখন তিনি বললেন, আপনি এখানে বসেন। সাথে সাথে তিনি পিয়ন ডেকে নাস্তার ব্যবস্থা করালেন এবং দুপুরে তিনি ও আমি খাবার খাব, তাঁর রুমে খাবার নিয়ে আসার জন্য অগ্রিম বলে দিলেন। তারপর একজন কর্মকর্তাকে ডেকে এনে আমাদের আবেদন দুইটি ২য় তলার একজন কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কথা বলবেন। কাজ করে দ্রুত পাঠিয়ে দিতে বললেন আমার রুমে। এই থেকে বুঝলাম যে, ইসলামী আন্দোলনের এক ভাইয়ের প্রতি আরেক ভাইয়ের কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ এবং ইসলামী আন্দোলন সফলতার জন্য ক্যারিয়ার সম্পন্ন ব্যক্তি কত জরুরী। একটি জায়গায় ক্যারিয়ার সম্পন্ন একজন ভাই থাকার কারণে যে কাজ হাজার টাকা দিয়ে হয়না, তা বিনা টাকায় হয়ে যাচ্ছে। তা হলে প্রত্যেক জায়গায় ক্যারিয়ার সম্পন্ন ভাই থাকলে আন্দোলনের সফলতা কত দ্রুত সম্ভব হতো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ ১) বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি মনে করি আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্য্যধারণ করে ওভার কাম করা।

২) ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করতে প্রস্তুত থাকা।

প্রশ্ন ঃ 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তর ঃ বর্তমান সময়ে জনশক্তির মান উন্নয়ন ও দায়িত্বশীল করার ক্ষেত্রে মান যাচাই করা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ- একদিকে পূর্বের তুলনায় জনশক্তি বেড়ে গেছে এবং অন্যদিকে দায়িত্বশীল ভাইদের কাজের ব্যস্ততাও বেড়ে গেছে। তবুও বলব, যদি ভিশন বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে নিম্ন দিকগুলো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-

১) মোয়ামেলাত। অর্থাৎ লেন-দেন, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম ইত্যাদি।

২) খুলুছিয়াত বা দ্বীনি অনুভূতি। অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি ও পরকালীন জবাবদিহীতা কেমন দেখা।

৩) পড়ালেখার মান। যা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনে এসেছি। উপরি উক্ত দিকগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমান নেতৃত্বে কোথাও কোথাও পূর্বের চেয়ে প্রকট সংকট দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

উত্তর ঃ আমাদের সময়ের তুলনায় জনশক্তি বেড়েছে, কাজও বেড়েছে। তাই আপনাদের ব্যস্ততাও বেশী, একথা আমি অকপটে স্বীকার করি। তবুও ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের সফলতার জন্য নিম্ন দিক গুলো অনুসরণের বিকল্প নেই।

১) কর্মপদ্ধতিতে বর্ণিত- বন্ধুর গুণাবলি, কর্মী গঠনের ক্ষেত্রে ক্রমধারার ধাপগুলো, যোগাযোগকারীর বৈশিষ্ট্য ও পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব দিকগুলো লক্ষ্য রাখা দরকার তা সদা সর্বদা মন-মগজে থাকা।

২) সংবিধানে বর্ণিত অন্য কোন সংগঠন বা সংস্থা ও অর্থলগ্নি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক না থাকা, এ ব্যাপারে সজাগ থাকা।

৩) মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে লক্ষ্য রাখা।

৪) কর্মের দক্ষতার প্রতি খেয়াল রাখা।

৫) প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।

উপরোক্ত দিকগুলোর প্রতি সঠিকভাবে দৃষ্টি না দেয়ায় কোন কোন শাখায় প্রকট সংকট দেখা যাচ্ছে। যার প্রভাবে দ্রুত ছাত্রত্ব শেষ করা, নেতৃত্বে সংকট, মেধাবী ও প্রভাবশালী জনশক্তি পূর্বের তুলনায় কম যোগ দেয়া ইত্যাদি। যা ইসলামী আন্দোলনের সফলতার পথে অনেক বড় অন্তরায়।

www.pathagar.com

নাম ঃ মোঃ জিয়াউর রহমান

সেশন ঃ ২০০৭

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর ঃ আমি যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ করি তখন ১৯৯৪ সাল। তৎকালীন জোন সভাপতি নূরুল করিম ভাই আমাকে টার্গেট করে দাওয়াতী কাজ করেন। তখন সংগঠনের অনেক উপহার ও বই আমাকে দেন। আমি বইগুলো ভালভাবে পড়ে এবং বুঝে ইসলামী আন্দোলনে তথা ইসলামী ছাত্রশিবির নামক সংগঠনের কাতারে শামিল হই।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে?

উত্তর ঃ আমি যখন সংগঠনের সাথী প্রার্থী তখন জেলার একটি শিক্ষাশিবিরে যোগ দিই। ঐ অনুষ্ঠানের আলোচক সাবেক কাপ সদস্য খন্দকার দেলোয়ার ভাই নামে এক ভাইয়ের আলোচনার বিষয় ছিল 'শহীদেরা আমাদের প্রেরণার উৎস' এই আলোচনার এক পর্যায়ে এক হৃদয় বিদারক অবস্থা দেখা দেয়। আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা । সবার চোখে পানি আর কান্নার রোল। এই যে ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের ভালবাসা এটাই তো আমাদের প্রেরণার মিছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

উত্তর ঃ ছাত্রশিবির যেহেতু বিশাল গণসংগঠনে রূপান্তর হয়েছে, তাই এই সংগঠনকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই জন্য শিবিরকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ, গঠনমূলক আলোচনা, স্বদেশপ্রেম, ছাত্র কল্যাণমূখী, প্রযুক্তি নির্ভর এবং কৌশলগত দিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ,দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী'এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তর ঃ শিবির একটি দীর্ঘমেয়াদী ভিশন তৈরী করেছে এটি সাফল্যের জন্য ভাল দিক। তাই ভিশন সামনে রেখে রূপরেখা তৈরী করা দরকার। সংগঠনকে এই ভিশনের আলোকে সাজাতে হবে। কেননা একটি দেশ গড়তে হলে অবশ্যই সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক লোক তৈরী করতে হবে। এজন্য শিবিরকে জনশক্তি থেকে বাছাই করে তাদের সে লক্ষ্যে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আর পারলে ভিশনের উপর সমৃদ্ধ বই তৈরী করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ সংগঠন পরিচালনার জন্য দরকার দায়িত্বশীল, আর সংগঠন গড়ে উঠে জনশক্তির দ্বারাই। তাই একে অপরের সম্পর্ক হবে সীসাঢালা প্রাচীরের মত। নিজে যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্য ও তাই পছন্দ করবে । আর এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলরা থাকতে হবে সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। জনশক্তির উপর রাগ-ক্ষোভ অথবা মান-অভিমান না করে আপন করে সাথে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। জনশক্তি দায়িত্বশীলদের নিকট আমানত, তাই এর পরিচালনা সঠিকভাবে করতে হবে। এদের কে আগামী দিনের যোগ্য দায়িত্বশীল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বিপ্লব সকল জুলুম,
অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে
বিপ্লব অন্তরের প্রতিটি কুচিন্তা
আর কুকর্মের বিরুদ্ধে।

আসাদ-বিন-হাফিজ

www.pathagar.com

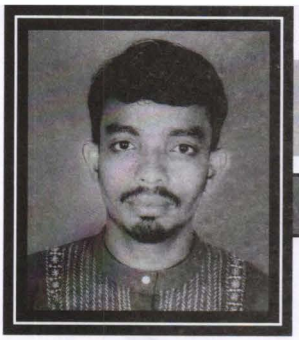

নামঃ ফারুক আহম্মদ ভূঁইয়া

সেশনঃ ২০০৮ইং

প্রশ্নঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তরঃ- আমি যখন মাদরাসায় ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হই তখন থেকে নিজে নিজে শিবির করব এই মানসিকতা ছিল। তারপরও ১৯৯১ সালে হাসানপুর মাদরাসায় একটি সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামি ছাত্রশিবিরের সমর্থক ফরম পূরণ করি।

প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন। যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

উত্তরঃ প্রথম: ১৯৯৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর। আমি তখন ইসলামি ছাত্রশিবিরের কর্মী। আলজামেয়াতুল ফালাহিয়া মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী। আমি আমার ব্যক্তিগত কাজ সেরে বাড়ি থেকে ফেনী আসছি। আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টায় গাড়ি থেকে নেমে রেলগেইট হয়ে নাজির রোড দিয়ে ফালাহিয়া মাদরাসার দিকে যাচ্ছি, নাজির রোডের মাঝামাঝি অবস্থায় যখন আসি তখন ৮/১০ জন ছাত্রলীগের কর্মী আমার রিক্সা ড্রাইভারকে গালি দিয়ে বলে 'থাম'। রিক্সা দাঁড়ানোর সাথে সাথে সবাই আমাকে ঘিরে পেলে। সবার হাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, যেমনঃ পিস্তল, ছুরি, কিরিজ, লাঠি ইত্যাদি ছিল। সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে একজন আর একজনকে বলল এত কথা কিসের? একটা গুলি করলেইতো শেষ। অন্য একজন বলল কুপিয়ে ফেলে দাও। এভাবে সবাই ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করল। মনে মনে চিন্তা করলাম আমার জীবন মনে হয় এখানে শেষ। কিছুক্ষণ পরে দুইজন আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করল এবং অন্য দুইজন আমার রিক্সার পাশে ওঠে বসল এবং বলল জায়গামত নিয়ে চল। ১০ মিনিট রিক্সা করে ঘুরে বর্তমান সেলিনা পারভিন সড়কের মাথায় (মেইন রোডের পাশে) আমাকে নামিয়ে দিল এবং বলল, 'চলে যাও'। দীর্ঘ এক ঘন্টা যাবত অনেক কথা বলল কিন্তু কোন ধরনের কোন আঘাত আমাকে করে নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছাছাড়া এই পৃথিবীতে কিছুই সংগঠিত হয় না। সেদিন তা বাস্তবে প্রমাণিত হল।

দ্বিতীয়: ২০০১ সাল। আমি ফুলগাজী উপজেলা শিবিরের সভাপতি, ১৭ ডিসেম্বর শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান, প্রধান অতিথি মজিবুর রহমান মঞ্জু ভাই। কুরআন খতম শেষ হলো। আলোচনা সভাও শেষ হলো। এবার শহীদ এর কবর জিয়ারত ও মা বাবার সাথে সাক্ষাৎ। মঞ্জু ভাই সহ ১০/১২ জন প্রথমে কবরের পাশে গিয়ে জিয়ারত করলাম। তারপর বাড়ীতে গেলাম। শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের বাবার সাথে সবাই কোলাকুলি করলাম। এবার মঞ্জু ভাই বলল আম্মা কোথায়, পাশের রুম থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে মঞ্জু ভাই বললেন, 'কি হয়েছে আম্মার?'

www.pathagar.com

তখন আমাদের সবার চোখের পানি পড়তেছে। পাঁচ মিনিট পরে শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের আব্বা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছাদেক মজুমদার বললো, বাবারে কান্না করতেছি এই জন্য যে তোমরা যেভাবে এসেছো গতকাল আমার বাবু (শহীদ আলাউদ্দিন) এসেছিল । মঞ্জু ভাই বললো, বাবা বুঝি নাই। তখন তিনি বললো গতকাল মধ্যরাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন আমার বাবু এসে আমাকে বললো বাবা, "মা আপনারা ভালো আছেন? আমরা বললাম ভালো আছি। সে বললো, আপনারা আমার জন্য চিন্তা করেন কেন, আমি কোথায় থাকি আপনারা জানেন কি? না জানিনা। দেখেন এই বিশাল ফুলের বাগানের মাঝে আমি থাকি। তখন তারা দেখলেন এক বিশাল ফুলের বাগান" এবং এরপর তারা জাগ্রত হয়ে গেলেন। আর আমার বাবুকে দেখা যাচ্ছেনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষনা- যারা আমার পথে নিহত তোমরা তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভুমিকা কেমন হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি অতিবাহিত হচ্ছে তা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আর কোন সময় সংগঠিত হয় নাই। ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতি আমার পরামর্শ হলঃ

১) দায়িত্বশীল ভাইদের দূরদর্শি চিন্তা, হেকমত, বুদ্ধি ও গবেষণা করে কর্মসূচি নিতে হবে।

২) জনশক্তিদেরকে টেলিফোনে মোটিভেশন কমিয়ে সরাসরি মোটিভেশন বাড়াতে হবে।

৩) সকল জনশক্তিকে দায়িত্বশীল ভাইদের নজরে রাখতে হবে।

৪) দায়িত্বশীল ও জনশক্তি সবাইকে রাসুল (স:) মক্কিযুগের উপর গবেষণা করতে হবে।

৫) সকল জনশক্তির মান কোনদিন সমান হবেনা কিন্তু বাছাইকৃত একদল কর্মীবাহিনী তৈরী করতে হবে যারা রাজপথে ভালো ভুমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্নঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ,দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হলো।

১) লক্ষ্যে পৌছার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সুন্দর পরামর্শ ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২) যে এলাকায় যেই রকম পরিবেশ সে পরিবেশের আলোকে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা।

৩) সকল স্তরের ছাত্রদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, কেননা মনে রাখবেন সকল ছাত্র আমাদের কর্মী হবে না। কিন্তু সকল ছাত্র আমাদের বন্ধু হবে।

৪) পরিকল্পিতভাবে সমগ্র বাংলাদেশে দুই ধরনের জনশক্তি তৈরী করতে হবে। প্রথমতঃ যারা আগামীতে বাংলাদেশের সকল সরকারি কাজে নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে প্রবেশ করে ইসলামের কাজ করবে। দ্বিতীয়তঃ এমন একদল দায়িত্বশীল তৈরী করতে হবে যারা সকল পর্যায়ের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরমর্শ কি?

উত্তরঃ জনশক্তি ও দায়িত্বশীল ভাইদের জন্য আমার পরামর্শ হল ঃ

১) শিবিরের নিয়মিত রুটিন মেনে কাজ করা। যেমনঃ কর্মপদ্ধতি, সংবিধান এবং কেন্দ্রথেকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয় তা ভালোভাবে আমল করা।

২) জনশক্তি ও দায়িত্বশীল সবাইকে দাওয়াতি চরিত্র অর্জন করে সর্বস্তরের ছাত্রদের মাঝে দাওয়াত দেওয়ার পরিকল্পনা করা।

৩) সর্বস্তরের জনশক্তিকে কোরআন ও হাদিস গবেষণামূলক পড়ালেখা করা।

৪) বর্তমান আধুনিক পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পড়ালেখার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করা।

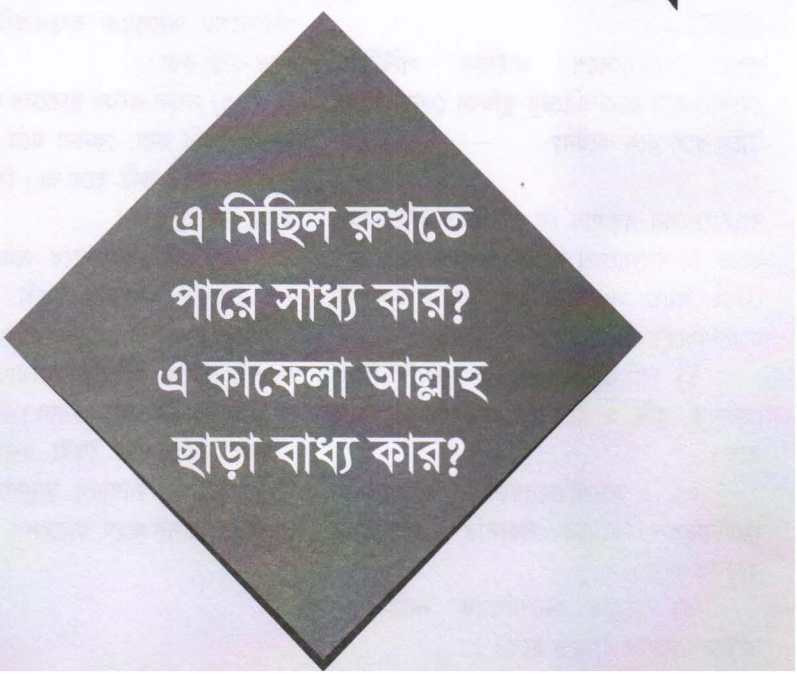

www.pathagar.com

নামঃ হাফেজ মু. জহির উদ্দিন

সেশন ঃ ২০০৯

১। প্রশ্নঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের দাওয়াত মূলত পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত হই, তবে সরাসরি ইসলামী ছাত্রশিবিরের জনশক্তি হিসেবে সম্পৃক্ত হই ১৯৯৫ ইং সালে কর্মী হওয়ার মধ্য দিয়ে।

২। প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯৯৬ সালে আমি যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি তখন ফেনী সদর সাথী শাখার সভাপতি ছিলেন জনাব নাজিম উদ্দিন ভাই। আমি সভাপতির আলোচনা চক্রের কর্মী হিসেবে প্রথম অংশ গ্রহণ করি। নিজের মাঝে নতুন কিছু রিসিভ করার মানসিকতা খুব প্রচন্ড ভাবে কাজ করছিলো। বেশ আগ্রহ সহকারে সভাপতি আসবে সেই অপেক্ষায় ছিলাম। এমতাবস্থায় সভাপতি আসলেন, তাতে নির্ধারিত সময় থেকে ১/২ মিনিট দেরী হলো। এসে নাজিম ভাই পকেটে যে পরিমান টাকা ছিল তা কাফফারা স্বরূপ দিয়ে দিলেন। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি বেশ মুগ্ধ হই। উনার সময় সচেতনতার প্রতি গুরুত্ব দেখে আমি সাথী শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ শহীদ একরামুল হক ভাই যখন শাহাদাত বরণ করেন তৎকালীন বিএনপি সন্ত্রাসী কর্তৃক, সরকারের পেটুয়া বাহিনী পুলিশ স্বাভাবিক ভাবে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে বাধা প্রদান করে। তখন দায়িত্বশীলের নির্দেশে আমরা দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে/ দৌড়িয়ে জানাযায় অংশ গ্রহণ করি। দেখি রাতের আধারে অসংখ্য নারী পুরুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছে একনজর দেখার জন্য তাদের প্রিয় ভাইটিকে। আমাদের সংগঠনে দায়িত্বশীলের নির্দেশে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতেও কর্মীরা দ্বিধা করে না।

৩। প্রশ্নঃ বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

সব পর্যায়ের জনশক্তি দ্বীনের পথে অবিচল থেকে বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

৪। প্রশ্নঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তার লক্ষ্য পাণে ছুটে যাওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত ফলপ্রসু।

www.pathagar.com

এরপরেও বিভিন্ন সময় সংবিধান ও সিলেবাসকে সকল পর্যায়ের জনশক্তি ও দায়িত্বশীলের মাঝে পূর্ণাঙ্গ চর্চা বৃদ্ধি এবং প্রয়োগ করতে পারলে ভাল হবে ইনশাআল্লাহ।

৫। প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ

১. দ্বীনি হাইসিয়াতের আলোকে জিহাদের জন্য নিজেদের গঠন।
২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মোকাবেলায় নিজেদের যোগ্যতার বিকাশ সাধন।
৩. প্রতিটি উপশাখা যেন এক একটি আদর্শ উপশাখা হয় সে ব্যাপারে তদারকি জোরদার করা।
৪. দাওয়াতী মিশনই মুমিনের একমাত্র মিশন ভিশন হওয়া সময়ের দাবী।
৫. শহীদি তামান্নায় সকল জনশক্তিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

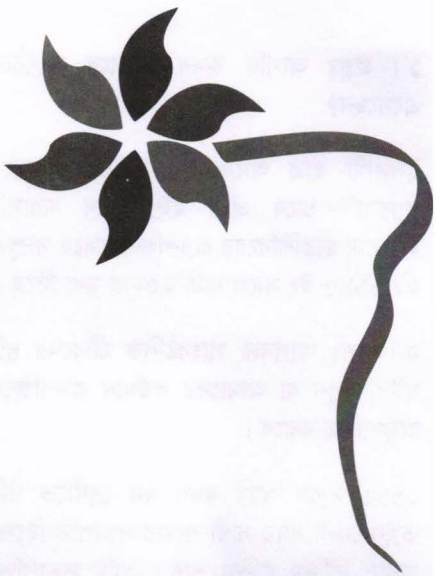

বিপ্লব সকল জুলুম,
অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে
বিপ্লব অন্তরের প্রতিটি কুচিন্তা
আর কুকর্মের বিরুদ্ধে।

আসাদ-বিন-হাফিজ

www.pathagar.com

নাম ঃ জামাল উদ্দিন

সেশনঃ সেপ্টেম্বর'১০-১১ইং

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। খুব কম বয়সে ৭ম শ্রেনীতে অধ্যয়নকালে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের দিকে এলাকায় ইউনুছ ভাইয়ের মাধ্যমে দাওয়াত পেয়ে সমর্থক ফরম পূরন করে ছাত্রশিবিরে যোগদান করি। এরপর ও একাধিকবার সমর্থক ফরম পূরণ করতে হয়েছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার মাধ্যমে আমার পেছনে অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ১০ম শ্রেনীতে অধ্যয়নকালে এ আন্দোলনের কর্মী হই। ফাজিলপুর সাথী শাখার তৎকালীন সভাপতি জনাব মু একরামুল হক কর্মী ঘোষনা দেয়ার পর কিছু কাজ দিয়ে বললেন, "আপনি শিবিরের কর্মী"। কোথাও এ পরিচয় দিবেন না। ২০০২ সালে আন্দোলনের প্রাথমিক শপথের (সাথী) মাধ্যমে সংগঠন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন শুরু করি। ২০০৬ সালে চুড়ান্ত শপথের (সদস্য) মাধ্যমে দ্বীনকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহন করি। যার ধারাবাহিকতায় ছাত্র আন্দোলন থেকে বিদায় নেয়ার পর পরই বৃহত্তর আন্দোলনের শপথ (সদস্য) গ্রহন করি।

প্রশ্নঃ আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন, যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে?

আমার সাংগঠনিক জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। কোন স্মরনীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে তা হুবহু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। গুছিয়ে বলতে গেলে সংযোজন বিয়োজন করতে হয়। তাই আমি স্মরনীয় ঘটনা বর্ণনা দেয়া থেকে বিরত থাকলাম।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া বলে আপনি মনে করেন?

বাংলাদেশে বর্তমান রাষ্ট্র ক্ষমতা জোর করে দখল করে রেখেছেন এক চরম জুলুমবাজ, ক্ষমতালোভী, ইসলাম বিদ্বেষী, স্বেচ্ছাচারী সরকার। যারা এ দেশ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে চায়। তারা ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে তিনটি জিনিসকে টার্গেট করে তা ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এর মধ্যে অন্যতম হলো ইসলামী আন্দোলন বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবির। ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব খতমের মহা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে বিচারিক আদালতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে খতম করার অভিলাষ তাদের রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ধৈর্য্য, সাহসিকতা, বিচক্ষনতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে কোরআনের রঙে রাঙাতে হবে, সদা সতর্কতার নীতি অবলম্বন করতে হবে যাতে অনাকাঙ্খিত কোন ঘটনা না ঘটে।

প্রশ্ন ঃ 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

ইসলামী ছাত্রশিবির মেধাবী ছাত্রদের মোহনা ও ঠিকানা। এ মেধাবী ছাত্রদের যুগপোযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎ, দক্ষ এবং দেশ প্রেমিক নাগরিক তৈরির যে মহাপরিকল্পনা গ্রহন করেছে তা বাস্তবায়ন করা একমাত্র ছাত্রশিবিরের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের দেশে যোগ্য লোকের যতটা অভাব তার চেয়ে বেশি অভাব সৎ লোকের। এ সৎ লোক তৈরির কারখানা হচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির। সৎ লোক তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক মঙ্গল সাধন করা ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

পৃথিবীতে দুটি বিষয় মানুষের সামনের পথে বা আমরা যে নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন করতে চাই তার পথে বাধা, (ক) অর্থনৈতিক সমস্যা এবং (খ) নৈতিক বা চারিত্রিক সমস্যা। আমাদেরকে সর্তকতার সহিত পথ চলতে হবে যাতে কোন ব্যক্তি এ দুটি বিষয়ে আমাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে না পারে। আল্লাহর কাছে নিয়মিত সাহায্য প্রার্থনার সাথে সাথে ক্ষমাও প্রার্থনা করতে হবে। চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছেদে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে, তা এড়িয়ে চলতে হবে। বর্তমান এ কঠিন সময়ে আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বিশেষ করে ছাত্রশিবিরের জনশক্তিকে ব্যক্তিগত মোটিভেশনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি, ধৈর্য্যর সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা ও পাহাড়সম হিম্মতের পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ আমি সহ আমাদের সবাইকে আজীবন ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এ আন্দোলনে কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

১৯৯৯ সালে আমাদের ইউনিয়ন সভাপতি শওকত আলী ভাইয়ের হাত ধরে সংগঠনে আসা এবং দাগনভূঁঞা সাথী শাখার সভাপতি কামাল উদ্দিন ভাইর অনুপ্রেরণায় সংগঠনে আরও ভালো ভাবে অংশগ্রহন করি।২০০৩ সালে সাথী শপথ এবং ২০০৭ সালের দিকে সদস্য শপথ গ্রহণ করি।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

১. পরিস্থিতি ভালো ভাবে জেনে নিয়ে তার সমস্যা সমাধানে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহন করা।
২. ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা।
৩. সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
৪. আউটপুট প্লান বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা ।
৫. আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

প্রশ্ন ঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী' এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির, এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

১. সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে একে নিজ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা।
২. মান উন্নয়নে আরও নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং মান সংরক্ষনের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা।
৩. যুগের সমসাময়িক দক্ষতা অর্জন করে তা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা এবং এ ব্যাপারে সতর্ক থেকে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

১. কুরআন হাদীস অধ্যয়নকে দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা।
২. সকল সমস্যার সমাধান কুরআন হাদীস থেকে খুজে বের করা।
৩. ব্যক্তিগত বন্ধু না বানিয়ে সাংগঠনিক বন্ধু বানানো।

www.pathagar.com

যুগে যুগে যারা ছিলেন কান্ডারী

সাল	সভাপতি	সেক্রেটারী
১৯৭৭-শহর	আনোয়ার হোসেন	মোছলে উদ্দিন
১৯৭৭-মহকুমা	মুহাম্মদ লিয়াকত আলী ভুঁইয়া	ছিল না
১৯৭৭-৭৮-শহর	লিয়াকত আলী ভুঁইয়া	এ.টি.এম এনামুল হক
১৯৭৭-৭৮-মহকুমা	মোফাচ্ছেরুল হক খোন্দকার	ছিল না
১৯৭৮-৭৯-শহর	মোফাচ্ছেরুল হক খোন্দকার	দেলোয়ার হোসেন
১৯৭৮-৭৯-মহকুমা	কেফায়েত উল্লাহ মজুমদার	মঞ্জুরুল হক মজুমদার
১৯৭৯-৮০-শহর	মোফাচ্ছেরুল হক খোন্দকার	দেলোয়ার হোসেন
১৯৭৯-৮০ মহকুমা	কোফায়েত উল্লাহ মজুমদার	শামছুল করিম
১৯৮০-৮১-শহর	মোফাচ্ছেরুল হক খোন্দকার	খায়রুল বাশার
১৯৮০-৮১-মহকুমা	শামছুল করিম	ছিল না
১৯৮১-৮২	মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	এম এইচ খোন্দকার
১৯৮২-৮৫	মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী	ছিল না
১৯৮৫-৮৭	মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী	মুহাম্মদ কামরুল আহসান চৌধুরী
১৯৮৭-৮৮	মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী	মুহাম্মদ আইয়ুব আলী হায়দার
১৯৮৮-৮৯	মু. আইয়ুব আলী হায়দার (আংশিক)	নুর মোহাম্মদ
১৯৮৯-৯৩	মুহাম্মদ আলা উদ্দিন	নুর মোহাম্মদ/মাহমুদুল হক
১৯৯৩-৯৪	মাহমুদুল হক	মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসাইন
১৯৯৫	মু. শাখাওয়াত হোসাইন (আংশিক)	মুহাম্মদ ইব্রাহীম বাহারী
১৯৯৫	মুহাম্মদ ইব্রাহীম বাহারী (আংশিক)	মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন (আংশিক)
১৯৯৬	নিজাম উদ্দিন ফারুক	আ.ন.ম আবদুর রহিম
১৯৯৭	সৈয়দ আবদুল মতিন	আ.ন.ম আবদুর রহিম
১৯৯৯	দিদারুল আলম মজুমদার (আংশিক)	মোঃ মোস্তফা
১৯৯৯	শাহ্ মিজানুল হক মামুন	মোঃ মোস্তফা
৯৯-২০০০	শাহ মিজানুল হক মামুন	মো. মোস্তফা

www.pathagar.com

২০০১-২০০২ জুন	আবু আলী ফুজায়েল মু. আয়াজ	মাওলানা আব্দুর রহীম
২০০২-২০০৩	মাও. আব্দুর রহীম	মু. ইলিয়াছ
২০০৪	মু. ইলিয়াছ	মাছুম বিল্লাহ (আংশিক)
		মিজানুর রহমান (আংশিক)
২০০৫	মু. আবু সাঈদ খাঁন	মু. মিজানুর রহমান
২০০৬	মু. মিজানুর রহমান	মু. জিয়াউর রহমান
২০০৭	মু. জিয়াউর রহমান	মু. ফারুক আহম্মদ আজাদ
২০০৮	মু. ফারুক আহম্মদ আজাদ	রাশেদুল হাসান রানা (আংশিক)
		আমিনুল ইসলাম জুনাইদ(আংশিক)
২০০৯	হাফেজ মু. জহির উদ্দিন	মু.আবদুল হালিম
২০১০	রাশেদুল হাসান রানা	মু মোশারফ হোসাইন
২০১১	জামাল উদ্দিন	মু.মোশারফ হোসাইন
২০১২	তারেক মাহমুদ	মাইনুল ইসলাম আজাদ
২০১৩	জাহেদ হোসাইন	মোহাম্মদ ইলিয়াছ
২০১৪	জাহেদ হোসাইন (চলমান)	মোজাম্মেল হোসেন (চলমান)

www.pathagar.com

এক নজরে ফেনী জেলা

আল্লাহর এই জমিনে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কোরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে ইসলামী ছাত্রশিবির তাঁর ঐতিহাসিক পথ চলা শুরু করে। সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনের এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমনের অংশ হিসেবে ফেনী জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। নানা চড়াই উৎরাইয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে ছাত্রশিবির ফেনী জেলা শাখা আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য ফেনীতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর নোয়াখালীর অধীনে শহর ও মহকুমা নামে দুটি শাখা ছিল। ১৯৮২ সালে ফেনী জেলার শহর ও মহকুমাকে একীভূত করে জেলা শাখা করা হয়। ২০০৭ সালে ফেনী জেলা থেকে ফেনী পৌরসভা ও সদর উপজেলাকে পৃথক করে শহর শাখা করা হয়। অবশিষ্ট ৫ উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত হয় ফেনী জেলা শাখা। অসংখ্য ভাইয়ের শাহাদাত ও ত্যাগ কুরবানীর নজরানা পেশের বদৌলতে এ শাখা আজ একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে উপনীত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে ফেনী জেলা শাখার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

www.pathagar.com

১.দাগনভূঁঞা উপজেলা

এ উপজেলায় আমাদের ৪টি শাখা রয়েছে

ক. দাগনভূঁঞা সাথী শাখা ঃ-

দাগনভূঁঞা পৌরসভাকে নিয়ে দাগঁনভূঞা সাথী শাখা গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৫ সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . ০২ জন

সাথী . . . . ৩৩ জন

কর্মী. . . . ৫৭১

খ. সিলোনীয়া সাথী শাখা ঃ-

৩নং পূর্ব চন্দ্রপুর, ৭নং মাতুভূঁঞা ও ৮নং জায়লস্কর ইউনিয়ন নিয়ে সিলোনীয়া সাথী শাখা গঠিত ।

প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৭

সদস্য . . . . ৪ জন

সাথী . . . .৬৪ জন

কর্মী . . . . ১১১৫ জন

গ. দাগনভূঁঞা উপজেলা দক্ষিনঃ

৪নং রামনগর, ৫নং এয়াকুবপুর ও সদর ইউনিয়ন নিয়ে দাগনভূঁঞা উপজেলা দক্ষিন গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০০৮ সাল

এ শাখার জনশক্তি

সদস্য ০১ জন

সাথী . . . . ৩৩ জন

কর্মী ৫৭১

www.pathagar.com

ঘ. দাগনভূঁঞা উপজেলা উত্তর ঃ

১নং সিন্দুরপুর ও ২নং রাজাপুর ইউনিয়র নিয়ে দাগনভূঁঞা উত্তর গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০০০সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . .০২ জন

সাথী . . . ৩৭ জন

কর্মী . . . ৭১৪ জন

২. সোনাগাজী উপজেলা

এ উপজেলায় আমাদের ৩টি শাখা রয়েছে।

ক. সোনাগাজী সাথী শাখা ঃ-

সোনাগাজী পৌরসভা, ৫নং চরদরবেশপুর,৬নং চরচান্দিয়া ও ৭নং সোনাগাজী ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

প্রতিষ্ঠকাল ঃ ১৯৯২ সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . .০১ জন

সাথী . . . .৩১ জন

কর্মী. . . . ৬৮১ জন

খ. সোনাগাজী পশ্চিম সাথী শাখা ঃ

৮নং আমিরাবাদ, ৩নং মঙ্গলকান্দি, ৪নং মতিগঞ্জ ও ৬নং নবাবপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

প্রতিষ্ঠকাল ঃ ২০০৫সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . ০১ জন

সাথী. . . . ২৭ জন

কর্মী. . . . ১০৭৭ জন

www.pathagar.com

গ.সোনাগাজী উপজেলা উত্তর ঃ

১নং চরমজলিশপুর ও ২নং বগাদানা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

প্রতিষ্ঠকাল ঃ ২০১১সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . .০২ জন

সাথী. . . . .২০ জন

কর্মী . . . .৩৬০ জন

৩. ছাগলনাইয়া উপজেলা

এ উপজেলায় আমাদের ৪টি শাখা রয়েছে।

ক. ছাগলনাইয়া সাথী শাখা ঃ

ছাগলনাইয়া পৌরসভাকে নিয়ে ছাগলনাইয়া সাথী শাখা গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০০৭ সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . .০২ জন

সাথী . . . .৪৪ জন

কর্মী . . .৮৩৭ জন

খ. ছাগলনাইয়া উপজেলা দক্ষিন ঃ-

৮নং রাধানগর, ৯নং শুভপুর ও ১০নং ঘোপাল ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ছাগলনাইয়া উপজেলা দক্ষিন।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০০৭ সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . .৪জন

সাথী . . . ৫৩ জন

কর্মী . . . ১০০০ জন

গ. ছাগলনাইয়া উপজেলা পশ্চিম ঃ

পাঠাননগর ও জি এম হাট ইউনিয়ন নিয়ে ছাগলনাইয়া উপজেলা পশ্চিম গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . ৪ জন

সাথী . . . ৩৭ জন

কর্মী . . .. ৬২৮ জন

www.pathagar.com

ঘ. ছাগলনাইয়া উপজেলা উত্তর ঃ

মহামায়া ও আমজাদহাট ইউনিয়ন নিয়ে ছাগলনাইয়া উপজেলা উত্তর গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ২০০৭ সাল

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . .. . ৩ জন

সাথী . . . . . ৩১ জন

কর্মী . . .. . ৫০৬ জন

৪. ফুলগাজী উপজেলা

ফুলগাজী উপজেলায় আমাদের একটি মাত্র সাংগঠনিক শাখা ।

১নং ফুলগাজী, ২নং মুন্সীরহাট, ৩নং দরবারপুর ও ৪নং আনন্দপুর ইউনিয়র নিয়ে গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৮৫

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . ০৩ জন

সাথী . . . . ৩৯ জন

কর্মী . . . . ৮৬৪ জন

৫. পরশুরাম উপজেলা

পরশুরাম উপজেলায় আমাদের সাংগঠনিক শাখা ২টি

ক. পরশুরাম সাথী শাখা ঃ

পরশুরাম পৌরসভা ও মির্জানগর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত পরশুরাম সাথী শাখা।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০১৪

এ শাখার বর্তমান জনশক্তি

সদস্য . . . .০৩ জন

সাথী . . . ৩৬ জন

কর্মী . . .৬৭৩জন

খ. পরশুরাম উপজেলা দক্ষিন ঃ

চিথলিয়া ও বক্সমাহমুদ ইউনিয়ন

নিয়ে গঠিত পরশুরাম উপজেলা দক্ষিন।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ২০১২

এ শাখার জনশক্তি বর্তমানে

সদস্য . . . ০৪ জন

সাথী . . . ৩৭ জন

কর্মী. . .৫৫৫জন

লেখক

মোজাম্মেল হোসেন

সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ফেনী জেলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বক্তৃতার মঞ্চে শহীদ জাফর জাহাঙ্গির ভাই

শহীদ জাফর জাহাঙ্গির ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছেন কেন্দ্রীয় কলেজকার্যক্রম সম্পাদক রাশেদুল হাসান রানা ও জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইনসহ নেতৃবৃন্দ

শহীদ জাফর জাহাঙ্গির ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের (আলমগীর হোসেন) সাথে জেলা সভাপতির সৌজন্য সাক্ষাত।

শহীদ কাজী মোশারফ ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. ফখরুদ্দিন মানিক ও শহীদের গর্বিত পিতা মাস্টার কাজী শামসুল হুদা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

কফিনে চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদ কাজী মোশাররফ হোসেন।

শহীদ কাজী মোশাররফ ভাইকে কবরস্থ করার পর শোকাহত এলাকাবাসীকে নিয়ে তার জন্যে দোয়া পরিচালনা করছেন শহীদের গর্বিত পিতা।

www.pathagar.com

শহীদ কাজী মোশারফ ভাইয়ের জানাজাপূর্ব সমাবেশে
বক্তব্য রাখছেন শহীদের গর্বিত পিতা
বীর মুক্তি যোদ্ধা মাস্টার কাজী শামসুল হুদা।

শহীদ কাজী মোশারফ হোসেন ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকী
উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন শহীদের গর্বিত পিতা।

শহীদ কাজী মোশারফ ভাইয়ের
খুনিদের ফাঁসির দাবিতে ফেনীতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

শহীদ একরামুল হক খান ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছেন
জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন সহ উপজেলা নেতৃবৃন্দ।

শহীদ একরামুল হক খান ভাইয়ের স্বজনদের সাথে সৌজন্য
সাক্ষাত করছেন জেলা সভাপতি সহ উপজেলা নেতৃবৃন্দ।

শহীদ গোলাম জাকারিয়া ভাইয়ের জানাজায়
এভাবেই মানুষের ঢল নামে।

www.pathagar.com

শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের কফিন নিয়ে মিছিল করছেন
শহীদের শোকাহত সাথীরা ।

শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের জানাজা পূর্ব সমাবেশের একাংশ ।
ইনসেটে শহীদ আলাউদ্দিন ভাই ।

ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল আমাদের প্রিয় ভাই
শহীদ আব্দুল্লাহ আল সালমানের প্রাণ

শহীদ আব্দুল্লাহ আল সালমান ভাইয়ের
ছোট ভাইয়ের(আব্দুল্লাহ আল সাইদ) সাথে
কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক মু. দেলোয়ার হোসেন ।

শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান (মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত)
ভাইয়ের জানাজাপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন ।

শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান ভাইয়ের
জানাযায় মানুষের ঢল ।

www.pathagar.com

সিরাতুন্নবী (স.) মাহফিল-২০০৪ এ প্রধান অতিথির আলোচনা পেশ করছেন
বিশ্ববরেণ্য মুফাচ্ছিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

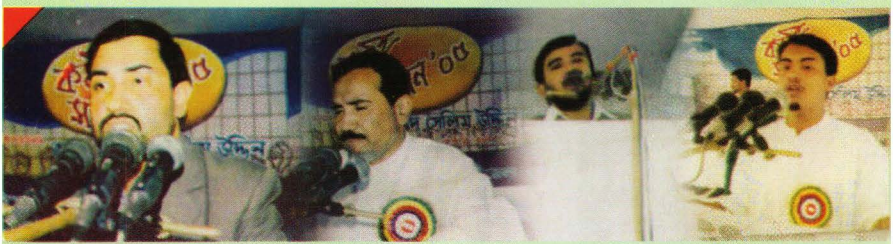

কর্মী সম্মেলন-২০০৫ এ বক্তব্য রাখছেন যথাক্রমে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. সেলিম উদ্দিন, সাবেক কেন্দ্রী সভাপতি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের, মজিবুর রহমান মন্‌জু ও তৎকালীন ফেনী জেলা সভাপতি আবু সাইদ খান।

সিরাতুন্নবী (স.) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. রেজাউল করিম ও উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মফিজুর রহমান সহ অন্যান্য মেহমানবৃন্দ।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক মিজান ময়দানে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলন-২০০৫ এ উপস্থিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. সেলিম উদ্দিন সহ আমন্ত্রীত অতিথিবৃন্দ। পাশে উপস্থিতির একাংশ।

সাথী সমাবেশ-১৯৯৮ এ উপস্থিত আছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শাহআলম ভুইয়া সহ মেহমানবৃন্দ।

কর্মী সম্মেলন-১৯৯৯ এ বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ সহ আমন্ত্রীত অতিথিবৃন্দ।

সাথী সমাবেশ-১৯৯৭ এ বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ।

সাথী সমাবেশ-২০০৫ জেলা সভাপতির শপথ গ্রহণ করছেন আবু সাঈদ খান। শপথ পড়াচ্ছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আলমগীর মু. ইউফুফ

www.pathagar.com

সিরাতুন্নবী (স.) উপলক্ষে সিম্পোজিয়াম'১৯৯৮ এ বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভপতি ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের।

কর্মী শিক্ষাশিবির-২০১২ এ প্রধান অতিথির আলোচনা পেশ করছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক।

কর্মী শিক্ষাশিবির-২০১৪ এ আলোচনা পেশ করছেন কেন্দ্রীয় কলেজকার্যক্রম সম্পাদক রাশেদুল হাসান রানা।

কর্মী সম্মেলন-১৯৯৬ এ বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের। উপস্থিত আছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. শাহজাহান সহ মেহমানবৃন্দ।

দাগনভূঁইয়া উপজেলার উদ্যোগে আয়োজিত দায়িত্বশীলদের নিয়ে ইফতার মাহফিলে আলোচনা পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. ফখরুদ্দিন মানিক ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. দেলোয়ার হোসেন।

নবগঠিত পরশুরাম সাথী শাখার সাথী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন।

www.pathagar.com

এসএসসি ও দাখিল ফলপ্রার্থী শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন।

স্কুল প্রতিনিধি সমাবেশ-২০১৪ বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্কুল সম্পাদক শাহিন আহমদ খান।

সাথী শিক্ষাশিবির-২০১৪ এ আলোচনা পেশ করছেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নাবিদ আনোয়ার, কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মু. মহি উদ্দিন, সাবেক জেলা আমীর অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভুইয়া, বিশিষ্ট ইসলাম চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মফিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কলেজকার্যক্রম সম্পাদক রাশেদুল হাসান রানা ও জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

সাথী শিক্ষাশিবির-২০১৪ উপস্থিতির একাংশ।

ষান্মাসিক সদস্য বৈঠক -২০১৩।

www.pathagar.com

উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলন-২০১৩, আলোচনা পেশ করছেন জামায়াতে ইসলামীর মজলিশে শুরা সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঞা, জেলা আমীর এ কে এম নাযেম ওসমানী কেন্দ্রীয় এইচ আর ডি সম্পাদক বদিউল আলম, জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন, পাশে উপস্থিতির একাংশ।

কর্মী শিক্ষাশিবির-২০১৪, এ আলোচনা পেশ করছেন কেন্দ্রীয় কলেজকার্যক্রম সম্পাদক রাশেদুল হাসান রানা।

কলেজ ছাত্রদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে আলোচনা রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

বার্ষিক প্লানিং দায়িত্বশীল বৈঠকে আলোচনা রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

সদস্য ও সাথীদের মান যাচাই পরিক্ষা-২০১৩ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

www.pathagar.com

ষান্মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক'১৪ এ আলোচনা রাখছেন কেন্দ্রীয় কলেজকার্যক্রম সম্পাদক রাশেদুল হাসান রানা

ষান্মাসিক সদস্য বৈঠক'১৪ এ আলোচনা পেশ করছেন সাবেক জেলা সভাপতি মাওঃ মাহমুদুল হক।

ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার আঞ্চলিক সাথী শিক্ষা বৈঠকে আলোচনা পেশ করছেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য নেয়ামত উল্যাহ শাকের।

সাংগঠনিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করায় অতিথিদের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন দাগনভুঞা উপজেলা দক্ষিন সভাপতি।

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ভাইয়ের আশু সুস্থতা ও মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

দাগনভূঞা অঞ্চলের বাছাইকৃত কর্মী শিক্ষাবৈঠকে বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

www.pathagar.com

মাহে রমজান উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. আব্দুল জববার।

জিপিএ ৫ সংবর্ধনা-২০১৪ এ সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সেক্রেটারী জেনারেল মু. আতিকুর রহমান।

জিপিএ ৫ সংবর্ধনা-২০১৪ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারী জেনারেল মু. আতিকুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ কে এম শামসুদ্দিন, কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মহি উদ্দিন, কাপ সদস্য নেয়ামত উল্যাহ শাকের।

জিপিএ ৫ সংবর্ধনা-২০১৪ এ আরো বক্তব্য রাখছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি খালেদ মাহমুদ, ফেনী শহর সভাপতি তারেক মাহমুদ ও জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

www.pathagar.com

দাগনভূঁঞা উপজেলা জেএসসি-জেডিসি সংবর্ধনা-২০১৪ এ কৃতি ছাত্রদের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন সহ অতিথিবৃন্দ।

ছাগলনাইয়া উপজেলা দক্ষিনের উদ্যোগে আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক দিদারুল আলম মজুমদার।

ছাগলনাইয়া উপজেলা পশ্চিমের উদ্যোগে আয়োজিত কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা' ১৪ এ প্রধান অতিথির আলোচনা পেশ করছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

১১ ই মে ঐতিহাসিক কুরআন দিবস উপলক্ষে দাগনভূঞা উপজেলার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন বিতরণ করা হয়।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে তালিমুল কুরআন কোর্সের আয়োজন করে সোনাগাজী সাথী শাখা।

দাগনভূঁঞা সাথী শাখার উদ্যোগে ঈদপ্রীতি সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের একাংশ

www.pathagar.com

ছাগলনাইয়া সাথী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করে পরশুরাম সাথী শাখা।

দাগনভূঁঞা সাথী শাখার শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

মাদ্রাসা প্রতিনিধি সমাবেশে-২০১৩, আলোচনা পেশ করছেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক

সোনাগাজী সাথী শাখার উদ্যোগে এসএসসি ও দাখিল পরিক্ষায় এ+ প্রাপ্তদের সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন ফেনী জেলা সভাপতি মোঃ জাহেদ হোসাইন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিলোনীয়া সাথী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট প্রীতি ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সাথে প্রতিযোগীদের একাংশ।

www.pathagar.com

ছাগলনাইয়া উপজেলা পশ্চিমের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অভিযান' ১৪ এ গাছের চারা বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

সোনাগাজী পশ্চিম সাথী শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অভিযান উপলক্ষে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ছাগলনাইয়া সাথী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্তদের তাৎক্ষণিক সংবর্ধনায় অতিথি বৃন্দের সাথে উপস্থিতির একাংশ।

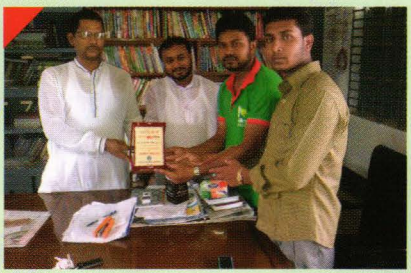

এসএসসি পরীক্ষা'১৪ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করায় সোনাগাজী আল হেলাল একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

সোনাগাজী উপজেলা উত্তর আয়োজিত জেএসসি ও জেডিসি সংবর্ধনা'১৪ এ কৃতি ছাত্রদের সাথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি খালেদ মাহমুদ ও জেলা সেক্রেটারী মোজাম্মেল হোসন সহ অতিথিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ক্রিকেট প্রীতি ম্যাচে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন ও তৎকালিন সোনাগাজী সাথী শাখার সভাপতি শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান।

www.pathagar.com

শিক্ষা সফর ১৯৯০ এ খাদ্য গ্রহণ অবস্থায় তৎকালীন কাপ সদস্য ও ফেনী জেলা সভাপতি এ এস এম আলাউদ্দিন সহ দায়িত্বশীল বৃন্দ

ছাগলনাইয়া উপজেলার উদ্যোগে আয়োজিত ঈদপ্রীতি সমাবেশ' ১৩ এ মঞ্চে অতিথিদের একাংশ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট'২০১৩ এর আয়োজন করে ছাগলনাইয়া উপজেলা পশ্চিম।

৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

সদস্য শিক্ষা সফর'১৪। ফেনী টু বান্দরবান।

জাতীয় সিরাত পাঠ প্রতিযোগীতা'২০১০ এর পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন তৎকালীন জেলা সভাপতি জামাল উদ্দিন সহ দায়িত্বশীল বৃন্দ।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনে ইসরাঈলী আগ্রাসনের প্রতিবাদে ফেনীতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক কে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সিলোনীয়ায় শিবিরের তাৎক্ষনিক বিক্ষোভ মিছিল।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সোনাগাজীতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে ছাগলনাইয়া পৌর শহরে শিবিরের র‍্যালী।

মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে সোনাগাজীতে শিবিরের র‍্যালী।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে
সিলোনিয়ায় শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন ও
জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সোনাগাজীতে
হরতাল পালিত।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে
পরশুরামে শিবিরের মিছিল।

মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে
ফুলগাজীতে শিবিরের মিছিল।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে
সোনাগাজীতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

ফেনীতে পুলিশের গুলিতে শিবির কর্মী
আব্দুল্লাহ আল সালমান হত্যার প্রতিবাদে
সোনাগাজীর কুঠির হাটে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

www.pathagar.com

হরতালের সমর্থনে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের লাঠি মিছিল।

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের মুক্তির দাবীতে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

১৮ দলীয় জোট কর্তৃক আহুত টানা চার দিন হরতালের সমর্থনে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের মিছিল।

জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের মুক্তির দাবীতে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের বিক্ষোভ।

কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি জাহেদ হোসাইন।

হরতালের সমর্থনে শিবিরের পিকেটিং।

www.pathagar.com

হরতালের সমর্থনে ছাগলনাইয়াতে শিবিরের সড়ক অবরোধ

ছাগলনাইয়াতে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাযায় উপস্থিতির একাংশ।

কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ফুলগাজীতে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

শহীদ আলাউদ্দিন ভাইয়ের বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে কবর জিয়ারত করছেন জেলা সভাপতি সহ নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফুলগাজীতে শিবিরের মিছিল।

হরতালে পরশুরামে শিবিরের মিছিল।

www.pathagar.com

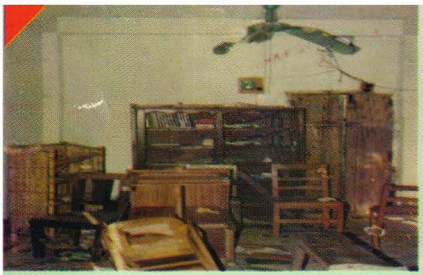

১৯৮৭ সালে ছাগলনাইয়া কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবিরের নিশ্চিত বিজয় ঠেকানোর জন্য ছাত্র ঐক্য কর্তৃক হামলা এবং শিবিরের অফিস ভাংচুরের দৃশ্য।

কারামুক্ত ছাগলনাইয়া উপজেলা উত্তরের সভাপতি জুলফিকার আলীকে মিস্টি মুখ করাচ্ছেন জেলা সভাপতি।

সিলোনিয়াতে ছাত্রলীগ ও পুলিশের যৌথ হামলায় গুরুতর আহত মাস্টার আবুল খায়ের।

ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত জেলা পাঠাগার সম্পাদক মু. সাইদুল হক।

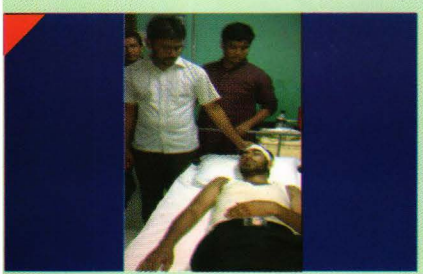

ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত সিলোনিয়া সাথী শাখার সেক্রেটারী হেদায়াত উল্যাহ।

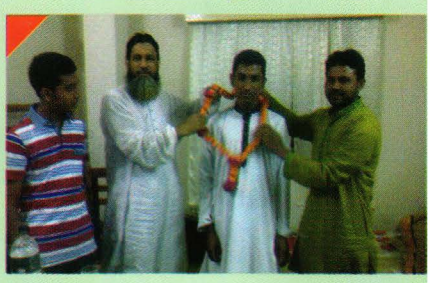

সদ্য কারামুক্ত শিবিরের সাথী এনামুল হককে সংবর্ধনা দিচ্ছেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী একেএম শামসুদ্দিন।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত সিলোনীয়া সাথী শাখার ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক সালাউদ্দিন সাগর।

ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত জেলা দপ্তর সম্পাদক কফিল উদ্দিন মাহমুদ।

ছাত্রলীগের হামলায় আহত সিলোনীয়া সাথী শাখার সাথী মোঃ শালফেরাজ।

পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত সিলোনীয়া সাথী শাখার কর্মী শাহাদাৎ।

পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত সিলোনীয়া সাথী শাখার কর্মী মিহির।

পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত সিলোনীয়া সাথী শাখার কর্মী মোঃ আশিকুর রহমান।

www.pathagar.com

Your Merit, Our Schooling, Your Admission...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকাসের
অবিস্মরনীয় সাফল্য...!

FOCUS UNIVERSITY ADMISSION COACHING & GUIDE

ঢাকা থেকে সরাসরি পরিচালিত

ফোকাস

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ফেনী শাখা

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে

খ ইউনিট ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ১০ম **গ ইউনিট** ৫ম (লিখিত)

ঘ ইউনিট ১ম (বানিজ্য), ২য় (বিজ্ঞান), ২য় (মানবিক), ৪র্থ (মানবিক), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৩তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৭তম, ১৯তম সহ মোট ১৬২০ জন।

২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে

খ ইউনিট ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম সহ ১৩৫৩ জন

ঘ ইউনিট ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম সহ ৩৪৮ জন। মোট ১৭৬১ জন

২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে

খ ইউনিট ১ম, ৪র্থ,৭ম, ৮ম, ১২ তম, ১৭ তম।

ঘ ইউনিট ২য়, ৫ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম ১৫তম সহ ১৫৮০ জন।

২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে **খ ইউনিট** ১ম, ২য়,

ঘ ইউনিট ১ম (বিজ্ঞান), ১ম (মানবিক) সহ সর্বমোট ১৪৯৭

২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে **খ ইউনিট** ১ম, ২য়, ৩য় **ঘ ইউনিট** ১ম

আমাদের স্বাতন্ত্র্য

- ☑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষক, একঝাঁক বোর্ড স্ট্যান্ডধারী, গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও মেধাবী ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত।
- ☑ ক খ গ ও ঘ ইউনিটের প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক Systematic Lecture এবং সর্বাধিক Lecture Sheet প্রদান।
- ☑ প্রতিটি লেকচার শেষে Class Test এবং প্রতি ৩ ক্লাস অন্তর Assessment Test গ্রহণ Paper Final সহ একাধিক Subject Final এবং সর্বাধিক Model Test গ্রহণ।
- ☑ মেধাবী এবং অগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ব্যবস্থাপনায় ভর্তি উপযোগী করার প্রচেষ্টা।
- ☑ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভর্তি গাইড ফোকাস ফ্রি।
- ☑ সর্বশেষ তথ্যভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান Supplement এবং Highlights প্রদান।
- ☑ Exclusive Special Batch.
- ☑ Intensive Care.
- ☑ সর্বোপরি আমাদের সকল প্রচেষ্টা ছাত্রকল্যাণে নিবেদিত।

ফেনী শাখা ঃ
২১১/২, দিদার ম্যানশন (৪র্থ তলা), ব্যাংক এশিয়ার বিপরীতে এস.এস.কে রোড, ফেনী। ০১৮২৯৬১৩৫২৬, ০১৭৫০১৩৮৯৭৫

প্রধান কার্যালয় ঃ ৩১/এ সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড (৩য় তলা), ফার্মগেট, ঢাকা। ফোন : ৯১১২৬৫৫, ০১৭১২-৬০১০৭৮

E-mail: focusfeni13@gmail.com
https://m.facebook.com/focusfeni13

www.pathagar.com

ভর্তি চলছে!!

We start from the end of your desire...

সফলতার ৩৪ বছর

রেটিনা

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এ্যাডমিশন কোচিং

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অদ্বিতীয় রেটিনা

জাতীয় মেধায় **১ম** আনিকা তাহসিনকে ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছেন রেটিনা কোচিং এর প্রধান পরিচালক

জাতীয় মেধায় **২য়** প্রীতম দাসকে ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছেন ফরিদপুর রেটিনার সম্মানিত উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক

আনিকা তাহসিন
সেশন : ২০১৩-১৪

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সেশন : ২০১২-১৩

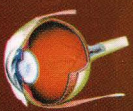

শরাফত করিম
সেশন:২০১১-১২

মোঃ শামীম রেজা
সেশন:২০০৮-০৯

সৈয়দ শাহরিয়ার রাজ্জাক
সেশন:২০০৬-০৭

২০১৩-১৪ সেশনের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় এককভাবে **১ম, ২য়,** প্রথম **২০** জনে **১৪** জন সহ সর্বমোট **১৭০০** এর অধিক শিক্ষার্থীর গৌরবময় সাফল্য...

সার্বক্ষনিক যোগাযোগ: ০১৮১৬৭৮১৭৭১-৬

www.pathagar.com

DESIGN & PRINTING
Rongtuli media corporation
01960 409 509